



মাসুদ রানা

# যাত্রা অশুভ ১

কাজী আনোয়ার হোসেন





মাসুদ রানা-১৭০

## যাত্রা অশুভ-১

### কাজী আনোয়ার হোসেন

সহজ-সরল এক মেয়ে মারিক কঠিন-জটিল সমস্যায় পড়ে সাহায্য চাইলো রানার কাছে। কিন্তু হাতে জরুরী কাজ, অক্ষমতা প্রকাশ করলো রানা। এবং অন্তরের গভীরে অনুশোচনায় দগ্ধ হলো—বিপদগ্রস্তা একটি তরুণী রানা এজেন্সির কাছে সাহায্য চেয়ে পাবে না, এ কেমন কথা? আরও খারাপ কথা—মেয়েটির নাম ঠিকানা কিছু রাখেনি ও। কিন্তু ভাগ্যের লিখন খণ্ডাবে কে।

নিতান্তই আকস্মিকভাবে আবার দেখা পেল সে মেয়েটির, এবং জড়িয়ে গেল। এক হোয়েলিং কোম্পানির মালিকের অনুরোধে চললো সে অ্যাটার্কটিকায়। ওখানে খুন হয়েছেন মারিকার বাবা, সম্ভবতঃ ওর হবু-স্বামী নষ্টচরিত্র মার্ক রোসেটের হাতে। চিহ্নিত করা গেল খুনীকে, কিন্তু বিচারের আগেই শুরু হয়ে গেল বৈরী প্রকৃতির বিরুদ্ধে ওদের মরণপণ যুদ্ধ।

বিশ টাকা



সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

বিশ টাকা

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০



## এক

ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথেই বিপর্যয়ের প্রথম খবরটা পৌঁছলো লণ্ডনে।

‘কেপটাউন, দশ-ই ফেব্রুয়ারী, রয়টার : ক্যাক্টিরি শিপ কোকুন এস. ও. এস. পাঠিয়েছে। ওয়েডেল সী-র বরফে আটকা পড়েছে জাহাজ। বিধ্বস্ত হবার সম্ভব আশংকা। সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে চার শো মাইল দূর থেকে রওনা হয়েছে নরওয়ের ক্যাক্টিরি শিপ সাদার্ন উইণ্ড।’

সংবাদপত্রের ‘সর্বশেষ’ শিরোনামে খবরটা ছাপা হলো।

দুপুর নাগাদ প্রায় পাঁচ কোটি লোক জানলো বাইশ হাজার টনের একটা ব্রিটিশ জাহাজ অ্যান্টার্কটিকার বরফের চাপে ধীরে ধীরে ভাঙছে। শুভ হিমরাজ্যে যাত্রার মুখোমুখি চারশো মানুষ।

ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল্টি তাদের রেসকিউ শিপ ডীপ রোভারকে পাঠালো সাউথ জর্জিয়ার উদ্দেশে, ওখান থেকে ফুয়েল নিয়ে কোকুনের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করবে। কেপটাউন থেকে রওনা হলো একটা ন্যাভাল করভেট, সেটাও সাউথ জর্জিয়া থেকে ফুয়েল নেবে।

সব মিলিয়ে আর এগারোটা জাহাজ রওনা হলো কোকুনের সাহায্যে, যদিও কেউ জানে না বরফের বাধা পেরিয়ে অবস্থলে পৌঁছানো অসম্ভব কিনা। নরওয়ের সরকারী মূল্যপাত ঘোষণা করলো, তাদের ফ্যাক্টরি শিপ সাদার্ন উইণ্ড কোকুনের দৃশ্যে মাইলের মতো পৌঁচেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্যের প্রস্তাব দিয়ে জানালো, সম্মুখ-রোধ করা হলে তারা তাদের এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ওয়াশিংটন-ফ্রে পার্ঠাভে রাজি আছে, যদিও এই মুহূর্তে কোকুনের কাছ থেকে তিন হাজার মাইল দূরে রয়েছে সেটা।

ওদিকে অ্যান্টার্কটিকায় দ্রুত ঘটে যাচ্ছে ঘটনাগুলো। প্রথম দিকে বরফ এলো, ডিনামাইট ফাটিয়ে পথ করে নেয়ার মতো বেশ খানিকটা পরিষ্কার পানি পেয়ে গেছে কোকুন। পরবর্তী মেসেজ জানা গেল, বরফের নিরেট রাজ্য থেকে বেরবার সব ক'টা পথে প্রাচীর তুলে দিয়েছে কয়েকটা আইসবার্গ, প্যাক আইসের ওপর হামলা করছে ওগুলো। প্যাক আইসের কিনারায় অপেক্ষা করছে ট্যাংকার পালাডিন আর রেফ্রিজারেটর শিপ ডলফিন, সাথে পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর বাকি জাহাজগুলো। ক্যাপটেনরা জানিয়েছে, তারা অসহায়, কারো কিছু করার নেই। বিকেল নাগাদ বরফের চাপে কোকুনের স্টারবোর্ড সাইড ভেঙে পড়তে শুরু করলো। ১৪.১৭ ঘটায় ফ্যাক্টরি শিপের মাস্টার, ক্যাপটেন জোনাথন ভেনসম, জাহাজ খালি করার নির্দেশ দিলো। বরফে রেডিও ইকুইপমেন্ট নামাবার আগে সর্বশেষ সতর্ক-বাণীতে ক্যাপটেন ভেনসম সাদার্ন উইণ্ডকে জানালো, আইসবার্গের রেখা পেরিয়ে তারা যেন প্যাকে না ঢোকে। কোকুন থেকে পাওয়া ওটাই সর্বশেষ মেসেজ।

পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর লগুন অফিসে সারা রাত আলো

হলো। কিন্তু জাহাজের রক্ষা পাওয়া ক্রুদের কোনো মেসেজ এলো না। পরিত্যক্ত জাহাজ বা বরফে আশ্রয় পাওয়া লোকজনের ভাগ্য সম্পর্কে সংশয় ও অনিশ্চয়তা বাড়তেই লাগলো। দীর্ঘে দীর্ঘে সবাই উপলব্ধি করলো, উনিশশো বারো সালে টাইটানিক ভুলে যাবার পর এটাই সম্ভবত ভয়াবহতম নৌ-দুর্ঘটনা।

এগারো তারিখে বেশ কিছু তথ্য সহ লণ্ডনের একটা কাগজে পুরো কাহিনীটা ছাপা হলো। পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর বিভিন্ন অফিস, ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল্টি, নরওয়ে শিপিং লাইনস হেডকোয়ার্টার এবং একাধিক লাইব্রেরীর তথ্যভাণ্ডার থেকে বিবরণ সংগ্রহ করে রিপোর্টার তার লেখাটা সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেছে। শিরোনাম— ‘অ্যান্টার্কটিকায় সর্বশেষ বিপর্যয়’। রিপোর্টটা সহজ ভাষায় লেখা :

‘চারশো এগারোজন লোক নিয়ে মোলই অক্টোবর ক্রাইড ত্যাগ করে কোকুন। নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বোনার পাইটন, ফ্যাক্টরি ম্যানেজার। জোনাস ভেনসন জাহাজের মাস্টার, সহকারী ম্যানেজারের পদে রয়েছে পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর চেয়ারম্যানের ছেলে, মার্ক রোসেট। ক্রুদের মধ্যে শতকরা আটাত্তরজন নরওয়ের লোক, প্রধানত স্যাণ্ডফিওর্ড আর টনসবার্গের অধিবাসী তারা। বাকি সবাই ব্রিটিশ। ফ্যাক্টরি শিপের সাথে রয়েছে এক্স-অ্যাডমিরাল্টি করভেট, হোয়েলটোইং ভেসেল হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়েছে ওটাকে, আর আছে রেফ্রিজারেটর শিপ ডলফিন।

‘মোলই নভেম্বরে কেপটাউনে পৌঁছায় কোকুন, ওখানে তার ক্যাচার-গুলো একটা ট্যাংকার সহ অপেক্ষা করছিল। অভিযান শুরু হয় তেইশে নভেম্বর। ফ্যাক্টরি শিপ কোকুনের ধারণ ক্ষমতা ২২১৬০ টন। বহরে রয়েছে দশটা ক্যাচার, প্রতিটি ৩০০ টনী। আরো দুটো ক্যাচার মাত্র। অশুভ-১

আছে, টো করার জন্যে ব্যবহার করা হয়। শিকার করা তিনি টেনে আনার জন্যে রয়েছে তিনটে এক্স-ন্যাভাল কনভেট। একটা রেফ্রিজারেটর শিপ, একটা ট্যাংকার, একটা হোয়েলার—তিনি মাংস রেফ্রিজারেটর শিপে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। টোইং ভেসেলের একটাকে পরে কেপটাউনে ফেরত পাঠানো হয়, ইলেকট্রিক হারপুন ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করবার জন্যে। তিনি শিকারের চলতি মৌসুমে নতুন আবিষ্কৃত পদ্ধতিটা পরীক্ষা করে দেখতে চায় কোম্পানী।

‘অ্যান্টার্কটিকায় তিনি শিকারের মেয়াদ চার মাস—ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ। বংশবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্যে বছরের বাকি সময় তিনি শিকার নিষিদ্ধ। চলতি মৌসুমে বিশেষ ধরনের কিছু তিনি শিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এবারের মৌসুমে আঠারোটা কোম্পানী অভিযানে বেরিয়েছে—দশটা নরওয়ের, চারটে ব্রিটিশ, একটা ডাচ, একটা রাশিয়ান, দুটো জাপানী।

‘উনত্রিশে নভেম্বর সাউথ জর্জিয়াকে দেখতে পায় কোকুন। অপ্রত্যাশিত খারাপ আবহাওয়ার খবর দেয় তারা। তাপমাত্রা অস্বাভাবিক কম, দ্বীপের পশ্চিম আর দক্ষিণ তীরে প্যাক আইস তখনো জমাট বেঁধে আছে। ক্যাচারগুলো, দুশো মাইল জুড়ে ছড়িয়ে আছে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার রিপোর্ট দিয়ে জানালো, বরফের বিশাল পাহাড় ভেসে আসছে স্রোতের সাথে। বছরের এই সময়টা এতো বড় আকারের বরফ ওদিকে থাকার কথা নয়। ডিসেম্বরের দুই তারিখে অপারেশন শুরু করার নির্দেশ দিলো ফ্যাক্টরি শিপ কোকুন, সাত দিনে তার ক্যাচারগুলো শিকার করলো মাত্র ছত্রিশটা তিনি। ইতোমধ্যে তাপমাত্রা আরো নেমে যাবার সাথে সাথে শুরু হয়েছে তুষার বড়। আরো

দক্ষিণে সরে গিয়ে পুরোদমে কাজ শুরু করলো বহরটা। লণ্ডন অফিসে রিপোর্ট আসতে লাগলো, ভিগির সংখ্যা নিতান্তই কম, আবহাওয়া আরো খারাপের দিকে, যানোমধ্যেই আইসবার্গ দেখা যাচ্ছে।

‘একে তো শিকার করার মতো তিমি নেই, তার ওপর ফ্যাক্টরি ম্যানেজার বোনার পাইটনের রিপোর্ট থেকে জানা গেল, জুদের মধ্যে দলাদলি শুরু হয়ে গেছে। কোম্পানীর লণ্ডন অফিস থেকে প্রশ্ন করেও এ-ব্যাপারে বিশদ কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

‘তবে ব্যাপারটা যে গুরুতর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কোম্পানীর চেয়ারম্যান, কর্নেল ওয়াকার রোসেট, জার্মানীর ছয় তারিখে লণ্ডন ত্যাগ করেন কেপটাউনের উদ্দেশ্যে, চাটার করা একটা প্রাইভেট প্লেন নিয়ে। ডাক্তার তাঁকে নিষেধ করেন, কারণ তার হার্টের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, কিন্তু কারো কথায় কান পেননি তিনি। কর্নেল ওয়াকার রোসেটের সাথে রয়েছে ফ্যাক্টরি ম্যানেজার বোনার পাইটনের কন্যা মারিকা পাইটন। সবাই জানে, কর্নেল ওয়াকারের পুত্রবধূ হতে যাচ্ছে মারিকা। মার্ক রোসেটের সাথে তার বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে আছে। এ-ব্যাপারে চাপা একটা গুঞ্জন থাকলেও, পারিবারিক সূত্র থেকে ভালো-মন্দ কিছুই জানা সম্ভব হয়নি। কর্নেলের সাথে আরো রয়েছেন একজন জার্মান টেকনিকাল আডভান্সাইজার হেলমুট বার্গার, ইলেকট্রিকাল হারপুন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সে। তার আছে একজন নাম-করা জাপানী ফটোগ্রাফার, কাইসু ওকোমো। তেসরা জার্মানীতে লণ্ডন অফিসে খবর এলো, অভিযানের নেতা, বোনার পাইটন, গত রাতে জাহাজ থেকে অদৃশ্য হয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, জাহাজ থেকে পড়ে গেছেন তিনি।

‘কর্নেল ওয়াকার কেপটাউনে পৌঁছলেন ছয় তারিখে, সেদিনই তিনি যাত্রা অন্ত-১

মারিকাকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন ফ্যাক্টরি শিপের উদ্দেশে। হার-  
 পুন ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করতে এসেছিল টোইং বোটটা, সেটাতে চড়েই  
 গেলেন তারা। সতেরো তারিখে ফ্যাক্টরি শিপে পৌঁছে অভিযানের  
 দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন কর্নেল। ইতোমধ্যে মাত্র এক শো  
 সাতাশটা তিমি মারা হয়েছে, অথচ গত বছর এই সময় মারা হয়ে-  
 ছিল ছশো চোদ্দটা। পরবর্তী এক হপ্তায়, খারাপ আবহাওয়ার দরুন,  
 মাত্র সাতটা তিমি শিকার করা সম্ভব হলো। কর্নেল ক্যাচারগুলোকে  
 আরো বড় বৃত্ত রচনা করতে পাঠালেন। দক্ষিণ আর দক্ষিণ-পূবে বিপুল  
 প্যাক আইস দেখতে পেলো তারা, একটা ক্যাচার ঢোকার পর বরফ  
 থেকে আর বেরুতে পারলো না। প্রতিটি ক্যাচার থেকে রিপোর্ট  
 এলো, তিমির কোনো হদিস নেই। ইতোমধ্যে নরওয়ের ফ্যাক্টরি  
 শিপ সাদার্ন উইণ্ডের সাথে রেডিও যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে,  
 দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ছয় শো মাইল দূরে রয়েছে ওটা। খবর এলো,  
 চারপাশে এতো তিমি যে মেরে কুল করতে পারছে না তারা।  
 আঠারো তারিখে কর্নেল সিদ্ধান্ত নিলেন, আরো দক্ষিণে যাবেন  
 তারা। রওনা হবার পর বরফের আলগা টুকরো বাধা সৃষ্টি করলো।  
 তবে তেইশ তারিখে খোলা সাগরে পৌঁছুলো কোকুন, রিপোর্ট এলো  
 প্রচুর তিমির দেখা পাওয়া গেছে। পাঁচই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এক শো  
 সত্তরটা তিমি মারা পড়লো। ছয় আর সাত তারিখে বন্ধ থাকলো  
 শিকার, কারণ তুষার ঝড় আর কুয়াশা। বরফে আশ্রয় নিতে গিয়ে  
 ক্ষতিগ্রস্ত হলো একটা ক্যাচার। ঝড় থামার পর একটা ক্যাচার আর  
 একটা ক্রাভেটকে পাঠানো হলো উদ্ধার করার জন্যে। আট তারিখে  
 এই দুটো জাহাজ পরস্পরের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে অচল হয়ে  
 পড়লো। একটা শেষ পর্যন্ত ডুবে গেল, আশুন লেগে গেল দ্বিতীয়-



টায়। ছব্বটনাটা ঘটলো কোকুনের কাছ থেকে একশো। বিশ মাইল  
দক্ষিণ-পশ্চিমে।

‘তিনটে জাহাজের ক্রুদের উদ্ধার করার জন্যে পাঠানো হলো একটা  
কন্সভেটকে। আট তারিখে রাতে কন্সভেট থেকে জানানো হলো,  
অকুইলের বিশ মাইলের মধ্যে পৌঁছুতে পেরেছে তারা, কিন্তু সামনে  
নিরেট প্যাক আইস থাকায় এগোতে পারছে না। ওদিকে মোট  
চারটে জলযান বা জলযানের ক্রুরা রয়েছে, কিন্তু এরপর আর কোনো-  
টা থেকেই কোনো খবর এলো না।

‘ঝড় শুরু হলো আবার। তাসত্ত্বেও ফ্যাক্টরি শিপ কোকুন  
ক্যাটারগুলোকে সাহায্য করবার জন্যে রওনা হলো। খারাপ আব-  
হাওয়ার দরুন তিনি শিকার বন্ধ রয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত বা আটকে পড়া  
চারটে ক্যাটার ছাড়া বাকি সবগুলো জাহাজ ফ্যাক্টরি শিপের সাথে  
থাকলো। কর্নেল ওয়াকার রোসেট সবার সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত  
নিলেন, কোকুন প্যাক আইসে প্রবেশ করবে।

‘দৃশ্যটা কল্পনা করা কঠিন। কোকুন বিশাল একটা জাহাজ। সামনে  
অবিশ্বাস্য গতিবেগ নিয়ে ঝড় যেন একটা বিভীষিকা। পূর্ব থেকে  
পশ্চিমে সরু একটা পথ ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজগুলোর দিকে চলে গেছে,  
পথের দু’পাশে যতো দূর দৃষ্টি যায় আলাগা প্যাক আইস—শুভ্র হিম-  
রাজ্য, সূর্য যেখানে কখনোই অস্ত যায় না, রাত মানে টোরাইলাইটের  
অনুভূত নিশ্চল আলো। আলাগা বরফ জড়ো হয়ে জমাট বাঁধছে, পরি-  
ণত হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন নিরেট প্যাক আইসে। রওনা হবার পরপরই  
আইসবার্গের সাক্ষাৎ পেলো তারা, প্যাক আইসের ওপর হামলা  
করছে। আঁকাবাঁকা সরু ও কালো পানিপথ ধরে এগিয়ে চলেছে  
কোকুন, বরফের গভীর রাজ্যে ঢুকছে তারা, পাশ কাটাচ্ছে একের পর  
যাত্রা অন্ত-১

এক আইসবার্গকে, সামনে দক্ষিণ মেরুর সবচেয়ে নিপঙ্কনক এলাকা।  
 জুদের সবারই জানা আছে, স্বেচ্ছামৃত্যুর খুঁকি নিয়েছে তারা। প্যাক  
 আইসে ঢোকা আর বেরনো এক কথা নয়। সরু পানিপথটা যে-  
 কোনো মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

'ব্যাপারটা কি স্রেফ পাগলামি? ক্যাচারগুলোয় মাত্র কয়েকজন  
 লোক, তাদেরকে উদ্ধার করবার জন্যে চারশো লোককে বিপদে ফেলার  
 আদৌ কি কোনো প্রয়োজন ছিলো? ক্যাক্টিরি শিপের দাম ধরা যেতে  
 পারে প্রায় দেড় কোটি পাউণ্ড, এতো দামের জাহাজটা হারাবার খুঁকি  
 কেন নিলেন কর্নেল ওয়াকার? তাঁর অফিসাররাই বা কেন তাঁকে সাব-  
 ধান করেননি? কোকুন অত্যন্ত শক্তিশালী জাহাজ, বারো ফুট ঘন  
 বরফ ভেঙে এগোতে পারে, কিন্তু প্যাক আইসের এবড়োখেবড়ো  
 কিনারা যদি একবার ঠিকমতো দাঁত বসাতে পারে, ডুবে যেতে খুব  
 বেশি সময় নেবে না। কর্নেল কি বিপদটা দেখতে পাননি? নাকি  
 পানি পথটা এতো সরু ছিলো যে ঢোকান পর আর বেরনোর উপায়  
 ছিলো না? আসলে কি ঘটেছিল তা হয়তো কোনোদিনই জানা  
 যাবে না। আমরা শুধু জানি, ১০ই ফেব্রুয়ারী ০৩. ১৮ ঘটায় কোকুন  
 এস. ও. এস. পাঠাতে শুরু করে। পশ্চিম দিকে ধাবিত প্যাক আইস  
 ঘিরে ধরে ওটাকে, এবং সম্ভবত রাতের মধ্যেই চিঁড়ে-চ্যাপ্টা করে  
 ফেলে।

'রক্ষা পাওয়া জুদের ভাষা না পাওয়া পর্যন্ত কাহিনীটা সম্পূর্ণ  
 জানা যাবে না। ইতোমধ্যে আমরা শুধু আশা করতে পারি, সরকার  
 তার সাধ্য মতো চেষ্টা করবে লোকগুলো যেন উদ্ধার পায়। ওদের  
 সাথে খাবারদাবার প্রচুর থাকার কথা, তিমির মাংসের অন্তত কোনো  
 অভাব নেই। তবে ইকুইপমেন্ট যা আছে তাতে আন্টার্কটিকায়



একটা শীত কাটানো অসম্ভব ব্যাপার। শীত এলো বলে, তার আগেই বিপন্ন মানুষগুলোকে উদ্ধার করতে হবে।’

এই হলো কোকুনের কাহিনী। এর বেশি তেমন একটা কিছু জানে না জনসাধারণ। বিপর্যয়ের খবরটা একটানা নয়দিন খবরের কাগজে হেডিং হিসেবে থাকলো, কিন্তু তারপর উদ্ধারের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায়, রিপোর্টাররা আর কোনো আগ্রহ দেখালো না, মানুষও ঘটনাটার কথা ভুলে গেল। কিছুদিন পর মার্কিন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ওয়াশিংটন অকুস্থলে পৌঁছুলে আবার খবর হলো কোকুন, কিন্তু তার পরই জানা গেল, খারাপ আবহাওয়ার দরুন অনুসন্ধান বিঘ্নিত হওয়ায় ওয়াশিংটন ফেরত এসেছে। ওয়েডেল সী-তে আটকা পড়া কয়েকশো ভাগ্যহত লোকের শেষ পরিণতি কি হতে পারে, সবাই উপলব্ধি করতে পারলো।

মার্চের মাঝামাঝি সময় শীত এসে পড়লো। নতুন বরফ তৈরি হওয়ায় তাপমাত্রা দ্রুত নেমে যাচ্ছে। বাইশ তারিখের মধ্যে সব ক’টা সার্চ ভেসেল ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। হোয়েলিং কোম্পানী-গুলো আন্তর্জাতিকভাবে ঘোষণা করলো, চলতি মৌসুমের মতো তিনি শিকার বন্ধ করেছে তারা। এই ঘোষণার ফলে কোকুনকে বা কোকুনের জুদের উদ্ধার করার শেষ আশাটাও বিলীন হয়ে গেল।

কিন্তু গল্পটা এখানেই শেষ হলো না। এপ্রিল মাসের একুশ তারিখে একটা খবর এলো...

তবে সেটা মাসুদ রানার কাহিনী।

## দুই

হাইড পার্ক থেকে দেখা যায় অফিসটা। দোতলার ওপর কমপিউটার, ডাটা প্রসেসিং কন্ট্রোল রুম, এবং অন্যান্য আধুনিক কমিউনিকেশন ফ্যাসিলিটি নিয়ে তিন কামরার অফিস। ভেতরে চোকার দরজার মাধ্যমে ছোট্ট একটা সাইনবোর্ড, অক্ষরগুলো পিতলের ওপর খোদাই করা, সাদা রঙের : রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি, লগুন ড্রাক।

রানা এজেন্সি আসলে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সেরই একটা কাভার, চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নির্দেশে গড়ে তুলেছে রানা বেশ কয়েক বছর আগে। বি. সি. আই. আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, তাই আন্তর্জাতিক অনেক নাজুক ব্যাপারে নজর রাখতে অসুবিধে হয়, সে-কথা ভেবেই মাসুদ রানাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর করে এজেন্সিটাকে দাঁড় করানো হয়েছে। শুরু থেকে ভালো কাজ করে আসছে রানা এজেন্সি, পৃথিবীর প্রায় সব বড় বড় শহরে খোলা হয়েছে শাখা অফিস।

বি. সি. আই.-এর দুর্ধর্ষ এজেন্টদের একজন হলো মাসুদ রানা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোথাও কোনো ষড়যন্ত্র হলে বা কোথাও মান



জাতির জন্যে কতকর কোনো অন্তত তৎপরতা শুরু হলে অসম সাহ-  
সের সাথে সেটা ঠেকাবার জন্যে ছুটে যায় ও । বিপদে ধাপিয়ে পড়তে  
ভালোবাসে রানা । প্রিয় বলেই এই রোগাক্রমকর জীবন ও পেশাকে  
বেছে নিয়েছে ।

জাহ্নবীরী গাসের এক তারিখ, ছপূর একটা, লগুন শাখার অফিসে  
বসে একমনে ফাইল দেখছে রানা । লাঞ্চ খেতে এইমাত্র বেরিয়ে গেছে  
সবাই, গোটা অফিস ফাঁকা । আজ রাতের ফ্লাইটে জরুরী একটা তথ্য  
সংগ্রহের জন্যে ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিয়ে কেপটাউনে যাবার কথা ওর,  
প্লেনের টিকেট কাটা হয়ে গেছে । কেপটাউন থেকে ইংল্যান্ডে না ফিরে  
চলে যাবে ঢাকায়, তাই লগুন শাখার ফাইলগুলোর ওপর দ্রুত এক-  
বার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে ও ।

আর কেউ হলে সম্ভবত শুনেতে পেতো না, কিন্তু রানার কান অত্যন্ত  
সজাগ, সিঁড়িতে পায়ের হালকা শব্দ শুনে ভুরু কুঁচকে উঠলো ওর ।  
লাঞ্চ সেরে এখুনি ফিরবে না কেউ । তাহলে ? ফাইল থেকে মুখ না  
তুলেই খোলা দেয়ালে একটা হাত ঢোকালো, পিস্তলটা স্পর্শ করলো  
ওধু, ধরলো না । টুংটাং শব্দে বেজে উঠলো কলিংবেল ।

‘কাম ইন,’ বিরজি না চেপেই হাঁক ছাড়লো রানা ।

সাথে সাথে কেউ ভেতরে ঢুকলো না । কয়েক সেকেন্ড পর নড়ে  
উঠলো ভারি পর্দা, উকি দিলো একটা মেয়ে । মেয়েটার বয়স হবে  
বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে । চেহারায় ইতস্তত তাঁক, যেন ভেতরে  
ঢুকবে কিনা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না । সুন্দরী বলা যাবে না, তবে  
এমন কোমল চেহারা খুব কমই দেখেছে রানা । গোটা অবয়বে আশ্চর্য  
সারল্য লেপ্টে আছে । এক পলক দেখেই মায়া লাগলো রানার,  
কারণ এ-ধরনের সরল মেয়েরাই বড়না, ষড়যন্ত্র আর নির্যাতনের শিকার

হয়।

‘আমার কিছু কথা ছিলো,’ বিড়বিড় করে বললো মেয়েটা, এখনো সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে।

‘প্রিজ, কাম ইন,’ বলে অভয় দেয়ার জন্যে মুহূ হাসলো রানা, ইস্পিতে ডেস্কের সামনের একটা চেয়ার দেখালো। ‘বসুন।’

মেয়েটা ভেতরে ঢোকান পর রানা লক্ষ্য করলো, প্রচলিত অর্থে সুন্দরী না হলেও, তার নারীমূলভ দেহসৌষ্ঠব গর্ব করার মতো। বাঙালী মলিনাদের মতই অসামান্য লাবণ্য। প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা খেতাসিনী যুবতীর সর্বঙ্গে যৌবন ঢলঢল করছে। মেয়েটা যাতে আড়ষ্ট বোধ না করে, শরীরটার দিকে ভালো করে তাকালোই না রানা, মুখের ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে জানতে চাইলো, ‘বসুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি আমরা?’ ইতিমধ্যে চেয়ারে বসেছে মেয়েটা, তবে শির-দাঁড়া খাড়া, টান টান হয়ে আছে কাঁধের পেশী।

‘আমার সাহায্য দরকার। আমার সাথে আপনাদের একজনকে অ্যান্টার্কটিকায় যেতে হবে। টাকা যা লাগে দেবো, খরচ ইত্যাদি যা লাগে তাও...।’

‘কিছু যদি মনে না করেন, জানতে পারি,’ জিজ্ঞেস করলো রানা, ‘এখানে কিভাবে এলেন আপনি? কেউ আপনাকে আমাদের কথা বলেছে?’

‘না, কেউ বলেনি,’ আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো মেয়েটা। ‘এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, সাইনবোর্ড দেখে...।’

‘আপনার পরিচয়?’

‘আমার নাম মারিকা পাইটন। আমার বাবা, বোনার পাইটন, অ্যান্টার্কটিকায় আছেন—একটা ফ্যাক্টরি শিপে। আমি জানি, বাবার



সামনে উদ্যানক একটা বিপদ রয়েছে। বিপদ আনানও। স্নিগ্ধ, মিঃ...

‘আমি মাসুদ রানা।’

‘মিঃ রানা, স্নিগ্ধ। ব্যাপারটা কাউকে বলার মতো নয়, কারণ এখনো কিছু ঘটেনি, কিন্তু আমি জানি আমি বা আমার বাবা মাদারক একটা বড়যন্ত্রের শিকার হতে যাচ্ছে। বাবা আমাকে অ্যাক্টরটিকায় যেতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু তবু আমাকে নিরে যাওয়া হচ্ছে; টিক জোর করেও নয়, আমার এক অর্ধে জোর করেই... আসলে, ঠাণ্ডা মাথায় কিছু চিন্তা করতে পারছি না আমি। শুধু জানি, বিপদ একটা ঘটবেই, এবং আমি বা বাবা নিজেদের চেঁচায় সে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবো না। কি করবো বুঝতে না পেরে পাগলের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিলাম, এই সময় আপনাদের সাইনবোর্ডটা দেখতে পাই। টাকা কোনো সমস্যা নয়, যে-কোনো মূল্যে আমরা শুধু প্রোটেকশন চাই...’

‘কিসের বিরুদ্ধে প্রোটেকশন? কার কাছে থেকে বিপদের আশংকা করছেন আপনি?’

ছ’বার কথা বলতে গেল মারিকা, ছ’বারই মুখ খুলে আবার বন্ধ করলো। ‘কি যেন বলতে চাইলেও পারছে না। অবশেষে হাল ছেড়ে, ছ’হাতে মুখ ঢেকে চুপচাপ বসে থাকলো।’

‘আপনার আসলে পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত, মারিকা।’

মুখ থেকে হাত সরালো মেয়েটা। ‘গিয়ে কি বলবো? যদি বলি, আমার বাবাকে মেয়ে ফেলা হবে বলে ডয় করছি, তারা আমাকে পাগল ভাববে না? যদি বলি, এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে যে অ্যাক্টরটিকায় না গিয়ে আমার উপায় নেই, এবং আমাকে জোর করে একজন লোক বিয়ে করতে চাইছে, কি ভাববে তারা আপনিই বলুন? আমি শুধু আশংকা করছি, কারো বিরুদ্ধে সূনিদিষ্ট কোনো প্রমাণ বাতী। অন্তঃ-১

তো দিতে পারছি না !’

‘আপনি চান, আপনার সাথে আমরা অ্যান্টার্কটিকায় যাই?’

‘হ্যাঁ। কারণ যা কিছু ঘটার সব সেখানেই ঘটবে। আপনাদের মধ্যে থেকে যে-ই আমার সাথে যাবেন, তাকে কয়েক মাস থাকতে হতে পারে অ্যান্টার্কটিকায়, সম্ভবত তিমি শিকারের মৌসুম শেষ না হওয়া পর্যন্ত।’

‘দাঁড়ান দেখি,’ বলে দেবরাজ থেকে একটা নোটবুক বের করে পাতা ওন্টালো রানা। অফিসে কার কি কাজ সব লেখা ওটায়। তিন মিনিট পর চোখ তুললো ও, নোটবুকটা রেখে দিলো দেবরাজে। মাথা নাড়লো। ‘দুঃখিত, মিস পাইটন। লগুনে হলে হয়তো সাহায্য করা যেতো। আমার সহকারীরা এই মুহূর্তে জরুরী এমন সব কাজে ব্যস্ত যে কারো পক্ষেই লগুন ত্যাগ করা সম্ভব নয়।’

‘সবাই ব্যস্ত? তাহলে... কিন্তু... কিন্তু আপনি?’

‘দুঃখিত। আজ রাতের ফ্লাইটে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। আফ্রিকায়। ঘাবড়াবার কি আছে, লগুনে আপনি আরো অনেক ইনভেস্টিগেশন ফর্ম পাবেন।’

‘প্যারিসে লেখাপড়া করেছি, লগুনের প্রায় কিছুই আমি চিনি না...’ অন্যমনস্কভাবে বললো মেয়েটা, কথা বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ‘ধন্যবাদ, আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম। কি জানি কি মনে করলেন আপনি। বিরক্ত করার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত,’ ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে একটা হাত নেড়ে লম্বা পা ফেলে এগোলো সে দেবরাজার দিকে, রানাকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে চলে গেল।

ফাইলে আবার মনোযোগ দেয়ার মিনিট তিনেক পর রানা উপলব্ধি করলো, কাজে মন বসছে না। হাতঘড়ি দেখলো ও। সোয়া একটা

বাঁধে, লোকজনের ফিরতে এখনো আধ ঘন্টা দেয় আছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। খুঁত খুঁত করছে মনটা। নিঃশাপ সয়ল চেহারাটা যারবার ফিরে আসছে চোখের সামনে। বিপদটা ঠিক কি ব্যাখ্যা করে বলতে পারেনি মেয়েটা, তবে তার আশংকা অমূলক না-ও ভোঁ হতে পারে। অসহায় একটা মেয়ে সাহায্য চেয়ে পেলো না, একটা অপরাধবোধ খচ খচ করে বিঁধতে লাগলো রানার বুকে। ভুল হয়ে গেছে, আরো কিছু প্রশ্ন করা উচিত ছিলো ওর, পুরো গল্পটা জানতে পারলে বিপদের গুরুত্বটা বোঝা যেতো। একজন মানুষের প্রশ্ন বাঁচানোর জন্যে রানা এজেন্সির লোকবল বা সময়ের অভাব হওয়া উচিত নয়।

হঠাৎ রানা আবিষ্কার করলো, মেয়েটার ঠিকানা বা ফোন নম্বরও রাখেনি ও। কী আর করা যাবে। ফোন করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাজে মন দিল আবার।

রাত একটার ফ্লাইট। সাড়ে বারোটায় হিথ্‌রো এয়ারপোর্টে পৌঁছেই ছঃসংবাদটা পেলো রানা। সুইডেন থেকে লন্ডনে আসার পথে ওর প্লেন মাঝ-আকাশে বিক্ষোভিত হয়েছে, আশংকা করা হচ্ছে ক্রু সহ আরোহীরা কেউই বাঁচেনি। আরোহীদের তালিকাটা সংগ্রহ করলো রানা, খানিকটা স্বস্তিবোধ করলো এই ভেবে যে তালিকায় ওর পরিচিত কেউ নেই। তারপর নিজের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো ও, সময়মতো কেপটাউনে পৌঁছতে না পারলে এতো সাধনার ফসল শত্রুপক্ষের হাতে চলে যেতে পারে। কিন্তু অহুস্কানে খবর নিয়ে জানলো, আগামীকাল পর্যন্ত আফ্রিকার দিকে আর কোনো ফ্লাইট নেই। অগত্যা একটা প্লেন চাটার করতে চাইলো রানা। ডেস্ক থেকে যাত্রা অন্ত-১

সবিনয়ে জানানো হলো ওকে, চাটার করার মতো যাত্রা একটা প্লেনই ছিলো, দশ মিনিট আগে সেটাও রিটার্ন করা হয়েছে। চাটার করেছেন একজন প্রাক্তন কর্নেল, নাম ওয়াকার রোসেট, পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর চেয়ারম্যান। প্রশ্ন করে রানা জেনে নিলো, প্লেনটার সিট আছে পাঁচটা, তবে আরোহীর সংখ্যা তিনজন। পাইলটের নাম জানলো রানা, তার সাথে ওর মৌখিক পরিচয়ও আছে। সে রানাকে বললো, কর্নেল রোসেট অত্যন্ত বদমেজাজী মানুষ, কেপটাউন পর্যন্ত রানাকে লিফট দিতে রাজি হবেন কিনা সন্দেহ। তবে, অমুরোধ করে দেখতে পারে সে।

পোনে একটায় পৌঁছলেন কর্নেল ওয়াকার রোসেট, সাথে রানার জন্যে একটা বিস্ময়। টার্মিনাল অফিসে ঢুকে জলদগন্তীর গলায় হুংকার ছাড়লেন তিনি, 'প্লেন রেডি?' ভদ্রলোক বিশাল দেহী, চেহারায় কতৃৎসের ভাব, লাল মুখ, হাবভাবে সদা-ব্যস্ততা। তাঁর সাথে আরো তিনজন মানুষ রয়েছে—দু'জন পুরুষ, একটা মেয়ে। মেয়েটাই রানার বিস্ময়। মারিকা পাইটন কেপটাউনে যাচ্ছে, সম্ভবত ওখান থেকে অ্যান্টার্কটিকায় যাবে। রানাকে দেখলো সে, কিন্তু উদাস নিলিঙে চেহারায় কোনো ভার ফুটলো না। আজ দুপুরে কথা হয়েছে, কাজেই চিনতে না পারার কারণ নেই। রানা ধারণা করলো, লোকজনের সামনে ওর সাথে কথা বলতে চাইছে না মেয়েটা। এমনও হতে পারে, এখন আর কারো সাহায্য পাবার সম্ভাবনা বা দরকার আছে বলে মনে করছে না সে।

উদি পরা একজন শোকার ওদের লাগেজ নিয়ে এলো। ক্লার্ক জানালো, 'পাইলট অপেক্ষা করছে। আপনি শুধু ফর্ম সই করুন, কর্নেল ওয়াকার। ও, হ্যাঁ, একটা তার এসেছে, আধ ঘণ্টা আগে।'



এনভেলাপটা ছিঁড়লেন কর্নেল ওয়াকার। শিঙের তৈরি চশমা  
ফ্রেমটা কপালে তুলে আলোর নিচে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। কাঁচা-  
পাকা ঘন ভুরুর নিচে তাঁর চোখ দুটো কঠিন। হঠাৎ তিনি চরকির  
মতো আধপাক ঘুরলেন। 'এই যে, মারিকা, এটা পড়ো।' কাগজটা  
মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন, রানা লক্ষ্য করলো ভদ্রলোকের  
হাতটা একটু কাঁপছে।

একজোড়া ম্যাকস পরেছে মেয়েটা, গায়ে সবুজ উলেন জাসি। তার  
কাঁধে অবহেলার সাথে ফেলা রয়েছে অভ্যস্ত দামী একটা মিক্স কোট।  
কোমল চেহারায় ক্রান্তি আর উদ্বেগ। মেয়েটা ওর দিকে তাকিয়ে  
নেই দেখে তার শরীরের ওপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলো  
রানা। পরমুহূর্তে একটা ঢোক গিললো ও, সেই সাথে চোখ রাঙালো  
নিজেকে। তবে মনে মনে স্বীকার করলো, শিল্পীদের আদর্শ একটা  
মডেল হতে পারে মারিকা পাইটন, ঈশ্বর তাকে অকুপণ হাতে যৌবন  
দান করেছেন।

টেলিগ্রামটা পড়ে মুখ তুললো মারিকা, ঠোট দুটো পরস্পরের  
সাথে সঁটে আছে শক্তভাবে, চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি।

'কি বুঝলে?' প্রায় ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল ওয়াকার।

কথা না বলে মেয়েটা শুধু তাকিয়েই থাকলো।

'কি হলো, কিছু বলছো না যে?' চাপা গর্জন বেরিয়ে এলো  
কর্নেলের গলা থেকে। 'প্রথমে তুমি, তারপর তোমার বাবা! ছেলে-  
টাকে তোমরা পেয়েছো কি? কেন তোমরা তার পেছনে লেগেছো?'  
অকস্মাৎ ডেস্কের ওপর প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিলেন তিনি। পেপার-  
ওয়েটটা লাফ দিয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। 'মার্ককে আমি কিছুতেই  
যাত্রা অশুভ-১

ফিরিয়ে আনবো না। তোমার বাপকে তার সাথে মানিয়ে চলতে হবে। এরপর আবার যদি এ-ধরনের অভিযোগ করে সে, আমি তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করবো। সে-ই একমাত্র লিডার নয়, খুঁজলে আরো ছ'চারজন পাওয়া যাবে।'

'তা পাওয়া যাবে, কিন্তু আপনি যে রেকর্ড চান তা একমাত্র বাবাই দিতে পারবে,' রাগে চেহারা লাল হয়ে উঠলেও, নিজেদের সামলে রেখে শান্তভাবে জবাব দিলো মারিকা পাইটন।

উত্তরে কড়া কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কর্নেল ওয়াকার, হঠাৎ রানাকে দেখতে পেয়ে মুখ খুললেন না। ঘুরে ডেস্কের দিকে ফিরলেন তিনি, পসখস করে সেই করলেন ফর্মে, কাঁপা হাতে। তাঁর দিকে তাকিয়ে হতাশায় ভুগছে রানা, এ-লোককে অনুরোধ করা বোকামি হবে। তারমানে কেপটাউনে ওর যাওয়া হচ্ছে না।

রানা তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরেই বোধহয় বাট করে ঘাড় ফেরালেন ভদ্রলোক, এক পা এগোলেন ওর দিকে, প্রায় মারমুখো ভঙ্গি, জানতে চাইলেন, 'আপনি, স্যার, স্বেচ্ছা প্লেনের জন্যে অপেক্ষা করছেন, নাকি আমার সাথে কথা বলতে চান?'

'প্লেনের জন্যে অপেক্ষা করছি,' বললো রানা।

যেঁৱ করে একটা আওয়াজ করলেন কর্নেল ওয়াকার, রানার ওপর থেকে চোখ সরালেন না।

'প্লেনটা পাবো কিনা নির্ভর করছে আপনার ওপর,' বললো রানা। বদমেজাজী হলেও, কেপটাউনে পৌঁছানোর স্বার্থে ভদ্রলোককে অনুরোধটা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। 'আমার নাম মাসুদ রানা, একটা ইনভেস্টিগেশন ফর্মে আছি। পাইলট আমাকে চেনে। সে-ই আমাকে বললো, আপনার প্লেনে নাকি সিট খালি আছে। তাই

ভাবছিলাম...।’

‘আপনি লিফট চাইছেন?’

‘পেলে উপকার হতো।’ রানা সচেতন, মারিকা পাইটন ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

‘দয়া বা উপকার, এ-সবে আগার বিশ্বাস নেই,’ কর্কশ গলায় বললেন কর্নেল ওয়াকার রোসেট। ‘রাস্তা মাপুন।’

প্রচণ্ড রাগ হলেও, নিজেকে সামলে রাখলো রানা। শাস্ত্রমূরে শুধু বললো, ‘ভুলে যান।’ খুঁকে নিজের ব্যাগগুলো তুলে নিলো ও। মেয়েটার দিকে একবারও না তাকিয়ে দরজার দিকে এগোলো।

পিছন থেকে মারিকার চাপা গলা শুনতে পেলো রানা, কর্নেল ওয়াকারকে তিরস্কার করছে, ‘মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার না করলেই কি নয়? ভদ্রলোক শুধু একটা লিফট চেয়েছেন...।’

দরজার কাছে পৌছে গেছে রানা, শুনতে পেলো কর্নেল শ্বেষাশ্বক কঠে জিজ্ঞেস করছেন, ‘তুমি চাও লোকটাকে আমি লিফট দিই?’

উত্তরটা শোনার জন্যে অপেক্ষা করলো না রানা, টামিনালের বাইরে বেরিয়ে এলো। ট্যাক্সি খুঁজছে, এই সময় উদি পরা শোফার ছুটে এলো। ‘স্যার, কর্নেল আপনাকে ডাকছেন।’

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলো রানা, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরলো। টামিনালে ফিরে এসে কর্নেলের সামনে দাঁড়ালো ও।

‘আমার হবু পুত্রবধু বলছে, আমি নাকি আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছি,’ বদমেজাজী কর্নেল ভারি, গম্ভীর গলায় বললেন। ‘সত্যি যদি তাই হয়ে থাকে, দুঃখ প্রকাশ করছি।’

‘শুধু এইজন্যে না ডাকলেও চলতো,’ বললো রানা।

‘ডেকেছি এ-কথা বলার জন্যে যে সময়মতো যদি কাগজ-পত্র রেডি

করতে পারেন, কেপটাউন পর্যন্ত আমাদের সাথে যেতে পারেন  
আপনি ।’

‘সে-সব আগেই সেরে রেখেছি আমি,’ বললো রানা । ‘ধন্যবাদ ।’

‘কি !’ ভুরু কুঁচকে রানার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন কর্নেল ।  
‘আপনি জানতেন, লিফট পাবেন ?’ ভদ্রলোক হঠাৎ গলা ছেড়ে হেসে  
উঠলেন । ‘এ-ধরনের এফিশিয়েন্সি কোথেকে অর্জন করলেন, জানতে  
পারি ? আমিতে, নাকি নেভিতে ?’

‘আমি একজন প্রাক্তন মেজর,’ সবিনয়ে বললো রানা । ‘তবে  
ন্যাভাল অপারেশনেও অংশগ্রহণ করেছি ।’

‘মানে ?’

‘আপনি নিশ্চয়ই হুমা-র নাম শুনেছেন ? আমি ওটার সাথে  
জড়িত ।’

ব্রাইট অফিস থেকে বেরিয়ে এসে পাইলট রানার দিকে তাকালো,  
উত্তরে মুহূ হাসলো রানা । আরোহীদের তালিকা হাতে নিয়ে কর্নেল  
ওয়ার্ডারের দিকে তাকালো পাইলট । জিজ্ঞেস করলো, ‘তালিকায়  
চারজনের নাম দেখছি, কর্নেল ?’

‘হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত আমার পুত্রবধূকে সাথে যেতে রাজি করতে  
পেরেছি,’ কথাটা বলে আড়চোখে মারিকার দিকে তাকালেন কর্নেল,  
ঠোটে মিটি মিটি হাসি নিয়ে ।

‘দেখুন !’ রাগের সাথে কর্নেলের দিকে ফিরলো মারিকা পাইটন ।  
লোকজনের সামনে নিজেকে সামলে রাখার চেষ্টা করলো সে, আর  
কোনো কথাই বলতে পারলো না ।

‘আহা, রাগ করো কেন !’ নরম স্বরে বললেন কর্নেল ওয়ার্ডার ।  
‘বিয়ের কথাবার্তা তো পাকাই হয়ে গেছে । তোমাকে তো বলেছি, ভয়



মানার কিছু নেই—আমার শেয়ার থেকে অর্ধেক আমি তোমাকে  
সিঁথে দেবো।’

‘কিন্তু এখনো আমাদের বিয়ে হয়নি, কর্নেল!’ চাপা গলায় বললো  
নারিকা। ‘এবং হবে কিনা তা-ও আমরা কেউ জানি না।’

‘জানি না মানে? একশো বার জানি! মার্ক আমার সম্ভাব পেয়েছে,  
একই বদমাগী—একমাত্র তোমার মতো একটা মেয়েই ওকে নামলে  
স্বাক্ষতে পারবে। মার্ক তোমাকে ভালোবাসে, তুমিও বাসো, এরপর  
কি কথার কথা কি? খুঁটিনাটি আর যে ব্যাপারগুলো ঘটে গেছে, ও কিছু  
কাল সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তো তোমাকে বলেইছি,  
ক্যান্টার্কটিকার চলো, তোমার সেই জিনিসগুলো মার্ক ফেরত দেবে  
তোমাকে। সে তোমাকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছে, এটা তোমার  
ভুল ধারণা।’

জিনিসগুলো কি জানা গেল না, কারণ লজ্জায় বা অপমানে মাথা  
নিচু করলো নারিকা পাইটন, তার চোখের কোণে পানি টলটল করতে  
দেখলো রান।

খুক করে কেশে পাইলট জানতে চাইলো, ‘হেলমুট বার্গার কে?’  
‘হু’জন পুরুষের মধ্যে জার্মান লোকটা এগিয়ে এলো। ‘আমি,’  
রোগাপটক। এক লোক, গলার আওয়াজ খসখসে, প্রায় শোনাই যায়  
না। ছোট্ট শরীরে কয়েক সাইজ বড় কাপড়। ‘আমার কাগজ-পত্র,  
দেখাতে হবে?’

‘না, দরকার নেই।’

‘আর আমি ওকোমো, কাইন্স ওকোমো।’ বঁটে লোকটা আপানী,  
অসম্ভব চওড়া। উটের পশম দিয়ে তৈরি একটা কোট পরে আছে  
সে, কাঁধের কাছে প্যাড লাগানো। কোমরে দু’ইঞ্চি চওড়া বেন্ট শক্ত

করে বাঁধা, পীকক রু স্কাফ জড়িয়েছে গলায়। পাইলটের হাত ধরে ঝাঁকবার সময় তার হাতের চারটে আঙুলি ছাতি ছড়ালো। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে, নাকি সুরে সে বললো, 'প্লেন চালানো আসলে একটা শিল্প, কাজেই আপনি একজন শিল্পী। আমিও একজন শিল্পী। আশা করি,' কো-পাইলটের দিকে তাকালো সে, 'আপনারা দু'জনেই দক্ষ শিল্পী, আমাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না।' কথার শেষে গলা ছেড়ে হেসে উঠলো সে।

কাস্টমসের ক্যামেলা সেরে প্লেনে চড়ে বসলো সবাই। কো-পাইলট ককপিট থেকে বেরিয়ে এসে দেখে গেল সিটবেন্ট বাঁধা হয়েছে কিনা। কেউ কোনো কথা বলছে না, তবে সবার পেশীই আড়ষ্ট হয়ে আছে। কর্নেল ওয়াকার চোখ বুজে আছেন। মেয়েটা সামনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে, হাত দুটো সিক কোর্টের পকেটে ঢোকানো। সিক স্কাফ দিয়ে মাথাটা ঢাকা তার কোঁকড়ানো চুলের কয়েকটা গোছা বেরিয়ে আছে বাইরে। নিজের সিটে বসে ঘন ঘন ঠোঁট চুষছে কাইসু ওকোমো, হাত দুটো মুহূর্তের জন্যে স্থির রাখতে পারছে না। মাথা নয় যেন রাবারের বল, একবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে, পরমুহূর্তে উকি দিয়ে দেখছে আশপাশের সিটে কে কি করছে। শাস্ত্র ও নিকৃৎ মনে হলো একা শুধু হেলমুট বার্গারকে। সিটের ওপর যেন পুরনো কাপড়ের একটা সুপ পড়ে আছে।

নিরাপদে আকাশে উঠে এলো প্লেন। সিট বেন্ট খুললো রানা। ওর পিছন থেকে হঠাৎ কর্নেল ওয়াকার কথা বলে উঠলেন, 'মারিকা, হেলমুটের সাথে সিট বদল করো। ওর সাথে নতুন হারপুন নিয়ে আলাপ করতে চাই।'

মেয়েটা জবাবে বললো, 'আপনার বিশ্রাম নেয়া দরকার....।'

‘আমি ভালো আছি।’

‘কিন্তু ডাক্তার ম্যাকেল্লি বলেছেন...’

‘তুলি মারো ডাক্তার ম্যাকেল্লিকে।’

‘আপনি সাবধান না হলে নিজেকে খুন করবেন।’

শান্ত হতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিলেন কর্নেল, তারপর নরম গলায় বললেন, ‘তোমাদের সমস্যার সমাধান না দেখে আমি মরবো না। টেলিগ্রামটা কোথায়? তোমাকে না দিয়েছিলাম?’

ফার কোর্টের পকেট হাতড়ে কাগজটা বের করে কর্নেলকে দিলো মারিকা। আওয়াজ শুনে রানা বুকলো, ত্রিফকসের ওপর সেটার ভাঁজ খোলা হলো। কয়েক সেকেন্ড পর অসন্তোষসূচক একটা আওয়াজ করলেন তিনি। ‘এ-ধরনের টেলিগ্রাম পাঠানোর অধিকার বোনারের নেই!’ আবার তিনি ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। কাগজটা ছিঁড়ে ফেলার শব্দ পেলো রানা। ‘ছেলেটাকে কোনো সুযোগই দে দিতে চাইছে না। কারণটা কি এই যে আমি মারা যাবার পর কোম্পানীটা নিজের দখলে রাখতে চায় সে? ভাবছে, তার সামনে একমাত্র বাধা মার্ক?’

‘বাবা আপনার বন্ধু, তাকে আপনি চেনেন, তার সম্পর্কে এ-ধরনের অন্যায় কথা আপনি কি করে ভাবতে পারছেন?’ ঝাঁঝের সাথে জিজ্ঞেস করলো মারিকা।

‘বন্ধুর পিঠে বন্ধু ছুরি মারে না?’ পান্টা প্রশ্ন করলেন কর্নেল। ‘আমি না চাইলেও, ভাবতে আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে। কেপটাউন থেকে বেরিয়েছে ওরা এক হুগাও হয়নি, দু’জনের সম্পর্ক দাঁড়ালো সাপে-নেউলে— কেন?’

‘কেন, আপনি জানেন না?’

‘আমি জানি মার্ক অনভিজ্ঞ, তার এই দুর্বলতাকে কাজে লাগাচ্ছে

বোনায় ।’

‘এটা তো মার্কের বানানো গল্প ।’

‘তুমি চাও আমার ছেলেকে আমি অবিশ্বাস করি ?’

‘নিজের ছেলে হলেও আপনি তাকে ভালো করে চেনেন না, চেনেন কি ? বছরের পর বছর আপনি হয় অ্যাক্টার্টিকায় নয়তো সুইটছার-ল্যাণ্ডের ক্লিনিকে কাটিয়েছেন, লণ্ডন আর প্যারিসে মার্ক কি কাণ্ড করে বেড়িয়েছে তার কোনো খবরই রাখেননি ।’

‘ছেলে বড় হলে তার অনেক ব্যাপার দেখেও না দেখার ভান করতে হয় ।’

‘সম্ভবত আপনার এ-ধরনের নীরব প্রশ্নর পেয়েই এতখানি নষ্ট হয়ে গেছে মার্ক ।’

‘তুমি আর তোমার বাবা, দু’জনেই তোমরা তার সম্পর্কে আজে-বাজে কথা বলছো । মার্ক নষ্ট হয়ে গেছে কথাটার মানে কি ? তোমার বাবা লিখেছে, টেনসবার্গের লোকজনদের মার্ক নাকি খারাপ চোখে দেখছে, তারা নাকি মার্কের ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট । কেন, কিভাবে ? আমার কোম্পানীতে যারা কাজ করে তারা সবাই লাভের অংশ পায়, দলাদলি জিনিসটা কখনোই তাই দেখা যায়নি । জুরা সবাই চায় অভিযান সফল হোক... ।’

‘বাবা যদি অভিযোগ করে থাকে, কথাটা সত্যি বলে ধরে নিতে হবে,’ দৃঢ়কণ্ঠে বললো মারিকা । ‘আপনিও জানেন, কোম্পানীর স্বার্থটাকেই বড় করে দেখে সে ।’

‘তাহলে এ-ধরনের একটা টেলিগ্রাম কেন পাঠালো ? কেন সে চাইছে মার্ককে আমি ফিরিয়ে নিই ?’

‘কারণ মার্ক তার কাজে বাধা সৃষ্টি করছে । বাবার নেতৃত্ব সে মানতে চাইছে না । মার্কের যা স্বভাব দাঁড়িয়েছে... ।’



‘তুলে যেয়ো না, মার্ক তোমার স্বামী হতে যাচ্ছে। তার সম্পর্কে কথা বলার সময় তোমার সংযত হওয়া দরকার।’

‘আমি চাই, আপনি তার নেচার সম্পর্কে সবকথা জাহ্নন। তার বিয়ের কথা তুলবেন না, প্লিজ। কারণ মার্ক রোসেটকে আমি বিয়ে করবো না।’

‘বিয়ে করবে না? আঙুটি দরার পর এ-কথা আসে কি করে? কেন, তাকে তুমি ভালোবাসো না?’

‘বাসতাম, তখন তাকে আমি চিনতে পারিনি। এখন তাকে আমি চুপা করি।’

‘শাট আপ!’ চাবুকের মতো সপাং করে উঠলো কর্নেলের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর।

‘কেন চুপ করবো?’ পাল্টা প্রশ্ন করলো মারিকা। ‘আমি ছোটোবেলা থেকে আপনার স্নেহ পেয়ে আসছি, তাই আপনার বখাটে ছেলেটাকে আমার বিয়ে করতে হবে? সত্যি কথা বলতে কি, প্রথমে আমি তার প্রেমে পড়িনি—আপনিই তার কাছে আমাকে ঘন ঘন পাঠিয়েছিলেন, আমি যাতে তার অস্থিরতা দূর করার চেষ্টা করি। তখনো তার সম্পর্কে আমি কিছু জানতাম না, কাজেই কিছু দুর্বলতা আসে আমার। সরল একটা মেয়ে ভালোবেসে ঘনিষ্ঠ হলো, লুকিয়ে রাখা ক্যামেরার সাহায্যে অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলোর ফটো তুলে রাখলো মার্ক। তারপর আমি যখন তার আসল রূপ টের পেলাম, সে আমাকে ফটোগুলোর কথা বলে ভয় দেখাতে লাগলো, বিয়ে না করলে সেগুলো সে খবরের কাগজে ছাপতে পাঠাবে। আপনি যদি সত্যি আমাকে স্নেহ করেন, সত্যি যদি আমার ভালো চান, এরপরও কি বলবেন মার্ককে আমার বিয়ে করা উচিত?’

‘তুমি ভুলে যাচ্ছে, মার্ক এখনো ছেলেমানুষ । কটো তোলা ব্যাপারটা, এটাকে তুমি একধরনের ফ্যাটাসী বলে উড়িয়ে দিতে পারো । বয়সকালে এক-আধটু উদ্ভট খেয়াল থাকে না মানুষের ?’

‘মুশকিল হলো, তাকে আপনি এখনো চিনতে পারেননি । দশ বছর আগে যেমন ছিলো, আপনি ভাবছেন মার্ক আজও তেমনি আছে ।’

‘তাহলে তোমার কাছ থেকে নিজের ছেলে সম্পর্কে জানতে হবে আমাকে ।’

‘আপনি জানেন, সে ক্রমতা-লোভী ? মানুষ, মেশিন আর প্রতিষ্ঠান, এগুলোকে এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচণ্ড একটা নেশায় উন্মাদ হয়ে আছে সে । আপনি জানেন, নিরো-নাংসী আন্দোলনের একজন নেতা সে ? আপনি তার বাপ, তার সম্পর্কে সব কথা আপনাকে বলা যায় না । শুধু এটুকু জেনে রাখুন, তার মতো স্যাডিস্টিক ক্যারেঙ্টার শয়তান উপাসকদের মধ্যেও খুব কম দেখা যায় । সে তার মায়ের কাছ থেকে এমন সব বদস্বভাব পেয়েছে... ।’

‘মারিকা ! মুখ সামলে কথা বলো !’

‘আপনি অশুশ্রু, তাই এতোদিন এ-সব কথা আপনাকে আমি বলিনি । আজ যখন আপনি অ্যান্টার্কটিকায় যেতে পারছেন, ধরে নিচ্ছি সব কথা শোনার শক্তি আপনার আছে ।’

‘আমি শুনবো না ।’ কর্নেল তাঁর কোভ দমন করার চেষ্টা করছেন ।  
‘তুমি প্রলাপ বকছো, আমি শুনবো না !’

‘শুনবেন না ? তারমানে আপনি আসল ঘটনা জানতে চান না ?’  
এক সেকেন্ড পর কর্নেল বললেন, ‘ঠিক আছে, শুনবো । নিরিবিলিতে ।’

‘বেশ ।’ ফৌস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো মারিকা পাইটন ।

‘হেলমুট!’ ইকি ছাড়লেন কর্নেল, রানার পাশে বসা লোকটা ঝাঁকি খেলো। ‘আমার পাশে উঠে এসো।’ এরপর তিনি মারিকাকে নির্দেশ দিলেন, ‘সিট বদল করো। এবং শান্ত হও।’

জার্মান লোকটার সাথে সিট বদল করলো মেয়েটা। তার চেহারা ভাল হয়ে আছে, হাত দুটো শক্ত মুঠো পাকানো, আঙুলের ডগা সাদা। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্থির বসে থাকলো সে, রানার দিকে তাকালো না একবারও। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকলো রানা।

এঞ্জিনের শব্দের ফাঁকে পিছন থেকে ওদের কথাবার্তা ভেসে আসছে, ‘দু’দিন আগেই পৌছে গেছে ইকুইপমেন্ট...লিবার্টি-থ্রু ওগুলো সংগ্রহ করবে...রকম্যানকে বলেছি সে যেন আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে...পরীক্ষার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে...।’

ঘুম না আসায় সময় কাটছে না, পাইলটের সাথে গল্প করার জন্যে ককপিটে চলে এলো রানা। আধ ঘণ্টা পর নিজের সিটে ফিরে এসে দেখলো, আগের মতোই বসে আছে মারিকা, একচুল নড়েনি। ইতিমধ্যে জাপানী ফটোগ্রাফার কাইসু ওকোমো ঘুমিয়ে পড়েছে, খোলা মুখ থেকে সশব্দে বেরিয়ে আসছে বাতাস। মারিকার চোখ খোলা, সরাসরি সামনের দিকে তাকিয়ে আছে সে, কিন্তু কিছু দেখছে বলে মনে হলো না রানার।

ভোরের দিকে আলস পেরিয়ে এলো প্লেন, ল্যান্ড করলো ট্রেভি-জো-য়। ব্রেকফাস্ট সারার জন্যে কাইসু ওকোমোর সাথে ক্যানটিনে চলে এলো রানা। লোকটা বেশি কথা বলে, আত্মপ্রচারে তার কোনো কুণ্ঠা নেই। বারতিনেক রানাকে সে জিজ্ঞেস করলো, ‘কাইসু ওকোমোর নাম নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন, মিঃ রানা? স্বনামধন্য ফটোগ্রাফার?’

সকৌতুকে মাথা ঝাঁকালো রানা, ভাব দেখালো যেন শুনেছে।

হাত দুটো হুঁপাশে মেলে দিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো।  
কাইসু ওকোমো। 'আপনি আমাকে বোকা বানাতে পারেননি, মিঃ  
রানা। কাইসু ওকোমোর খ্যাতি সম্পর্কে আপনার জানা নেই।'

'আন্টার্কটিকায় কেন যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'ভিমি  
শিকারের ছবি তোলার জন্য?'

'এই একটা সাবজেক্টই বাকি আছে, সেটা কাভার করতে যাচ্ছি।'  
ফটোগ্রাফারের চওড়া মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটলো। 'মিঃ ওয়াকার  
রোসেট আমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন, তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।'

'ওদের সাথে কতোদিনের পরিচয় আপনার?'

ছোটো চোখ জোড়া সতর্ক হয়ে উঠলো কাইসু ওকোমোর। 'পরিচয়  
নতুন, সম্পর্ক পেশাগত।' এরপর উপযাচক হয়ে রানাকে একটা উপদেশ  
দিলো সে, 'বয়সে আপনার চেয়ে আমি বড়, তাই আপনাকে একটা  
পরামর্শ দিই। উটকে। ঝামেলা সব সময় এড়িয়ে চলবেন, বেঁচে থাকাটা  
তাতে স্বস্তিকর হবে। জগৎসংসার বড় কঠিন জায়গা। আমাকে দেখুন  
না, আজ আমেরিকার কোনো চিড়িয়াখানায় ছবি তুলছি, তো কাল  
চলে যাচ্ছি লেনিনগ্রাদ মিউজিয়ামে। পরের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামালে  
নিজের কাজের ক্ষতি করা হবে না?'

'পরের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করে, এমন সুখী লোকেরও  
কিন্তু জগৎসংসারে অভাব নেই,' মুহূর্তে বলালো রানা। 'আমি তো  
এমন লোককেও চিনি, পরের দুঃখ বা অভিযোগ শোনাটাকে জীবনের  
ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে।'

'আপনি ঋষিদের কথা বলছেন। দেবতুল্য হুঁ একজন মানুষ আজও  
দুনিয়াতে নেই, এ কথা আমি বলি না। কিন্তু আমার কথা যদি বলেন,  
মহৎ যতো চিন্তা সব নিজেকে ঘিরে। পরের জন্যে দেয়ার গতো সময়



বা মানসিকতা আমার নেই। কেউ বলতে পারবে না। জীবনটা আমার অশান্তিময়।’

লোকটার সাথে আলাপ করার উৎসাহ হারিয়ে ফেললো রানা।

পরবর্তী যাত্রাবিরতি কাররোতে। প্লেনে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়ার মেরামতের পর আবার রওনা হতে ছ’ঘণ্টা দেরি হবে। প্লেন থেকে নেমে এসে ঝড়ো হাওয়ার সামনে পড়লো রানা। পুরনো বন্ধুদের খোঁজে একটা ট্যাক্সি নিয়ে শহরের দিকে চলে গেল কাইসু ওকোমো। কর্নেল ওয়াকার প্লেন থেকে নামেননি, তাঁর বিশ্রাম দরকার। অশুশ্ৰ-বোধ করছে হেলমুট বার্গার, সে-ও নামেনি। টার্মিনাল ভবনের দিকে একাই হাঁটছে রানা, কোথাও সঙ্গে কফি খাবার সময় সিদ্ধান্ত নেবে সময়টা কিভাবে কাটানো যায়। হঠাৎ পিছন থেকে ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়লো ও।

‘মিঃ রানা!’

ঘুরলো রানা। ওকে ধরার জন্যে হন হন করে এগিয়ে আসছে মারিকা পাইটন। কাছে এসে, কথা না বলে, রানার একটা হাত আঁকড়ে ধরলো সে। অপর হাতটা নিজের সরু কোমরে। চওড়া, সুগঠিত বুক ঘন ঘন ওঠানামা করছে। মায়াভরা কোমল চোখ তুলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

আড়ষ্টবোধ করলো রানা, কি বলবে বুঝতে পারলো না। অস্থিতি থেকে মারিকাই উদ্ধার করলো ওকে। ‘মিঃ রানা, আপনি আমাকে শহরে নিয়ে যাবেন... কফি খেতে বা স্নেক একটু সঙ্গ দিতে! জানেন, আমি খুব অসহায়বোধ করছি। জীবনে কখনো এমন একটা লাগে-নি...।’ রানার মনে হলো, এখুনি বোধহয় কেঁদে ফেলবে মেয়েটা।

‘ঠিক আছে, বেশতো, চলুন না,’ বলে তার হাতে মৃদু চাপ দিল যাত্রা অন্ত-১

রানা, অসুস্থ করলো মারিকা। কাপছে না, কিন্তু স্পর্শটুকু নৈরাতিক  
ধাক্কার মতো লাগলো। টামিনাল থেকে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি  
নিলো ওরা।

শহরের দিকে ছুটছে ট্যাক্সি। কেউ ওরা কথা বলছে না। রানা  
কোনো তাগাদা দেবে না বলে ঠিক করেছে, জানে যদি কিছু বলার  
থাকে আপনা থেকেই বলবে মেয়েটা।

আরো প্রায় দশ মিনিট নিঃশব্দে কাটলো। তারপর মারিকা  
বললো, 'আমি দুঃখিত।'

'কেন?'

'এভাবে আপনার ঘাড় চেপে বসলাম। সঙ্গিনী হিসেবে আমি  
একটা উপদ্রব বৈ তো নই।' হঠাৎ মারিকার খেয়াল হলো, ট্যাক্সিতে  
ওঠার পর থেকে রানার একটা হাত শক্ত করে ধরে আছে। তাড়াতাড়ি  
হাতটা ছেড়ে দিলো সে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে মারিকার দিকে বাড়িয়ে দিলো  
রানা। 'কলংকের কোনো দাগ যদি লেগে থাকে, তাড়াতাড়ি মুছে  
ফেলুন।' উদ্দেশ্য সফল হলো ওর, রান কোমল চেহারা এক পলকে  
গোলাপের মতো বিকশিত হয়ে উঠলো, হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে  
এলো হাসির মিষ্টি আওরাজটা।

শহরে পৌঁছে একটা বার আন্ড রেস্টুরেণ্টে ঢুকলো ওরা। 'কি  
খাবেন বলুন,' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'কফি, চা, নাকি ঠাণ্ডা কিছু?'

'হুইস্কি, আপনার যদি আপত্তি না থাকে।'

অর্ডার দিলো রানা। অবহাওয়া, বিশ্বকাপ ফুটবল, গ্রীনহাউজ  
এফেক্ট ইত্যাদি নিয়ে আলাপ করার বার্ষ চেষ্টা করলো ওরা। হুইস্কি  
আসার পর ঘন ঘন চুমুক দিলো মারিকা। রানা লক্ষ্য করলো, খানিক

পরপরই অন্য এক ভাগতে চলে যাচ্ছে মেয়েটা, চোখ দুটো অতীত বা ভবিষ্যৎ দেখার চেষ্টা করছে। অবশেষে ও-ই প্রশ্ন করলো, 'বললে যদি হালকা হতে পারেন, আমার চেয়ে ভালো শ্রোতা আপনি পারেন বলে মনে হয় না।'

'ইয়া, সম্ভবত। আপনি বলেছিলেন বটে আফ্রিকায় আসবেন, কিন্তু বলেননি আফ্রিকার কোথায়। কেপটাউনে কেন যাচ্ছেন?'

'কাজ আছে,' সংক্ষেপে বললো রানা।

'আপনি বোধহয় এখনো ব্যস্ত, তাই না? আমার সাথে অ্যাটর্কটিকায় যেতে পারবেন না?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করলো রানা। একটা পারিবারিক কৌন্দলে জড়িয়ে পড়ার দরকার কি। মারিকার বাবা বোনার পাইটন সম্পর্কে যতোটুকু জানতে পেরেছে ও, তত্বেলোক যথেষ্ট দৃঢ়চেতা, নিজের বা মেয়ের বিপদ তিনি কাটিয়ে উঠতে পারবেন। 'না,' সংক্ষেপে বললো রানা। 'আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরতে হবে আমাকে।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো মারিকা। কয়েক সেকেন্ড চোখ বুজে থাকলো সে, বললো, 'নিজের কথা ভাবছি না। বাবার কথা ভেবে ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। কেন যে এতো ভয় পাচ্ছি জানি না, কিন্তু পাচ্ছি। কাল রাতে প্লেন আতংকিত হয়ে পড়েছিলাম আমি।' হুঁহাতে মুখ ঢাকলো সে। 'ওহ, গড!' ককিয়ে উঠলো। 'একি হলো আমার!'

মেয়েটাকে সাস্থনা দেয়ার ইচ্ছে হলেও বলার মতো কিছু খুঁজে পেলো না রানা। একটা সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষা করছে।

এক সময় মুখ থেকে হাত সরালো মারিকা। রানার সামনে একটা হাত পাতলো। 'কমালটা দেবেন?' সেটা নিয়ে চোখের পানি মুছলো।

‘কাল সারারাত আমার বাবা আর মার্কের কথা ভেবেছি আমি—  
আন্টার্কটিকায় ওরা না জানি কি করছে।’

‘মার্ককে আপনি ভালোবাসতেন, তাই না?’

‘হ্যাঁ, বাসতাম।’

‘কি ঘটলো?’

‘হঠাৎ জানতে পারলাম গোপন একটা সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছে সে  
রাস্তা থেকে মেয়েদের ধরে নিয়ে এসে রেপ করছে দলটা। ইউনিভার-  
সিটির মেয়েদেরকে দলের সদস্য হবার প্রস্তাব দেয় ওরা, রাজি না হলে  
তার কপালে সর্বনাশ নেমে আসে। ইউরোপ জুড়ে নিয়ো-নাংসীবাদে  
প্রচারণা চালাচ্ছে ওরা। তারপর...।’

‘তারপর?’

‘তারপর সে তার মায়ের প্ররোচনায় টনসবার্গের লোকজনকে বা-  
দিয়ে স্যাণ্ডেফিওর্ডের চোকাতে গুরু করলো কোম্পানীতে। তার মা  
স্যাণ্ডেফিওর্ডের মেয়ে। এ বছর সে তার বাবাকে রাজি করিয়ে, সহ-  
কারী ম্যানেজার হিসেবে অভিযানে গেছে আন্টার্কটিকায়। আমি  
তাকে বিয়ে করতে রাজি নই জানতে পেরেই আন্টার্কটিকায় যাবার  
সিদ্ধান্ত নেয় সে, যাবার আগে হুমকি দিয়েছে : তোমার তেজ কিভাবে  
কমাতে হয় আমার জানা আছে। রওনা হবার ক’দিন পরই সে অভি-  
যোগ করে টেলিগ্রাম পাঠায়, বাবা নাকি টনসবার্গের লোকজনকে তার  
বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলছে। এ-ধরনের টেলিগ্রাম একের পর এক আসতে  
লাগলো, তারপর সে জানালো, বাবা নাকি খোলাখুলি বলে বেড়াচ্ছে,  
খুব শিগগিরিই কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ তার হাতে চলে আসছে। আমার  
বাবা কেমন মানুষ আমি জানি, এ-ধরনের কথা কিছুতেই বলবে না সে  
কোনোদিন।’

‘কারণটা কি, কি চাইছে মার্ক ?’

‘আমাদের বিয়েতে প্রথমে রাজি ছিলো বাবা, কিন্তু আমার মত নেই জানার পর মার্ককে আমার আশা ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছে। বাবার সাথে কর্নেল কাকুর সম্পর্কটা নষ্ট করতে চাইছে মার্ক। আমাকে সে বলেওছে, কর্নেল কাকু মারা গেলে সে-ই হবে পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর চেয়ারম্যান।’

‘কর্নেল ওয়াকার কি রকম অসুস্থ ?’

‘তার হাটের অবস্থা একদম ভালো নয়। একবার স্ট্রোক হয়ে গেছে। সেজন্যেই এবার মার্ককে তিনি অ্যাক্টার্টিকায় যেতে বাধ্য করেনি। আগেও যেতে চেয়েছে মার্ক, কিন্তু অনভিজ্ঞ বলে রাজি হননি কর্নেল কাকু। তিনি চান, তাঁকে অনুসরণ করে কোম্পানীতে নিজের জায়গা করে নিক মার্ক। বাপ হিসেবে এটা তিনি চাইতেই পারেন। কিন্তু ছেলেকে আসলে তিনি চেনেন না।’

‘তোমার ধারণা, তোমার বাবা চেনেন ?’

‘বাবাকে আমি সব কথা বলে দিয়েছি।’

‘টেলিগ্রামে ঠিক কি জানিয়েছেন তিনি ?’

‘মার্ককে ডেকে না নিলে বাবা পদত্যাগ করবে।’

‘ফটোগুলোর কথাও ?’

‘ঈশ্বর রক্ষা করেছেন আমাকে, দু’বার ধস্তাধস্তির ঘটনা ছাড়া আর কিছু মার্কের সাথে আমার ঘটেনি। তারই কিছু ফটো তুলে রেখেছে সে। বছর চারেক আগের তোলা ছবি ওগুলো, দু’জনেই হাসাহাসি করছি, আমাকে প্রায় বিবস্ত্র করে ফেলেছে ও। তখন কি জানতাম, এটা একটা ষড়যন্ত্র। ভাগ্যিস ওকে কোনো সুযোগ দিইনি আমি। হ্যাঁ, ফটোর কথাও বাবা জানে।’



‘ওগুলো প্রকাশ করা হলে বা কাগজে ছাপা হলে, তোমার দুর্নাম হবে, তাই না ?’

চেহারা স্নান হয়ে গেল মারিকার। ‘হ্যাঁ, খানিকটা তো হবেই। তবে ও-সব আমি গ্রাহ্য করি না। মার্ক একটা গর্দভও বটে, তা না হলে কিভাবে সে বিশ্বাস করতে পারে যে ‘ওগুলোর ভয়ে ওকে আমি বিয়ে করতে বাজি হবো ?’

‘রোসেট পরিবার কি ব্রিটিশ নয় ?’ জিজ্ঞেস করলো রানা। ‘ব্রিটিশ-রা নাংসীদের স্ত্রী হয় কি করে ?’

‘কর্নেল কাকু ব্রিটিশ, তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় রোসেট পরিবারের বিরূপ স্বার্থ আছে। মার্কের মা নয়ওয়ার মেয়ে। মার্ক আসলে মায়ের হাত-পা ধুয়ে ধোয়েছে।’

‘এখন কি করবে বলে ভাবছো তুমি, কর্নেলকে মার্কের সব কথা বলে দেবে ?’

‘কর্নেল কাকুকে সত্যি আমি ভালোবাসি,’ স্নান সুরে বললো মারিকা। ‘আসলে ছোটবেলা থেকে তাঁর কাছেই আমি মানুষ। রাগের মাথায় যা-ই বলি, তাঁকে আঘাত দেয়ার ইচ্ছে আমার নেই। বাধ্য না হলে সব কথা তাঁকে আমি জানাবো না।’

এরপর অনেকক্ষণ আর কোনো কথা হলো না। কারো ব্যক্তিগত সমস্যার সাথে জড়িয়ে পড়তে চায় না, তাই চুপ করেই থাকলো রানা। মেয়েটার সান্নিধ্য ওর ভালো লাগছে, অদ্ভুত একটা আকর্ষণও অনুভব করছে, স্পর্শ করামাত্র প্রতিবার পুলকিত হয়ে উঠছে ও, কাজেই নিজেকে কঠিন অনুশাসনে বেঁধে রাখার প্রয়োজন বোধ করলো। নারীঘটিত বা হৃদয়ঘটিত কোনো সংকটে পড়তে চাইছে না। মেয়ে তো নয়, বিপুল ঐশ্বর্য, মনে মনে জানে এড়িয়ে যেতে না পারলে

কপালে খারাবি আছে।

মারিকাও চুপ করে থাকলো, ইতোমধ্যে আবার সে অন্য জগতের বাসিন্দা, সম্ভবত বরফ ঢাকা আন্টার্কটিকার। হঠাৎ বাস্তবে ফিরে এলো সে, এক চুমুকে গ্রাসটা খালি করলো, খপ করে রানার কজি চেপে ধরে বললো, 'বার থেকে মিউজিকের শব্দ পাচ্ছি।' বিপুল উত্তেজনা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সে, টান দিয়ে দাঁড় করালো রানাকে। 'চলুন, নাচি।' বার-এ চুকে ওরা দেখলো নাচ শুরু হয়ে গেছে। ড্যান্স ফ্লোরের দিকে এগোলো ওরা। রানার কানে কানে বললো মারিকা, 'থ্যাঙ্ক ইউ।' কজিতে চাপ দিলো একটু। 'থ্যাঙ্ক ইউ ফর বীইং সো নাইস।'।

মেয়েটার দ্বারা কিভাবে সম্ভব হলো বলতে পারবে না রানা, তবে সময়টা উৎসবমুখর করে তুললো সে। রানা আবিষ্কার করলো, মারিকা শুধু যে ভালো নাচতে পারে তাই নয়, পার্টনারকে সাহায্য করার জন্যে প্রতি মুহূর্তে সজাগ সে। রানার চোখে চোখ রেখে, মাথাটা পিছিয়ে নিয়ে, নিঃশব্দে হাসলো মারিকা। দমকা বাতাসের মতো ড্যান্স-ফ্লোরে উড়ে বেড়ালো ওরা। ড্যান্স-ফ্লোরে বেশিরভাগই ইউরোপিয়ান বা স্বেতাঙ্গ দম্পতি, হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিলো তারা ওদেরকে। এক পর্যায়ে দ্রুত থেকে দ্রুততর হলো মিউজিক, ছোটো শরীর জোড়া লেগে এক হয়ে গেল, বাঁধনহেঁড়া সতেজপ্রাণ তাকুণ্যের এ যেন এক মহামিলন। রানার হাতে নিজেকে এমন নিঃসংকোচে ঝুঁপে দিলো মারিকা, পুলকে আত্মহারা হয়ে পড়লো রানা। প্রতিটি মুহূর্ত কিছু না কিছু বলছে মেয়েটা। 'আগে কখনো এভাবে আমি নাচিনি...কি যেন ঘটে গেছে আমার ভেতর... নিজেকে আমি ধরে রাখতে পারছি না...আমার জীবনে...আরো যাত্রা অন্তত-'

আগে...তোমার মতো কেউ... আসেনি কেন...!’ আবেশে চোখ বুজে এলো তার। ‘কে...কে তুমি...কেন দেখা হলো...!’ চোখ ভরা আনন্দের কান্না নিয়ে নাচ শেষ করলো মারিকা, দর্শকদের তুমুল করতালির ভেতর রানার হাত ধরে ছুটে বেরিয়ে এলো বাইরে।

পরে, ট্যাক্সিতে, মাথা নিচু করে বসে থাকলো সে, সারাটা পথ শুধু একবারই মুখ খুললো, ‘আমাকে কমা করো!’ উত্তরে কিছুই বলেনি রানা। বাক ঘুরে এয়ারপোর্টের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলো ট্যাক্সি, মারিকার থমথমে চেহারা উদ্বেগ আর ক্লান্তি ফুটে উঠলো। সিটের ওপর কাত হলো সে, রানার একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে মুখের কাছে তুললো, আলতোভাবে চুমো খেলো আঙুলগুলোয়।

ইতোমধ্যে এগারোটা বেজে গেছে, ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই। সরাসরি প্লেনে উঠে পড়লো ওরা। দশ মিনিট পর কায়রোকে পিছনে ফেলে ছুটে চললো প্লেন। যে-যার সিটে বসে নিশ্বাসে শুরু করলো।

রাত বোধহয় চারটে হবে, হাতে একটুকরো কাগজ নিয়ে ককপিট থেকে বেরিয়ে এলো পাইলট। রানাকে পাশ কাটিয়ে কর্নেল ওয়া-কারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে, মুহূর্ত ঝাঁকি দিয়ে তার ঘুম ভাঙালো। ‘জরুরী মেসেজ, কর্নেল,’ ফিসফিস করে বললো।

নাক দিয়ে একটা আঙুলো করলেন কর্নেল, কাগজ নাড়াচাড়ার আঙুলো পেলো রানা। সিটের ওপর কাত হয়ে, পিছন দিকে তাকালো ও। কর্নেলের কোলা কোলা চেহারা রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, থর থর করে কাঁপছে কাগজ ধরা হাতটা। ছ’বার ঢোক গিললেন তিনি, তারপর ঝট করে তাকালেন মারিকার দিকে। গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে মেয়েটা।

‘কোনো মেসেজ পাঠাতে হবে?’ জিজ্ঞেস করলো পাইলট।

‘না। না, কোনো উত্তর নেই,’ বিড়বিড় করে বললেন কর্নেল, যেন তাঁর দম ফুরিয়ে গেছে।

‘ভোররাতে ছঃসংবাদ, আমি ছঃখিত,’ বলে ককপিটে ফিরে গেল পাইলট।

চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করলো রানা। কিন্তু ঘুম এলো না। বারবার একটা প্রশ্ন বিঁধছে বুকে, কি আছে মেসেজটায়? প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নিলো ও, মারিকার সাথে মেসেজটার সম্পর্ক আছে। আরো দু’বার পিছন দিকে তাকালো রানা, দু’বারই ওর সম্মুখ উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হতে ব্যর্থ হলেন কর্নেল ওয়াকার। তিনি ঘুমাচ্ছেন না। পাখুরে মূর্তির মতো বসে আছেন, চোখ দুটো বিক্ষারিত, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন মেসেজটার দিকে।

নাইরোবিতে নেমে ব্রেকফাস্ট সারলো ওরা। এয়ারপোর্ট ক্যানটিনে সবাই একই টেনিলে বসলো। কর্নেল ওয়াকার কিছুই খেলেন না। বারবার শুধু মারিকার দিকে তাকাচ্ছেন তিনি। তাঁকে প্রায় সমস্ত বলে মনে হলো রানার।

রানার পাশ থেকে হঠাৎ ঝুঁকে পড়লো কাইসু ওকোমো, কানের কাছে মুখ তুলে ফিসফিস করে বললো, ‘কি ঘটলো বলতে পারেন? কর্নেল অমন করছেন কেন?’

‘জানি না,’ বললো রানা। ‘কাল রাতে উনি একটা মেসেজ পেয়েছেন।’

ব্রেকফাস্ট শেষ হয়ে এসেছে, এই সময় ইশারা করে মারিকাকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন কর্নেল ওয়াকার। খানিক পরই ফিরে এলেন তিনি। একা।

‘মারিকা কোথায় ?’ জিজ্ঞেস করলো রানা। ‘কিছু ঘটেছে কি ?’

‘না,’ বিড়বিড় করে জবাব দিলেন তিনি। ‘কি ঘটবে।’ তাঁর বলার ভঙ্গিতেই স্পষ্ট হয়ে গেল, তিনি চাইছেন না তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে রানা নাক গলাক।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ক্যানটিন থেকে বেরিয়ে এলো রানা। কয়েক পা হেঁটে দাঁক নিতেই মারিকাকে দেখতে পেলো ও, এয়ারফিল্ডে একা একা হাঁটছে। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে রানা বুঝতে পারলো, ঘোরের মধ্যে হাঁটছে মেয়েটা, এলোমেলোভাবে পা ফেলছে, কোন্দিকে যাচ্ছে খেয়াল নেই। তার নাম ধরে ডাকলো রানা। কিন্তু ফিরলো না মারিকা, থামলোও না, যেমন হাঁটছিল তেমনি হাঁটতে লাগলো। তাঁরমাক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সে।

ছুটলো রানা। ‘মারিকা !’ এবার বোধহয় শুনতে পেয়েছে, শব্দের উৎস লক্ষ্য করে খানিকটা ঘুরলো সে, যেন ভুল শুনেছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে। তারপর রানার ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শুনে পুরোপুরি ঘুরলো। ‘কি ঘটেছে ?’ তার হাত ধরে জিজ্ঞেস করলো রানা। ‘এখানে একা একা কি করছো তুমি ?’

মারিকার চোখে কোনো দৃষ্টি নেই, তার গোটা অস্তিত্ব নিজের ভেতর গুটিয়ে গেছে। উত্তর দেবে কি, রানার কথা বোধহয় বুঝতেই পারেনি। সচল একটা লাশের মতো লাগলো মেয়েটাকে। তার ঠাণ্ডা হাতটা ধাকালো রানা। ‘এদিকে, আমার দিকে তাকাও ! বলো কি হয়েছে। কর্নেল একটা মেসেজ পেয়েছেন, তাই না ? কি আছে মেসেজে ?’

উত্তরে বাঁ হাতের মুঠোটা খুললো মারিকা। মুঠোর ভেতর থেকে দোমড়ানো কাগজটা নিয়ে সিঁখে করলো রানা। তারপর পড়লো।



পোলার হোয়েলিং কোম্পানী থেকে এসেছে মেসেজটা। লণ্ডন অফিস থেকে কর্নেলকে জানানো হয়েছে, 'ভেনসম রিপোর্ট করেছে, ম্যানেক্সার বোনার পাইটন ফ্যাক্টরি শিপ থেকে নিখোঁজ হয়েছেন। পরে বিশদ জানানো হবে।'

জাহাজ থেকে নিখোঁজ হয়েছেন...তারমানে মারা গেছেন ভদ্রলোক ! ওহ, গড, মারিকার বাবা নেই ! দ্বিতীয়বার মেসেজটা পড়ার সময় রানা ভেবে পেলো না কি বলে সান্ত্বনা দেয়া যায় মেয়েটাকে। বাপকে দেবতা জ্ঞানে পূজো করে মারিকা। বাপের কথা বলার সময় তার চোখে আবেগ উথলে উঠতে দেখেছে রানা। কিভাবে ঘটনাটা ঘটেছে সে-সম্পর্কে মেসেজে কিছুই বলা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে, জাহাজ থেকে নিখোঁজ হয়েছেন। 'ভেনসম কে ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'কোকুনের ক্যাপটেন,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো মারিকা।

তার একটা হাত ধরলো রানা, দু'জন নিঃশব্দে হাঁটতে শুরু করলো। তারপর হঠাৎ বিস্ফোরিত হলো মারিকা, 'কেন। কিভাবে ! জাহাজ থেকে পড়ে যাবে, আমার বাবা ? ছত্রিশ বছর, সারাটা জীবন সমুদ্রে কেটেছে তার ! আমি জানতাম ! জানতাম এরকম একটা কিছু ঘটবে ! তোমাকে আমি বলিনি ?' ফুঁপিয়ে উঠে রানার বুকে মাথা ঠুকলো সে। 'বলিনি আমি ?'

## তিন

কেপটাউনে ল্যাণ্ড করলো প্লেন। এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ে জড়ো হলো সবাই। কর্নেল ওয়াকারকে ধন্যবাদ জানালো রানা। ওর সাথে করমর্দন করলেন তিনি। তাঁর হাত লোহার মতো শক্ত, তবে মুখের রঙ সাদা। বিড়বিড় করে শুভেচ্ছা জানালেন তিনি, হেলমুট বার্গারের পিছু নিয়ে বেরিয়ে গেলেন টামিমাল ভবন থেকে। কাইসু ওকোমো সহাস্যে রানার পিঠ চাপড়ে দিলো। ‘বিখ্যাত ফটোগ্রাফার কাইসু ওকোমোর কথা আপনি যাতে না ভোলেন তার একটা ব্যবস্থা করা দরকার,’ বললো সে। ‘আপনার স্থায়ী ঠিকানাটা দিন আমাকে, আমার সেরা কিছু ফটো পাঠিয়ে দেবো।’ মুহূর্তে তাকে ঢাকার ঠিকানা লিখে দিলো রানা। ফটোগ্রাফার চলে যেতেই মারিকাকে এগিয়ে আসতে দেখলো ও।

‘ওয়েল, দিস ইজ গুডবাই, রানা,’ বলে হাতটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিলো মারিকা, ছোর করে একটু হাসতেও পারলো সে। রানার মুঠোর ভেতর তার নরম আঙুলগুলো আঙুনের মতো গরম। ‘কি বলা যায় এটাকে...জুটো জাহাজ? যার যার আলাদা বন্দর...’

এবার হাসতে গিয়ে পারলো না । । ‘উঠছো কোথায় । হোটেল ?’

‘হিলটনে । তোমরা ?’

মাথা নাড়লো মারিকা । ‘না, আর কখনো আমাদের দেখা হবে না । আমরা সম্ভবত সরাসরি জাহাজে চড়বো । সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে । আর এক ঘণ্টা পর ছাড়বে জাহাজ ।’

ইতস্তত করলো রানা । কিছু একটা বলা দরকার । ‘আশা করি... তুমি... ।’

নিঃশব্দে হাসলো মারিকা । ‘জানি কি বলবে । ধন্যবাদ, রানা । তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গলা চড়ালো সে, ‘শুধু যদি জানতে পারতাম কিভাবে কি ঘটছে । ভেনসন বা মার্ক শুধু যদি সব কথা ব্যাখ্যা করে লিখতো ! কিন্তু এয়ারপোর্টে কোনো মেসেজ আসেনি ।’ রানার হাতে মুছ চাপ দিলো সে । ‘দুঃখিত ! তোমার নিজেরই সমস্যা আছে । ওডলাক, রানা । অ্যাণ্ড থ্যাঙ্ক ইউ ফর বীইং সো নাইস ।’ পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঠে হলো সে, রানার গালে চুমো খেতে গিয়েও ঝট করে ঘুরে গেল, একরকম ছুটেই পালিয়ে গেল । তার পিছু পিছু এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এসে রানা দেখলো, অপেক্ষারত একটা গাড়িতে উঠে বসেছে মারিকা । ওর দিকে একবারও তাকালো না সে । গাড়িটা চলে গেল ।

হিলটনে বুক করা ছিলো কামরা, রিসেপশনে ঢুকে একটা মেসেজ পেলো রানা । ওর কন্টাক্ট জানিয়েছে, আজ রাতে রাফি’স বার-এ দেখা হবে । নিজের স্লাইটে উঠে এসে কাপড় ছাড়লো রানা, শাওয়ার সেরে দাড়ি কামালো । বেডরুমে রোদ ঢুকেছে, পর্দাটা টেনে নিয়ে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজলো । মারিকার কথা ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো । ঘুম ভাঙলো সন্ধ্যার, টেলিফোনের শব্দে । হাত

বাড়িয়ে রিসিভারটা তুললো ও ।

‘মিঃ রানা !’ ভরাট, গভীর, পুরুশালি কণ্ঠস্বর, প্রথমে চিনতেই পারলো না রানা ।

‘বলছি ।’

‘কর্নেল ওয়াকার । মারিকা আমাকে জানালো, আপনার নাকি অ্যান্টার্কটিকায় জাহাজ চালাবার অভিজ্ঞতা আছে ?’

‘হ্যাঁ । আপনারা এখনও রওনা হননি ?’

‘কতো দিন আগের কথা !’ রানার প্রশ্ন উপেক্ষা করলেন কর্নেল ।

ভদ্রলোক কি চান বুঝতে পারলো না রানা, বললো, ‘কেন বলুন তো ? খুব বেশিদিন আগের কথা নয় ।’

‘ওড । আপনার সাথে আমার দেখা হওয়া দরকার । তেইশ নম্বর স্যুইটে একবার আসতে পারবেন, শ্রদ্ধ ?’

‘কোথায়, এখানে, মানে হিলটনে ?’

‘হ্যাঁ ।’

‘আমি ভেবেছিলাম আপনারা জাহাজে চড়ে রওনা হয়ে গেছেন ।’

‘রাতটা হোটেলের কাটাচ্ছি,’ ফোনের সাথে বললেন কর্নেল । ‘আপনি এখন একবার আসবেন কি ?’

‘দশ মিনিট পর,’ বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলো রানা । ধীরে-সুস্থে কাপড় পরলো ও । অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইলেন কেন কর্নেল ? মারিকার অনুরোধ রক্ষা করেনি রানা, ওকে অ্যান্টার্কটিকায় নিয়ে যাবার জন্যে কর্নেলকে দিয়ে চেষ্টা করে দেখছে সে ।

তেইশ নম্বর স্যুইটে কর্নেলকে একাই পেলো রানা । ‘কি খাবেন বলুন । হুইফি ?’

উত্তরে নিঃশব্দে মাথা নাড়লো রানা । ‘কেন ডেকেছেন বলুন ।’

‘আমার খুব উপকার হয় আপনি যদি...।’

বাধা দিলো রানা, ‘আপনি না বলেছিলেন, উপকার বা দয়ায় বিশ্বাস করেন না?’ রানার ঠোঁটে কীণ হাসি।

‘কারো উপকার করলে সেটা ফেরত চাওয়া আমার স্বভাব,’ কর্নেল হাসলেন না। ‘একটা বিপদ থেকে উদ্ধার করতে হবে আমাকে।’

‘কি বিপদ?’

‘আমি চাই আপনি আমাদের লিবার্টি-থ্রু কমান্ড গ্রহণ করুন। লিবার্টি-থ্রু টোইং বোট, ওটায় চড়েই ফ্যাক্টরি শিপ কোকুনে আমাদের যাবার কথা। বকমান, লিবার্টি-থ্রু ক্যাপটেন, সেকেন্ড মেটকে নিয়ে আজ সকালে রোড অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। হ’লেনেই হাসপাতালে।’

‘ফাস্ট মেট?’

‘সে জাহাজে আসেনি, লিবার্টি-থ্রু ফ্যাক্টরি শিপ ত্যাগ করার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন পাইটন, কোকুনের ম্যানেজার, মারা গেছে? কাজেই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখানে আমার পৌঁছনো একান্ত জরুরী। আজ সারাটা দিন একজন ক্যাপটেনের খোজে কেপটাউন চষে বেড়িয়েছি, কিন্তু পছন্দসই কাউকে পাইনি। তারপর এই খানিক আগে মারিকা আমাকে জানালো, আপনার নাকি অ্যান্টার্কটিকা অভিযানের অভিজ্ঞতা আছে...।’

গম্ভীর হলো রানা। ‘তাতে কি? অভিজ্ঞতা আছে বলেই আপনি ধরে নিলেন বলামাত্র আপনার সাথে অ্যান্টার্কটিকায় ছুটবো আমি? আমার নিজের কাজ থাকতে পারে না? তাহাড়া, কাগজ-পত্র নেই...।’

হাত নেড়ে রানাকে ধামিয়ে দিলেন কর্নেল। ‘আমার তরফ থেকে এটা একটা প্রস্তাব, এবং আপনার জন্যে উপকার ফিরিয়ে দেয়ার



একটা সুযোগ। ভেবে দেখুন। কেউ আপনাকে জোর করেছে না। তবে, টাকা-পয়সার একটা ব্যাপারও আছে। শুনেছি আপনি একটা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি চালান। মনে করুন, আপনার সাভিস পেতে চাই আমরা, বিনিময়ে আপনার ন্যায্য ফি দেয়া হবে। আর, আমাদের কোম্পানীর যেমন নিয়ম, তিমি ধরা থেকে যা লাভ হবে তারও একটা ভাগ পাবেন। ভেবে দেখুন।’

‘অ্যাটার্কটিকায় যাবার কোনো ইচ্ছে আমার নেই,’ বললো রানা। থাকলে, ভাবলো ও, মারিকার প্রস্তাবে আগেই রাজি হয়ে যেতাম। ‘তবে আপনি যখন বলছেন, ভেবে দেখবো।’

‘সময় নেই,’ তীব্রকণ্ঠে বললেন কর্নেল। ‘এখুনি শুনতে চাই আমি। ওখানে পৌঁছে আমাদের জানতে হবে আসলে কি ঘটেছে।’

‘আর কোনো খবর পাননি, পাইটন কিভাবে মারা গেলেন?’

‘পেয়েছি, লাঞ্চার পর একটা মেসেজ এসেছে। বোনার গায়েব হয়ে গেছে। ব্যস, এইটুকু। ঝড় না, দাগা-ফ্যাসাদ না অথচ লোকটা মার সমুদ্রে একটা জাহাজ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেজন্যেই ওখানে আমার যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছুতে হবে।’

‘হুঃখিত,’ বললো রানা। ‘ভেবে দেখার জন্যে ঘণ্টা কয়েক সময় দিতে হবে আমাকে। এই মুহূর্তে আপনাকে আমি উত্তর দিতে পারছি না।’

স্বভাবমূলভ মারমুখো ভঙ্গিতে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কর্নেল ওয়াকার, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ বসে থাকলেন, একদৃষ্টে চুকটের আগুন পরীক্ষা করছেন। তারপর ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ ছেড়ে দাড়ালেন তিনি। ‘ঠিক আছে,’ প্রায় নরম সুরে বললেন ভদ্রলোক। ‘মনস্থির করে ফোন করবেন। আমি অপেক্ষা করবো।’

নিচতলায় নেমে এসে বার-এ কিছুক্ষণ বসলো রানা, আশা মাদ্রিকার সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে। সাড়ে সাতটার দিকে একটা ট্যান্ডি নিয়ে রাফি'স বার-এর উদ্দেশে রওনা হলো ও। সারাটা পল মাদ্রিকা আর তার বাবার রহস্যময় মৃত্যুর কথা ভাবলো। কর্নেলের ফোন পাবার পর থেকে বারবার একটা কথাই মনে হচ্ছে 'ওর, 'ও এড়িয়ে যেতে চাইলে কি হবে, নিয়তি যেন ওকে আন্টার্কটিকায় নিয়ে যাবার পণ করেছে।

রাফি'স বার-এ পৌঁছে একটা মেসেজ পেলো রানা, 'ওর কন্ট্যাক্ট জানিয়েছে পৌঁছুতে ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট দেরি হবে তার। হালকা পানীয় নিয়ে অপেক্ষায় থাকলো রানা, চোখ দুটো সতর্ক। সাথে কোনো অস্ত্র নেই, অচেনা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হবার খুঁকি বোলো-আনা।

পাশের একটা টেবিলে কয়েকজন ব্যবসায়ী আলোচনায় বসেছে। তাদের একজনের মুখে একটা নাম শুনে ঘাড় ফেরালো রানা। বিশাল-দেহী এক লোক বলে চলেছে, 'এ-ধরনের জালিয়াতির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার। তিনজন লোকের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেল, আর প্রায় পঁচিশ হাজার লোক একেবারে পথে বসলো।'

'ডন ডালি এফতার হয়েছে,' আরেকজন বললো। 'কিন্তু রোসেট-কে তুমি পাচ্ছে? কোথায়? খনিটায় সোনা নেই, আছে শুধু পাথর, এটা জানাজানি হবার আগের দিন ছ'জনই ওরা নিজেদের সমস্ত শেয়ার চড়া দামে বিক্রি করে দিয়েছে। বাকি একজন, তার নাম অ্যানি জ্যানি না, কোম্পানীটা লালবাতি ছালায় ক'দিন আগেই নিজের সব শেয়ার ছেড়ে দেয়।'

'এক্সকিউজ মি,' ওদের আলোচনায় বাধা দিলো রানা। 'আপনারা যাত্রা অন্ত-১

কোন রোসেটের কথা বলছেন ?

চারজন প্রৌঢ় একযোগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো রানার দিকে । তারপর নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলো । বিশালদেহী লোকটা রানার দিকে ফিরে বললো, 'ভুলে যান, মিস্টার । আমরা কোনো রোসেটের নাম উচ্চারণ করিনি ।'

শেয়ার বাজারের ব্যাপারসাপার অত্যন্ত নাঙ্ক, অচেনা লোকের সাথে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চায় না কেউ । খানিক পর ব্যবসায়ীরা টেবিল ছেড়ে চলে গেল ।

কোনো বিপদ হলো না, কন্ট্রাক্টের কাছ থেকে সিগারেটের একটা প্যাকেট পেলো রানা । বিল মেটাবার আগে টয়লেটে ঢুকলো । প্যাকেট খুলে দেখে নিলো কাগজগুলো । বার থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলো ব্রিটিশ দূতাবাসে । ওয়েটিংরুমে বসানো হলো ওকে, টেলিফোন অপারেটরের সাথে দেখা করতে এসেছে । বি. সি. আই.-এর একজন হিসেবে কাজ করছে লোকটা । তার হাতে মেসেজটা গছিয়ে দিয়ে দূতাবাস থেকে বেরিয়ে এলো রানা । সুযোগ পাওয়া মাত্র আজ রাতেই লণ্ডনের বি. সি. আই. শাখার মেসেজটা পাঠিয়ে দেবে অপারেটর ।

হোটলে ফিরতে রাত প্রায় দশটা বেজে গেল রানার । রিসেপশনে ঢুকে ডেস্কের দিকে এগোলো ও, সোফা থেকে উঠে ওর দিকে এগিয়ে এলো একটা মেয়ে ।

মেয়েটা আর কেউ নয়, মারিকা । ইভনিং গাউন পরায়, কাঁধ দুটো নিরাবরণ, রানার আগের ধারণা বদলে গেল । দেখার চোখ থাকলে মারিকা স্তন্যরী তো বটেই, তার চেহারার কমলীয় ভাবটুকু যে-কোনো মেয়ের সঁর্ব্বার বস্তু । কাঁধ দুটো নগ্ন বলেই বোধহয় আগের চেয়ে লম্বা লাগছে তাকে । 'তোমার জন্যে কখন থেকে অপেক্ষা করছি আমি,'

কাছে এসে বললো সে, রানার একটা হাত ধরলো ।

আবার সেই পুলক অনুভব করলো রানা । ‘আমার জন্যে ? কেন ?’

‘কি সিদ্ধান্ত নিলে, রানা ? লিবার্টি-থ্রু দায়িত্ব তুমি নিচ্ছে ?’  
মারিকার হুঁচোখে মিনতি ।

এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি রানা । কিন্তু মারিকার চোখ দুটোর  
দিকে তাকিয়ে, ‘হ্যাঁ,’ ছাড়া আর কিছু উচ্চারণ করতে পারলো না ।

‘থ্যাঙ্ক গড !’ চেপে রাখা দম ছেড়ে বললো মারিকা । ‘তুমি রাজি  
না হলে ইংল্যান্ড থেকে লোক আসার অপেক্ষায় থাকতে হতো আমা-  
দের । অত্যাশঙ্ক দেরি করতে হলে যারা যেতাম আমি !’

রানাকে নিয়ে সরাসরি কর্নেল ওয়াকারের স্যুইটে চলে এলো  
মারিকা । রানার সিদ্ধান্ত শুনে মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল । ‘আপনার  
সিদ্ধান্ত কি হবে আন্দাজ করতে পেরেছিলাম আমি,’ বললেন তিনি ।  
‘সব ব্যবস্থা করে রেখেছি ।’ ফোনের রিসিভার তুলে ট্যান্ড্রি ডাকতে  
বললেন । ‘আপনার জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিন, মিঃ রানা । আজ রাতেই  
রওনা হচ্ছে আমরা ।’

হারবারের ইনার বেসিন-এ নোঙর ফেলেছে লিবার্টি-থ্রু, কাঠামোয়  
পরিবর্তন আনায় করভেট বলে মনেই হয় না ওটাকে । আকৃতিটা  
সরু, অত্যন্ত শক্তিশালী ও দ্রুতগতি ট্যাংক । ডেকের সব লোকই  
নরওয়ের, শুধু চীফ এঞ্জিনিয়ার স্কটল্যান্ডের লোক । রানার কেবিনে  
নক করে ঢুকলো সে, বললো, ‘আমি ওয়েজনার ।’ লোকটা রোগা,  
মাথায় সোনালি চুল, বাড়িয়ে দেয়া হাতে তেল লেগে রয়েছে ।

‘মাসুদ রানা । রকম্যানের দায়িত্ব নিয়ে এসেছি ।’

চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো চীফ এঞ্জিনিয়ারের । ‘ভালোই

হলো, জাহাজে আমরা ছ'জনই শুধু নয়দের লোক নই।'

'আমার উপস্থিতি সাময়িক,' বললো রানা। 'আমার ধারণা, ছ'এক বোতল স্বচ নিশ্চয়ই কোথাও তুমি লুকিয়ে রেখেছো!'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, অ্যারাবিয়ান ক্যাপটেনকে আপ্যায়ন করার জন্যে।'

হেসে ফেললো রানা। 'আমি অ্যারাবিয়ান নই, বাংলাদেশী। এবার, ফুয়েল আর পানির কি খবর বলো দেখি।'

'সবগুলো ট্যাংক ভরা।'

'কুরা ইংরেজি বলতে পারে, কাজ চালানোর মতো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'তা পারে...।'

'তাহলে ত্রিঙ্গে একজনকে আসতে বলো।'

'ইয়েস, স্যার।'

'ওয়েজনার, বলতে পারো, শেষ কবে খোয়া-মোছা হয়েছে জাহাজ-টা? হুগ্গকে আমার পেটের ভেতরটা পাক খাচ্ছে।'

নিঃশব্দে হাসলো চীফ এঞ্জিনিয়ার। 'তিমির গন্ধ, স্যার। এ তো কিছুই না. ফ্যাক্টরি শিপের পাশে একবার পৌছুলে বুঝতে পারবেন গন্ধ কাকে বলে।'

ওয়েজনারকে বিদায় করে দিয়ে ত্রিঙ্গে উঠে এলো রানা। ক্রুদের একজন ওর কাঁধে টোকা দিলো। 'অনারেবল ডিরেক্টর।' ফিসফিস করে বললো সে। গ্যাঙুয়ে ধরে উঠে আসছেন কর্নেল ওয়াকার। ত্রিঙ্গে উঠে এসে রানাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সব বুঝে নিতে পারছেন তো?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ।'

'তাহলে চাটক্রমে আসুন, আপনাকে আমি কোকুনের পডিশন



দেখিয়ে দিই।' চার্টারমে ঢুকে মাপের ভাঁজ খুললেন তিনি। আঙুল রাখলেন স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের তিনশো মাইল পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিমে। জায়গাটা পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করলো রানা। 'কোন দক্ষিণ দিকে পথ করে নিচ্ছে। ভেনসম জানিয়েছে, চারদিকে প্রচুর বরফ, আবহাওয়াও খারাপের দিকে। ওদের পজিশন কাল সঠিক জানা যাবে।' ঘুরলেন তিনি, রানাকে পিছনে নিয়ে ত্রিজে ফিরে এলেন। 'চীফের সাথে দেখা হয়েছে?' মাথা ঝাঁকালো রানা। 'এক্সিন ঠিক আছে?' আবার মাথা ঝাঁকালো রানা। 'আমাদের এক্সেন্ট আপনার কাগজ-পত্র সব তৈরি করে ফেলেছে। আপনি তৈরি হলেই রওনা হতে পারি আমরা।' রানার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে ত্রিজ থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো রানা, তারাম্বলা আকাশের গারে ক্রেনের অসংখ্য বাহুর ওপর চোখ বুলালো। অচেনা একটা জাহাজ, জুনা সবাই বিদেশী। অনুভব করলো হাতের তালু ঘামছে ওর। বহু-দূর দক্ষিণে যেতে হবে ওকে, বরফ ঢাকা অন্য এক জগতে। আর... জাহাজ চালনা ওর পেশা নয়।

পায়ের শব্দ হলো, মই বেয়ে ত্রিজে উঠে আসছে কেউ। ঘুরলো রানা। জুদের একজন। 'ক্যাপটেন রানা? ওয়েজনার আমাকে আসতে বললো।'

'আমি চাই নির্দেশগুলো তুমি সবাইকে তরজমা করে শোনাবে।'

দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে বিরাট মাথাটা ঝাঁকালো জু। 'ইয়েস, স্যার।'

'আমার পাশে দাঁড়িয়ে পুনরাবৃত্তি করবে তুমি। তোমার নাম কি?'

'পিটার ওয়েনার।'

ককসন-কে ডেকে পাঠালো রানা, হুইলের দায়িত্ব দিলো একজন  
 রাজা অন্তঃ-১

কুকে । প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়ার পর লক্ষ্য করলো, বিদেশী ক্যাপ-টেনের প্রতি কারো মধ্যে কোনো রকম তাক্ষিলোর ভাব নেই । 'স্নো অ্যাহেড ।' নির্দেশ দিলো রানা । ওয়েনার নির্দেশটা পুনরাবৃত্তি করলো ।

বাক নিলো জাহাজ, হারবার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে । পরবর্তী আধ-ঘণ্টা নিজের কাজে এমন মগ্ন হয়ে থাকলো রানা, টেরই পায়নি ব্রিজে কখন কে এসেছে ।

ওর কনুইয়ের কাছ থেকে বলা হলো, 'কর্নেল কাকু দেখছি একটা রত্ন কুড়িয়ে পেয়েছেন । এমন নিখুঁতভাবে বের করে আনলেন লিবার্টি-থ্রিকে, ভাবাই যায় না ।'

ঘুরে মারিকার দিকে তাকালো রানা । চোখাচোখি হতে হাসলো মেয়েটা । 'কিন্তু,' বিষণ্ণ একটু হেসে বললো রানা, 'এ রত্নের স্বভাবই হলো হারিয়ে যাওয়া ।'

ধীরে ধীরে স্নান হয়ে গেল মারিকার হাসি । রানা লক্ষ্য করলো, ব্রিজের সামনের ডেকে ঘুরে দাঁড়ালেন কর্নেল ওয়াকার, নিজের কেবিনে ফিরে যাচ্ছেন ।

মারিকার দিকে ফিরলো রানা । 'তুমি বোধহয় ভেবেছিলে কিছুর সাথে ধাক্কা লাগিয়ে জাহাজটা আমি ডুবিয়ে দেবো ?'

'জাহাজ চালাতে পারো, এটা ছিলো তোমার মুখের কথা । এখন আমরা জানি । আমাদের অনুরোধ করা হয়েছে, তোমাকে যেন বলি, তোমার ওপর আস্থা রাখায় ঠকতে হয়নি বলে কোম্পানী খুশি ।'

'কে কথা বলছে ? কর্নেল, নাকি মারিকা ?'

হেসে উঠলো মারিকা । 'আমি তো শ্রেফ কোম্পানীর একটা মেয়ে, বলা চলে । তোমার ওপর আস্থা প্রকাশ করেছেন চেয়ারম্যান । হঠাৎ

অনুপ্রাণিত উজ্জলোকে মনে হয়েছে প্রশংসাইকু আগার দ্বারা পরি-  
বেশিত হলে নতুন ক্যাপটেন বোধহয় বেশি খুশি হবে।’

ক্রুত মারিকার চোখে তাকিয়ে কি যেন খুঁজলো রানা। ‘আর  
তোমার কি মনে হয়েছে?’

‘বুদ্ধিমতী একটা মেয়ের উচিত আগুনে ঝাঁপ দেয়ার আগে দ্বিতীয়-  
বার চিন্তা করা,’ হাসতে হাসতেই বললো বটে, তবু কণা শেষ করে  
ঝট করে ঘুরে ইঁটা ধরলো মারিকা, ত্রিঙ্গ থেকে বেরিয়ে যাবার  
মুহুর্তে বললো, ‘গুড নাইট।’

পরদিন প্রচণ্ড রোদ থাকলো, এককোঁটা বাতাস নেই। সারাদিন  
দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগোলো ওরা, ত্রিশ নট গতিতে। ত্রিঙ্গ থেকে  
রানা লক্ষ্য করলো, গোটা জাহাজ ধুয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে, মাঝে-  
মাঝে এঞ্জিন রুম থেকে বেরিয়ে এসে ক্রুদের কাজ তদারক করেছে চীফ  
এঞ্জিনিয়ার। ক্রুরা কাজের ফাঁকে মুখ তুলে তাকালো ত্রিঙ্গের দিকে,  
চোখে সমীহভরা দৃষ্টি।

বেলা খানিক চড়তে ক্রুদের তালিকা পরীক্ষা করলো রানা, একটা  
নাম দেখে ভুরু কুঁচকে উঠলো ওর। ডঃ নিক শেডি। ভয়েস পাইপের  
সাহায্যে ওয়েজনারকে জিজ্ঞেস করলো ও, ‘কে সে? তাকে আমি  
দেখিনি কেন?’

‘উনি আমাদের সাথে কদাচ ব্রেকফাস্ট খান,’ চীফ এঞ্জিনিয়ার  
বললো। ‘আমাদের গোটা বহরে ডকটর শেডি অদ্ভুত একটা চরিত্র।  
উনি একজন বিজ্ঞানী, তিনি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। খেয়ালি মানুষ, মাঝে-  
মাঝে কামেলা করেন, তবে তাঁর সাথে মানিয়ে চলতে পারলে লোক  
উনি ধারাপ নন।’

রাতে নিজেই কেবিনে বসে একটা বই পড়ছে রানা, দরজায় নক  
খাড়া অঙ্ক-১

না করে ভেতরে ঢুকলো কুংসিত এক লোক। ‘আমি নিক শেডি।’ দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে থাকলো সে, এদিক ওদিক তুলছে, জবা ফুলের মতো টকটকে লাল চোখ জোড়া রানার ওপর স্থির। প্রায় ছ’ফুট লম্বা সে, রোগা, একটু কুঞ্জে হয়ে হাঁটে। এ-ধরনের অবয়ব আগে কখনো দেখেনি রানা, সবটুকুই মাথা আর কপাল, চিবুক ইত্যাদির কোনো অস্তিত্ব নেই। বগলের তলায় আটকানো ছইন্ধির বোতল হটো লক্ষ্য করলো রানা। সুরু, লম্বা গলায় মস্ত একটা কণ্ঠা; দ্রুত এবং ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে, যেন বিরতিহীনভাবে কি যেন একটা গিলে ফেলার চেষ্টা করছে সে। লোকটা খোঁড়া নয়, তবে তার বাম পা-টা ডান পায়ের চেয়ে একটু ছোটো। রানার সামনে এসে দাঁড়ালো সে, চোখে অদ্ভুত চ্যালেঞ্জের দৃষ্টি, যেন আশা করছে রানা তার পরিচয়টা মিথ্যে বলে ঘোষণা করবে। ‘আপনার সাথে মদ খেতে এলাম,’ রানার পাশে বাক্কে বসে বললো সে, বোতল ছোটো নিজের পাশে রেখে একটা সিগারেট ধরালো। ‘আমি কুংসিত, কিন্তু সেজ্ঞানো হুংখ করি না, বিশেষ করে যখন মদ খাই।’ কৰ্কশ শব্দে হাসলো সে। পরনের কাপড়চোপড় নোংরা, সম্ভবত এগুলো পরেই ঘুমায়ে।

‘কোম্পানীতে তোমার কাজটা কি?’ জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘ওদেরকে জানানো গ্রীষ্মকালে তিমিরা কোথায় আছে বা থাকবে। আমি একের ভেতর তিন—বায়োলজিস্ট, ওশেনোগ্রাফিস্ট, মিটি-রোরোলজিস্ট। গোটা ব্যাপারটা ভাগ্যগণনার মতো, তবে খুলির বদলে আমি ব্যবহার করি প্ল্যাকটন, আর তাতেই আমাকে বিজ্ঞানী বলে ডাকা হয়। ছ’শিয়ার, কথাটা যেন বজ্জাত রোসেটের কানে না যায়।’ বোতলের ছিপি খুলে ঢকঢক করে ছইন্ধি খেলো সে। ‘আপনি গিলছেন না যে?’ দ্বিতীয় বোতলটা দেখাল রানাকে।

হাথা নাড়িলো রানা। লোকটার বয়স আন্দাজ করলো ত্রিশ কি  
বত্রিশ।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো। আপনমনে সিগারেট ফুঁকছে আর চুইকি  
বাচ্ছে ডঃ নিক শেডি। তারপর হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করলো, 'ম্যানেজার  
বোনার পাইটন সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন। অদ্ভুত, তাই না ?  
লোকটা কিন্তু সত্যি ভালো ছিলো, জানেন।'

'হ্যাঁ, তার মেয়ের কাছ থেকে তাই শুনেছি।'

'গুলি মারুন তার মেয়েকে !' হঠাৎ রাগে ফেটে পড়লো নিক  
শেডি। 'মার্ক রোসেটের প্রেমে পড়ে যে মেয়ে তাকে আমি ডাইনী  
বলি।'

'চিংকার করো না, কর্নেল শুনতে পাবেন।'

'শুনলে খুশি হই, বজ্রাতটা জাহ্নক, সে তার নিজের মতোই  
আরেকটা শয়তানের জন্ম দিয়েছে,' হাত ছুটো মুঠো পাকিয়ে বললো  
নিক শেডি।

'ওদের ওপর তোমার এতো রাগ কেন ?'

'ওধু রাগ ? রাগের আপনি দেখেছেন কি ? বোনার পাইটন কি-  
ভাবে জাহাজ থেকে পড়ে গেল তার একটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে  
না পারলে মার্ক রোসেটকে নিজের হাতে খুন করবো না আমি।'

'তোমার ধারণা, ম্যানেজারের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে মার্ক  
রোসেটের হাত থাকতে পারে ?'

'বোনার পাইটন এই পেশায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সারাটা  
জীবন অ্যাটার্কটিকা আর জাহাজে কাটিয়েছে সে। টনসবার্গের  
লোকেরা তাকে পূজো করে। আর সেজন্যেই পোলার হোয়েলিং  
কোম্পানী অন্য সব কোম্পানীর চেয়ে বেশি মাছ মারছে প্রতি বছর।

এরকম একজন লোক, কেউ দেখলো না, জাহাজ থেকে অদৃশ্য হয়ে  
 গেল, তা কিভাবে সম্ভব, আপনিই বলুন? নিশ্চয়ই এর পেছনে  
 কোনো ষড়যন্ত্র আছে। কর্নেল ব্যাটা তার হেলের অপ্রিয়তা অর্জ-  
 নের জন্যে এতো থাকতে ক্যান্ট্রি শিপে পাঠালো কেন? নিজের  
 মরার সময় ঘনিয়ে এসেছে, তাই ম্যানেজারকে বঞ্চিত করে নিজের  
 ছেলেকে চেরারম্যান বানাতে চায়, তাই না?’

সামনে বিপদ দেখতে পেলো রানা। জিজ্ঞেস করলো, ‘ম্যানেজার  
 আত্মহত্যা করতে পারেন?’

নিক শেডের মাথাটা ঝাঁকি খেলো, রানা যেন তাকে ঘুসি মেরেছে।  
 ‘আত্মহত্যা? বোনার পাইটন? অসম্ভব। তার মতো সুখী লোক আমাকে  
 একজন দেখান! হাসিখুশি, সন্তুষ্ট, রসিক একজন মানুষ আত্মহত্যা  
 করে?’

‘কর্নেল যদি তাঁর ছেলের হাতে কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ তুলে দিতে  
 চান, ম্যানেজারের দুঃখ হবার কথা নয়?’

বেশুরো, কর্কশ শব্দে আবার হাসলো নিক শেডি। ‘হারামজাদা  
 রোসেট একবার বোনার পাইটনের গার্লফ্রেন্ডকে কেড়ে নিয়েছিলো,’  
 বললো সে। ‘কই, তখন তো ম্যানেজার আত্মহত্যা করেনি।’ কি যেন  
 একটা গোপন কথা ভেবে হাসলো সে। ‘উহু’, যা-ই ঘটুক না কেন,  
 বোনার পাইটন আত্মহত্যা করেনি। বাপ আর ছেলে মিলে ঘটনাটা  
 ঘটিয়েছে, আমার বিশ্বাস। রোসেটদের আপনি চেনেন না, ওরা পারে  
 না এমন কোনো কুকর্ম নেই। কর্নেল ব্যাটা ভাড়াভাড়ি পটল তুললে  
 আমি খুব খুশি হই...।’ হঠাৎ হাঁ হয়ে গেল সে, বিষয়ে বিফারিত  
 হয়ে উঠলো চোখ দুটো। তার দৃষ্টি অমুসরণ করে দরজার দিকে  
 তাকালো রানা।

খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কর্নেল ওয়াকার রোসেট, তার পিছনে মারিকা। ভেতরে ঢুকে কোমরে হাত রাখলেন কর্নেল। নিঃশব্দে সংযত রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন তিনি। ‘নিক, নিজের কেবিনে যাও,’ চাপা গলায় বললেন। ‘তুমি মাতাল হয়ে গেছো, জারিন থেকে রাতে আর বেরবে না।’

কুকড়ে ছোটো হয়ে গেল নিক শেডি, যেন ভয় করছে কর্নেল তাকে আঘাত করবেন। পরমুহূর্তে সে তার গলাটা লম্বা করে দিয়ে চিংকার করে উঠলো, ‘আপনি শুনে ফেলায় আমি খুশি। আমি চেয়েছিলাম আপনি শুনুন।’ ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো তার কণ্ঠস্বর, ‘আমি আপনার মৃত্যু কামনা করি। দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করে নরওয়েতে এসে অ্যানা এনামেলসেনের সাথে পরিচয় হবার আগে যদি আপনি মারা যেতেন, তাহলে সবচেয়ে বেশি খুশি হতাম।’ বাক্স থেকে লাফ দিয়ে দাঁড়ালো সে, তার সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠলো, সিলিঙের দিকে মুখ তুলে রুদ্ধশ্বাসে বললো, ‘খুশি হতাম যদি আমার জন্ম না হতো।’

‘মিঃ রানা। ওকে আপনি ওর কেবিনে নিয়ে যান, প্লিজ।’ থরথর করে কাঁপছেন কর্নেল ওয়াকার।

নিক শেডির দিকে তাকালো রানা।

ছিটকে দূরে সরে গেল নিক শেডি, কর্নেল ওয়াকারের দিকে ঘূর্ণাস্তরে তাকালো সে, তার মুখের সামনে মুঠো পাকানো হাত নেড়ে চাপা গলায় বললো, ‘তার মৃত্যুর জন্যে আপনি যদি দায়ী হন,’ হিস-হিস করে উঠলো তার কণ্ঠস্বর, ‘আমার হাত থেকে ঈশ্বরও আপনাকে বাঁচাতে পারবে না।’

কর্নেলের বিশাল, মোটা একটা হাত নিক শেডির কজ্জিটা খপ করে



ধরে ফেললো। 'কি বলতে চাও তুমি ?' ভাব দেখে মনে হলো, ঘুসি  
মেরে নিক শেডির মুখটা খেঁতলে দেবেন তিনি।

অকস্মাৎ নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটলো নিক শেডির বেচপ  
ঠোটে, সে যেন কোণঠাসা করে ফেলেছে কর্নেলকে। 'পাপ বাপকেও  
ছাড়ে না, কর্নেল ওয়াকার রোসেট।'

'খবরদার, আমার সাথে হেঁয়ালি করবেন না।' গর্জে উঠলো কর্নেল।

'তাহলে পরিষ্কার করেই বলি, চেয়ারম্যান সাহেব,' পান্টা চিংকার  
করলো নিক শেডি। 'বোনার পাইটনের প্রেমিকাকে ভাগিয়ে এনে  
বিয়ে করেছেন আপনি। এবার ষড়যন্ত্র করেছেন, কোম্পানীর শেয়ার  
যাতে তার হাতছাড়া হয়ে যায়। তারচেয়েও খারাপ, আপনারা তাকে  
পথের ভিখিরি করতে চেয়েছেন। তবে, চিন্তা করবেন না, রোসেট।  
তার মৃত্যুর আসল কারণ আমি জানবো। যদি জানতে পারি আপনি  
দায়ী,' লম্বা শরীরটা আরো কুঁজো হলো তার, কর্নেলের চোখের সাথে  
সমান্তরাল রেখায় নামিয়ে আনলো মুখ, 'আপনাকে আমি নিজের  
হাতে খুন করবো।' ঘুরে দাঁড়ালো সে, টলতে টলতে দরজার দিকে  
এগোলো।

দরজার কাছে পৌছে গেছে নিক শেডি, এই সময় বাকশক্তি ফিরে  
পেলেন কর্নেল ওয়াকার, 'আজ থেকে কোম্পানী তোমাকে দায়িত্ব  
থেকে অব্যাহতি দিলো।'

ঘুরলো নিক শেডি, চিকণ হাসি ফুটে রয়েছে কুৎসিত চেহারায়।  
'বোকামি করবেন না, রোসেট। জিনিসটা দেখতে ভালো হবে না—  
প্রথমে বোনার পাইটন, তারপর আমি—উহঁ।' আবার ঘুরে মারিকার  
মুখোমুখি হলো সে। ছিটকে সরে গেল মারিকা, চোখ দুটো বিস্তা-  
রিত, মুখ ফ্যাকাসে। কেবিন থেকে বেরিয়ে যাবার আগে এক মুহূর্ত

সামলো নিক শেডি, গলা লম্বা করলো মারিকার দিকে, তবে কিছু  
কলতে গিয়েও বললো না। হঠাৎ গলা ছেড়ে কর্কশ শব্দে হেসে উঠলো  
সে, প্যাসেজ ধরে ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল শব্দটা। তার গমন পথের  
দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো মারিকা।

রানার দিকে ফিরলেন কর্নেল। ক্রম্যপ্রার্থনার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকা-  
লেন তিনি। 'এ-ধরনের নাটকীয় দৃশ্যের দর্শক হতে হলো, সত্যি  
আমি হুঃখিত, মিঃ রানা। বুঝতেই পারছেন, লোকটার মাথা ঠিক নেই।  
লাইটন অরুরোধ না করলে ওকে কখনোই আমি চাকরি দিতাম না।  
তবে এই প্রথম জানলাম, আমার ব্যক্তিগত কিছু ব্যাপার জানা আছে  
ওর। অসুস্থ মনে আমার বিরুদ্ধে অকারণ প্রতিহিংসার জন্ম হয়েছে।  
আমি খুশি হবো আপনি যদি কথাগুলো নিজের ভেতর চেপে রাখেন।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' কর্নেল ভয়ানক একটা ধাক্কা খেয়েছেন, তাঁর চিবুক  
কাঁপতে দেখলো রানা। 'গুডনাইট,' বললো ও।

কেবিন থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন কর্নেল। নিক  
শেডির রেখে যাওয়া একটা বোতল থেকে গ্রাসে খানিকটা ছইস্কি  
চাললো রানা। ভাবলো, এ কিসের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে  
সে?

## চার

পরদিন সূর্যের দেখা পাওয়া গেল না। কালো চেহারা পেলো সাগর, ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা। দক্ষিণ থেকে ছুটে আসা টানা বাতাস গোমরামুখে। কিছু মেঘ খেদিয়ে আনলো। মাত্র এক রাত জাহাজ চালিয়েই ওরা যেন পিছনে ফেলে এসেছে গ্রীষ্ম কালটা। নেশাগ্রস্ত মাতালের মতো ছলতে শুরু করলো লিবার্টি-ধ্বি। আজ সকালে জাহাজের পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এখানে সেখানে দলবঁধে দাঁড়িয়ে আছে জুঁরা, কথা বলছে চাপা স্বরে। চারদিকে একটা ধমধমে ভাব।

কাজ তদারক করতে বেরিয়ে রানা লক্ষ্য করলো, আজ কেউ ওকে দেখে হাসছে না। ছপুরের দিকে ছ'জন লোকের মধ্যে প্রচণ্ড এক মারামারির ঘটনা ঘটলো। রানা থামাতে যাবে, কিন্তু বাধা দিলো কক্সন। চীফ এঞ্জিনিয়ারকে ব্রিজ ডেকে পাঠিয়ে গোলযোগের কারণ জিজ্ঞেস করলো রানা।

মাথা চুলকালো ওয়েজনার। 'ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। এটা আসলে বোনার পাইটনের জাহাজ, এই অর্থে যে জুঁরা বেশির-ভাগ টনসবার্গের লোক। ওরা এখন জানে বোনার পাইটন মারা

গেছেন, তাই... ।’

‘কিভাবে জানলো তারা ?’

‘কেন, কাল রাতে নিক শেভির সাথে চেয়ারম্যানের একচোট হয়ে গেল না ? ভেবেছেন, এ-সব কোনো জাহাজে চাপা থাকে ? আপনি হয়তো অবাক হবেন, কিন্তু কথাটা সত্যি, কুরা অত্যন্ত ভালোবাসে নিক শেভিকে । যেমন ভালোবাসতো তারা বোনার পাইটনকে ।’

‘কিন্তু তিনি মারা যাওয়ায় মারামারি করতে হবে ?’

‘ও কিছু না, স্রেফ নিজের কোভ দমন করার একটা চেষ্টা । আপনাকে ন্যূন গলাতে না দিয়ে ভালো করেছে ককসন । টনসবার্গ আর স্যাণ্ডেফিওর্ডের লোকজন মারামারি করবে না, তাই কি হয় ! নিশ্চয়ই শুনেছেন, আহত হয়েছে স্যাণ্ডেফিওর্ডের লোকটা ?’

‘স্যাণ্ডেফিওর্ড নরওয়ের একটা হোয়েলিং টাউন, তাই না ?’

‘হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় । টনসবার্গও আরেকটা হোয়েলিং টাউন ।’

‘শুধু দুই শহরের মধ্যে রেবারেবি আছে বলে জাহাজে এসে ওদেরকে মারামারি করতে হবে ?’

‘ক্যাপটেন, আপনি বুঝছেন না । বোনার পাইটন ছিলেন টনসবার্গের লোক । কোম্পানীর লোকজন তিনিই রিক্রুট করেন, ফলে টনসবার্গের লোকদেরই এনেছেন তিনি । কিন্তু মিসেস রোসেট স্যাণ্ডেফিওর্ডের মেয়ে, নিজের এলাকায় তাকে নাকি রানীর মর্যাদা দেয়া হয় । কারণটা যাই হোক, মিসেস রোসেটের নির্দেশে গত মৌসুমে কোম্পানীতে স্যাণ্ডেফিওর্ডের লোক ঢোকানো হয় । ফলে টনসবার্গের লোকজন খেপে আছে ।’

‘তারা প্রতিবাদ জানাতে পারে, কিন্তু স্যাণ্ডেফিওর্ডের লোককে ধরে পেটাবে, এ কেমন কথা ?’

‘যোনার পাইটনের মৃত্যুর কথা চেপে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। সেটাই তাঁদের রাগের আসল কারণ,’ বললো ওয়েজনার। ‘টনসবার্গের লোকেরা সন্দেহ করছে...।’

‘কি সন্দেহ করছে?’

‘মানে... হু’একজন লোককে জাহাজ থেকে ওরা যদি ফেলে দেয়, আমি একটুও আশ্চর্য হবো না!’ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো চীফ এঞ্জিনিয়ার।

‘তারমানে?’ রানা অবাক। ‘কাকে ফেলে দেবে? কেন?’

মাথা নাড়লো ওয়েজনার। ‘আর আমি কিছু বলবো না!’

‘তুমি কি রোসেট আর তাঁর ছেলের কথা বলছো?’

‘আমি আর কিছু বলবো না,’ আবার মাথা নাড়লো ওয়েজনার, তবে তার চোখের দৃষ্টি দেখে রানা আন্দাজ করলো, ওর ধারণাই ঠিক।

কঠোর হলো রানার চেহারা। ‘আমার জাহাজে আমি কোনো দলাদলি বা অপ্রীতিকর ঘটনা সহ্য করবো না। কথটা সবাইকে তুমি জানিয়ে দেবে।’

চেহারায় সম্ভ্রান্ত একটা ভাব ফুটে উঠলো চীফ এঞ্জিনিয়ারের। ‘আমি আপনাকে কিছু বলেছি, প্লিজ, ক্যাপটেন, কেউ যেন তা না জানে।’

‘স্যাণ্ডেফিওর্ডের লোকটা এখন কেমন আছে?’

‘টনসবার্গের লোকজনই তার সেবা-যত্ন করছে। এটাই এখানকার রীতি। মারধর করলেও, তাকে সুস্থ করে তুলতে সবাই খুব উৎসাহ দেখায়।’

‘পরে আবার যাতে পেটানো যায়?’

হেসে ফেললো ওয়েজনার। ‘ওদের আপনি ঠিক চিনতে পেরেছেন,

স্যার ।’

‘জাহাজে সাণ্ডেফিওর্ডের লোক ক’জন ?’

‘ওই একজনই, স্যার । ব্যাটা কেপটাউনের হাসপাতালে ছিলো, ফ্যাক্টরি শিপে ফিরছে । এখানে অবশ্য টেনশন থাকলেও মারামারির ঘটনা প্রায় ঘটেই না । কারণ সংখ্যায় ওরা ফিফটি-ফিফটি ।’

চীফ এঞ্জিনিয়ারকে বিদায় করে দিয়ে ত্রিজে পায়চারি শুরু করলো রানা । জাহাজের খমখেমে পরিবেশ সম্ভবত কর্নেল ওয়াকারও টের পেয়েছেন, বোধহয় সেজন্যেই তাঁর কথাবার্তায় নরম সুর । আজ সারাদিন তাঁর দেখা পায়নি রানা । নিজের কেবিন থেকে একবারও বেরোননি ।

সন্ধ্যা সাতটার দিকে ত্রিজে এলেন তিনি । ওভারকোট পরায় আরো প্রকাণ্ড লাগলো তাঁকে । ‘কোকুন তার পজিশন জানিয়েছে নাকি ?’ জিজ্ঞেস করলেন রানাকে ।

‘হ্যাঁ,’ বললো রানা । ‘ক্যাপটেন জোনাস ভেনসমের কাছ থেকে একটা মেসেজ পেয়েছি ।’

‘ওড ।’ হেলমসম্যানের কাঁধের ওপর দিয়ে ঊকি দিলেন কর্নেল, তাকালেন কম্পাসের দিকে, তারপর চোখ তুলে তাকালেন ত্রিজের বাইরে, অন্ধকার সাগরে । ‘এখানে একটা মারামারির ঘটনা ঘটেছে ।’

‘হ্যাঁ । টনসবার্গ বনাম সাণ্ডেফিওর্ড । টনসবার্গ জিতেছে ।’ কেন যে রানা এই ভঙ্গিতে কথাগুলো বললো নিজেও জানে না ও, ওর মনে সম্ভবত কর্নেলের মুখ খোলাবার ইচ্ছে রয়েছে ।

চট করে একবার রানার দিকে তাকালেন কর্নেল, তারপর হেলান দিলেন উইণ্ডট্রেকারের গায়ে । ‘যতো নষ্টের গোড়া হলো মেয়েমানুষ,’ বিড়বিড় করে বললেন তিনি । ‘আপনি বিয়ে করেছেন ?’

যাত্রা অন্তঃ ১

‘না।’

কর্নেলের মাথা ঝাঁকানো দেখে মনে হলো বলতে চান, খুব ভাল কাজ করেছেন, আপনি ভাগ্যবান। ‘পুরুষমানুষের সাথে ওদের কো-ডুলনাই হয় না,’ বললেন তিনি, সরাসরি রানার চোখে তাকিয়ে আছেন। ‘পুরুষের দৃষ্টি প্রসারিত, মেয়েদের সংকীর্ণ। স্বামীকে যত্নে না ভালোবাসে, তারচেয়ে বেশি ভালোবাসে নিজের ছেলেকে। মানব-চরিত্র সত্যি বড় অদ্ভুত।’

‘আজও ওটা বদলায়নি, ইয়া,’ মুহূর্তে বললো রানা।

‘আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত...।’

‘কিন্তু আসলে আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন আমাকে?’ সরাসরি জিজ্ঞেস করলো রানা।

চন্দার ভেতর দিয়ে রানাকে ভীক্ষুদৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন কর্নেল ভয়াকার। কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। ‘জানি না,’ একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বললেন। ‘তবে, আপনি অত্যন্ত ইন্টেলিজেন্ট, আপনি এ-সবের সাথে জড়িত নন, একজন আউটসাইডার। বোঝা খুব বেশি ভারি হয়ে উঠল কথা বলে সেটা হালকা করার চেষ্টা করে মানুষ, আমিও বোধ-হয় তাই করছি।’ মুখ কিরিয়ে আবার তিনি সাগরের দিকে তাকালেন। ‘শেডি, আপনাকে বলেছে, আমি মারা যাচ্ছি, তাই না?’

‘সে বললো, আপনার নাকি স্ট্রোক হয়ে গেছে...।’

‘ও’বার, একবারের কথা কেউ জানে না। ইয়া, মারা যাচ্ছি আমি।’

‘আমরা সবাই কি তাই যাচ্ছি না?’

‘কিন্তু সমার তো সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়নি। ইউরোপের সেরা ডাক্তাররা বলছে, টেনেটেনে আর এক বছর।’ হঠাৎ হেসে উঠলেন কর্নেল, আঙুলজটা তিক্ত। ‘এ-কথা শোনার পর জীবনের ধরন-ধারণ



বদলে যায় মায়াবের। আগে যে-সব জিনিস গুরুত্বপূর্ণ মনে হতো, সেগুলো গুরুত্ব হারিয়ে কেল। যেগুলোর কোনো গুরুত্ব ছিলো না, সেগুলো হয়ে ওঠে জরুরী। ক্যান্ট্রি লিপে পৌছে, আপনার প্রতি অমুরোধ, আমার ছেলেটাকে একটু খুঁটিয়ে দেখবেন। তার সম্পর্কে আপনার ধারণা জানতে পারলে আমি খুশি হবো।' ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, ভারি, ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে নেমে গেলেন ব্রিজ থেকে। তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা, ভাবলো ভদ্রলোককে আরো কিছুক্ষণ ধরে রাখতে পারলে ভালো হতো, কিছু প্রশ্ন করার ছিলো।

সেদিন রাতে খেতে বসেছে সবাই, রেডিও অপারেটর একটা মেসেজ নিয়ে এলো। পড়ার সময় চেহারা বদলিয়ে হয়ে উঠলো কর্নেলের, খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি। 'আপনার সাথে কথা বলতে পারি, ক্যাপটেন রানা?'

কর্নেলের পিছু পিছু তাঁর কেবিনে ঢুকলো রানা। দরজা বন্ধ করে মেসেজটা ওকে পড়তে দিলেন তিনি। 'পড়ে দেখুন।'

আলোর নিচে চলে এলো রানা। মেসেজটা পড়লো, 'চেয়ারম্যানকে, ক্যাপটেন সেনসম। বোনার পাইটনের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত চালানোর জন্যে লোকজন চাপ দিচ্ছে। তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন মার্ক রোসেট। আপনি দয়া করে প্রত্যাখ্যান অনুমোদন করুন। টেনসবার্গ লোকদের ভাবসাব বিপজ্জনক। যে-কোনো মুহূর্তে বিক্ষোভ ঘটতে পারে। তিনি নেই বললেই চলে। পজিশন—৫৭.২৮ দক্ষিণ ৩৪.৬২ পশ্চিম। প্যাক আইস বিপুল।'

মেসেজটা ফেরত নিয়ে মুঠোর ভেতর দলা পাকালেন কর্নেল। 'গর্দভ!' চাপা স্বরে গর্জে উঠলেন তিনি। 'তার এই মেসেজ থেকে জাহাজের সব লোক জানবে মার্কের সিদ্ধান্তে সে সন্তুষ্ট হয়নি। এ-যাত্রা অন্তত-১'

ধরনের একটা দাবি প্রত্যাখ্যান করে উচিত কাজটি করেছে মার্ক। এটা অফিসারদের বিবেচ্য বিষয়।' কয়েক মুহূর্ত পায়চারি করলেন তিনি, হু'আঙুলে কানের লতি ডলছেন। 'আমাকে যেটা উদ্দিগ্ন করেছে, ওরা তদন্তের দাবি জানাবার সাহস পেলো কিভাবে! কেসটা যদি তদন্ত করার উপযোগী হতো, ওরা দাবি করার আগেই একটা কমিটি গঠন করতো মার্ক। টেনসবার্গের লোকদের ভাবসাব বিপজ্জনক, ভেনসমের এই কথাটা আমি পছন্দ করতে পারছি না।' ঝট করে রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'কতো তাড়াতাড়ি কোকুনে পৌঁছতে পারবে। বলে আশা করা যায়?'

'কমকরেও আটদিন লাগবে।'

'আটদিনে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে! মেসেজের সবচেয়ে খারাপ দিক হলো, তিমি নেই। তিমি না থাকলে, জুরা সামান্য ব্যাপার নিয়ে খুন-খারাবি পর্যন্ত করে বসে। আর পাইটন মারা যাওয়ার পর তিমি না থাকটা আরো বিপজ্জনক। ওরা কুসংস্কারে বিশ্বাসী। পাইটন নাকি তিমির গন্ধ পেতো।'

'ঠিক কি ভয় করছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'জুরা মিউটিনির বু'কি নেবে বলে মনে হয়?'

'নেবে কি নেবে না, ওখানে পৌঁছে বুঝতে পারবো। বিদ্রোহ যদি নাও করে, এমন অসহযোগিতা করতে পারে যে কোম্পানী লাটে উঠবে। পঞ্চাশ মিলিয়ন পাউণ্ডের ব্যবসা এটা, একটা মৌসুম যদি মাঠে মারা যায়...।' আবার পায়চারি শুরু করলেন তিনি। '...এ ধরনের একটা পরিস্থিতি মার্কের পক্ষে সামলানো সম্ভব নয়। তার সে অতি-জ্ঞতা নেই।'

'সেক্ষেত্রে আর কাউকে দায়িত্ব দিন,' পরামর্শ দিলো রানা।

‘জোনাস ভেনসমকে ?’

আবার কানের লতি ডললেন কর্নেল। ‘না...না। পরিস্থিতি  
কিভাবে সামলাতে হয়, নিজে থেকে শিখুক মার্ক। যাই, ভেনসমের  
সাথে কথা বলি।’ কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

ত্রিঙ্গে ফিরে এলো রানা। আধো অন্ধকারে লাগরকে যুঁসতে  
দেখলো ও। চেউয়ের মাথা থেকে লাফ দেয়ার সময় প্রতিবার কাত  
হয়ে পড়লো জাহাজ। একটা আলব্যাট্রিস মাথার উপর চকর দিচ্ছে।  
বাতাস অসহ্য ঠাণ্ডা। উইণ্ডব্রেকারের গায়ে তুষারের পাতলা স্তর  
জমেছে। ছইল হাউসে এসে ব্যারোমিটার দেখলো রানা। তাপমাত্রা  
অনেক নেমে গেছে, নামছে আরো। দড়াম করে সশব্দে ছপাট খুলে  
গেল দরজা, ভেতরে ঢুকলো মারিকা। ‘আবহাওয়া খুব খারাপ মনে  
হচ্ছে,’ বললো সে। ঠাণ্ডায় নীলচে হয়ে গেছে তার মুখ।

মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে একটা সিগারেট অফার করলো রানা। লাই-  
টার ছেলে সেটা ধরিয়ে দেয়ার সময় লক্ষ্য করলো মারিকার হাত ছটো  
একটু একটু কাঁপছে। বুক ভরে ধোঁয়া টানলো সে। তারপর জিজ্ঞেস  
করলো, ‘মেসেজটা কি জোনাস ভেনসম পাঠিয়েছে?’ মাথা ঝাঁকালো  
রানা। ‘কি লিখেছে?’ জানালো রানা। মুখ ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে  
বাইরে তাকালো মারিকা, কিছুক্ষণ কথা বললো না। তারপর হঠাৎ  
ফিসফিস করে উঠলো, ‘আমার ভয় করছে, রানা।’

‘দায়ী এই আবহাওয়া।’

সিগারেট ফেলে দিয়ে জুতোর ডগা দিয়ে সজোরে পিষলো মারিকা।  
‘না। আবহাওয়া নয়। বাবা মারা গেছেন, আমার ছুঁতু হওয়ার কথা।  
কিন্তু তা হচ্ছে না—আমার ভয় করছে।’

মারিকার একটা হাত ধরলো রানা। বরফের মতো ঠাণ্ডা। ‘সব

ঠিক হয়ে যাবে, মারিকা। দেখবে ফ্যাক্টরি নিপে পৌছে...

‘কি জানি... আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, সব শুক।’ মারিকার হুচোখে অশ্রু আশংকা। ‘শেডি কি যেন একটা জানে, আমরা যা জানি না।’ তার গলা কঁপে গেল।

‘কি জানবে সে?’

‘ভেবো না অকারণে ভয় পাচ্ছি আমি,’ হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে যানকটে বললো মারিকা। ‘এই প্রথম একটা রহস্য ধীরে ধীরে ভেঙে খুলছে আমার সামনে।’

অনেকক্ষণ আর কোনো কথা হলো না। তারপর রানার একটা হাত ধরলো মারিকা। ‘কথা যা বলি সব নিজের। তোমার কথা বলো। আমি শুনবো। কি তুমি, মাসুদ রানা? সংখ্যাটা বলতে পারবে। আজ পর্যন্ত কতো মেয়ে তোমাকে দেখে পাগল হয়েছে?’

হেসে উঠে রানা জিজ্ঞেস করলো, ‘তোমাকে ধরে, নাকি তোমাকে বাদ দিয়ে?’

নিষ্পাপ, অভিমানী শিশুর মতো রানার বুকে সঁটে এলো মারিকা, আদরের কাঙাল। ‘সব কথা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে আমার বলতে ইচ্ছে করছে, আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি, রানা। আমি পাগল হয়েছি, কিন্তু তার কোনো প্রকাশ তুমি দেখতে পাচ্ছে না। প্রকৃতি বোধহয় সব ব্যাপারেই ভারসাম্য রক্ষা করে। বাবার অকস্মাৎ মৃত্যু, নিজেকে নিয়ে ভয়, এ-সব নিয়ে এতো অস্থির হয়ে আছি যে আগুনে ঝাপ দেয়ারও ফুরসত পাচ্ছি না।’

‘এর আগেও কথাটা বলেছো। ঝাপটা আগুনে দেয়া হবে কিনা, কি করে বুঝলে?’

‘সব মেঘ থেকে বৃষ্টি আশা করা যায় না, রানা। তেমনি সব প্রেমের

পরিণতি মধুর হয় না। ভালোবাসা সম্ভব নয়, কিন্তু পাওয়া যায়, ছুনিয়ায় এমন পুরুষই বেশি। নারীমূলভ অসুদৃষ্টিই আমাকে সাবধান করে দিয়েছে, তোমাকে আমার পাওয়া হবে না। তোমাকে ভালোবাসা মানে নরকযন্ত্রণা ভোগ করা।’

‘কাছেই, মেয়ে, সাবধান! শিশুকালেই ভালোবাসার কবর রচনা করো।’

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো মারিকা। ‘নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছি শুধু মাথার ওপর বিপদ ঝুলছে বলে। তা না হলে তোমাকে নিয়ে যে কি করতাম, সত্যি আমি জানি না।’

প্রসঙ্গটা বদলানোর তাগিদ অনুভব করলো রানা। ‘এটাই কি তোমার প্রথম অ্যান্টার্কটিকায় আসা?’

‘না। আট বছর বয়সে বাবার সাথে সাউথ জর্জিয়ায় এসেছিলাম। মা তখন মাত্র মারা গেছে। বাবার সাথে তখন বেশ ক’বার তিমি মারতে গেছি, ক্যাচারে চড়ে।’

‘তারমানে তোমাকে একজন অভিজ্ঞ হোয়েলার বলা যায়।’

‘তবে এরিকা পিটারসনের মতো নই আমি।’

‘সে আবার কে?’

‘এরিকা, ডাফ পিটারসনের মেয়ে। সাউথ জর্জিয়ায় থাকার সময় বাবার মেট ছিলেন ডাফ পিটারসন। এরিকা আর আমি সমবয়সী। সে শুধু নামেই মেয়ে, কাজে-কর্মে পুরুষমানুষেরও বাড়া। আমাদের কোম্পানীতে এটা তার দ্বিতীয় মৌসুম। ওর বাবা বলেন, এরিকাকে তিনি ক্যাপটেন বানাবেন।’

‘খুব কঠিন পাত্রী মনে হচ্ছে?’

‘নিজ গুণে বাপের মেট হয়েছে এরিকা। কোনো পরীক্ষায় কখনো

দ্বিতীয় হয়নি সে। হ্যাঁ, কঠিন পাত্রী। তবে ওর মতো সুখী মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি।’

আচমকা প্রচণ্ড বাতাসের একটা ঝাপটা আঘাত করলো জাহাজকে। কাত হয়ে গেল লিবাটি ধি, ঢেউয়ের মাথা থেকে প্রায় খাড়াভাবে গোস্তা খাওয়ার ভঙ্গিতে নিচে নামছে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো কক্সন। ‘আমি যাই,’ বললো মারিকা।

‘চলো, আমিও নিচে নামবো,’ বললো রানা। ‘ঝড় শুরু হওয়ার আগে খানিকটা ঘুমিয়ে নেয়া দরকার।’ কক্সনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে মারিকার সাথে নিচে নেমে এলো ও, তাকে তার কেবিনে পৌঁছে দিলো।

দরজার গায়ে হেলান দিলো মারিকা। ‘তোমার সাথে এরিকার পরিচয় করিয়ে দেবো, ওকে তোমার ভালো লাগবে।’ ক্ষীণ হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে। ‘গরম কাপড়চোপড় আছে তো? ভোরের দিকে ব্রিজে খুব ঠাণ্ডা লাগবে।’

‘ভাগ্য ভালো যে রকম্যান আর আমার সাইজ মিলে গেছে।  
গুড...।’

রানাকে বাধা দিলো মারিকা। ‘ভেতরে ঢুকবে না? এক কাপ কফি খাওয়াতে পারি তোমাকে?’

‘নতুন ক্যাপটেনকে বিপদে ফেলতে চাও? তোমার নিজেরও কি দুর্নামের ভয় নেই?’

‘টনসবার্গের লোকেরা আমাকে চেনে, তারা জানে আমার দ্বারা কোনো নোংরা কাজ সম্ভব নয়।’

মারিকা আঘাত পেতে পারে জেনেও প্রশ্নটা করলো রানা, ‘কিন্তু ওরা যখন ফটোগুলোর কথা জানবে?’

‘কটোগুলো আপত্তিকর নয়, আপত্তিকর ফটোর পিছনে লেখা-  
গুলো। কি লেখা আছে জানতে পারলে আমাদের ওরা বোকা  
হবে।’

‘কি লেখা আছে?’

‘হুই ডজন ছেলেমেয়ে চাই আমরা, হানিমুনে যাবে! অ্যান্টার্কটিকায়,  
এই সব। মার্কের লেখা, নিচে আমরা ছ’জন সই করেছি। তখন এতো  
ছেলেমানুষ ছিলাম যে... আর, ওকে আমার ভালোও লাগতো...কে  
জানতো মার্কের আসল পরিচয় সে একটা লম্পট, নিষ্ঠুর, কুমত্যা-  
লোভী...।’

‘ঠিক আছে, এ-প্রসঙ্গ থাক। বলছিলে কফি খাওয়াবে...।’

‘দুঃখিত, আজ নয়, আরেকদিন। কিছু মনে করো না।’ কথা শেষ  
করে ঘুরলো মারিকা, কেবিনে ঢুকে পিছনে বন্ধ করে দিলো দরজা।

নিজের কেবিনে ফিরে এসে শুয়ে পড়লো রানা। সিলিঙের দিকে  
দ্রুত চোখে তাকিয়ে থাকলো ও, জেগে থাকলো অনেকক্ষণ। সাগরের  
অস্থিরতা ক্রমশ বাড়ছে, বাড়ছে বাতাসের গতিবেগ। দু’হাজার মাইল  
দূরে ক্যান্ট্রি শিপের আশপাশে আবহাওয়া কেমন কে জানে, ভালো  
রানা।

সর্বশক্তি নিয়ে ঝড়টা হানা দিলো ভোর চারটের দিকে। বাতাস  
থেকে হিটকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হওয়ায় ঘুম ভাঙলো রানার।  
সম্ভাব্য সব ব্রকম শব্দ তুলে প্রতিবাদ জানাচ্ছে জাহাজটা, রানা অমু-  
ক্ত করলো কেবিনের ইম্পাত পানির প্রচণ্ড চাপে যেন তুবড়ে যেতে  
বসেছে। জাহাজটা যেন অ্যান্ড একটা প্রাণী, শ্বাসকষ্টে ভুগছে।

অফেলিন গায়ে চড়িয়ে তৈরি হলো রানা, ভেতরে ঢুকলো কক্-  
সন। কোনো কথা হলো না, লোকটা শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে আবার



বেরিয়ে গেল। বাইরে বেরুতেই বাতাসের প্রচণ্ড ধাক্কায় কেবিনের  
গায়ে সেঁটে গেল রানার শরীর। রেইল ধরে মই বেয়ে উঠতে এচুর  
সময় লাগলো, একটু অসতর্ক হলেই তুফান ওকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।  
সবুজ সাগর ছোবল মারছে আফটার ডেকে।

ত্রিজে উঠলো রানা। সংক্ষিপ্ত রাতের অবসান ঘটেছে। কিন্তু ভোর  
মানে আলো নয়, আধো অন্ধকার। ঢেউগুলো পাহাড়ের মতো উচু,  
প্রতিটির মাথায় সাদা ফেনা টগবগ করে ফুটছে। ঢেউয়ের চূড়া যেমন  
বিরতিহীন খসে পড়ছে, তেমনি তুমুল বর্ষণেরও কোনো বিরাম নেই।  
চারদিকে শুধু বৃষ্টি আর সাগরের তৈরি কালো ও ভারি পর্দা ছাড়া  
দেখার কিছু নেই।

পরবর্তী আটটা দিন যেন নরকে বাস করলো ওরা। বাতাসের  
গতিবেগ মাঝে-মাঝে কমলো, তবে কখনোই ফোর্স সিঙ্ক-এর নিচে  
নামলো না। সাগর যেন ঢেউ খেলানো সচল পাহাড়শ্রেণী। জাহাজের  
এক ইঞ্চি জায়গাও শুকনো থাকলো না। প্রায় সবাই আক্রান্ত হলো  
সী-সিকনেসে। আটদিনে ওরা মাত্র একবার সূর্যের মুখ দেখলো, তাও  
ঝাপসা আলোর আভাস মাত্র, কয়েক মিনিট পর উজ্জলতাটুকু আবার  
নিঃশেষে মুছে গেল। চিন্তাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লো। ক্রুদের, যান্ত্রিক  
রোবটের মতো শুধু যে-যার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। রানাও ব্যতি-  
ক্রম নয়—এক এক করে মারিকা, অভিযানের উদ্দেশ্য, ফ্যাক্টরি শিপ  
কোকুন, বোনার পাইটনের মৃত্যুরহস্য ইত্যাদি ভুলে গেল ও। জাহাজ  
আর ক্রুদের নিরাপত্তা ছাড়া মাথায় আর কিছু থাকলো না। মনে  
থাকলো না শেষ কবে ঘুমিয়েছে।

লোকজনের সাথে খুব কম দেখা হলো রানার। ত্রিজেই বেশিরভাগ  
সময় কাটলো ওর। আটদিনে মাত্র দু'বার ত্রিজে এলেন কর্নেল ওয়া-

কান, তার ভারি চেহারা নীল হয়ে গেছে, শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। তবে  
ক্যান্টরি নিপে পৌছানোর আগেই দিতে তিনি ভুললেন না। অদ্ভুত  
এক জেদ লক্ষ্য করলো রানা তার মধ্যে। বিরূপ প্রকৃতির ওপর অত্যন্ত  
শাস্তি আছেন। দ্বিতীয়বার ত্রিজে এসে থাকলেন মাত্র তিন মিনিট,  
কিন্তু আর বেয়াড়া সাগরকে অভিশাপ দিলেন। মই বেয়ে নামার সময়  
তার পা পিছলে গেল, রানা না ধরলে পানির ঝাপটা আর বাতাসের  
ঝড় সাগরে গিয়ে পড়তেন। এরপর আর ত্রিজে আসেননি।

মারিকাও একবার এলো, কেবিন ছেড়ে বের হওয়ায় খুব বকাঝকা  
করলো তাকে রানা। পরে মনে হয়েছে ওর, তার সাথে কর্কশ ব্যবহার  
করেছে ও। তবে তারপর থেকে রোজ একটা ফ্রাঙ্ক করে ব্যাণ্ডি  
পাঠালো মারিকা। মনে মনে মেয়েটার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলো  
রানা।

রোজ একবার করে ত্রিজে এলো একা শুধু কাইশু ওকোমো। সে-ও  
সী-সিকনেসে ভুগছে। তবু বিপদের ঝুঁকি নিয়ে একবার অন্তত ত্রিজে  
জাসা চাই তার, সাথে থাকে ক্যামেরাটা। মুখর লোকটা ভাষা হারিয়ে  
কেনেছে, ত্রিজে এসে মাত্র একটা কথা বলে সে, 'আবার সব শাস্ত  
হবে বাবে, ঠিক কিনা?'

তাকে একদিন ডঃ নিক শেডির কথা জিজ্ঞেস করলো রানা, 'সে কি  
অসুস্থ?'

'অসুস্থ কে নয়?' জবাব দিলো কাইশু ওকোমো। 'কিন্তু যে লোক  
রোজ হু'বোতল মদ গেলে তার কাছে অসুস্থতা কি জিনিস? হি ইজ  
ইনফেডিবল, দ্যাট ম্যান।'

এক অর্ধে ঝড়টা শুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। স্যাণ্ডেফিওর্ডের  
আঁকটাকে নিয়ে নতুন আর কোনো ঝামেলা বাধলো না। জুরা সবাই

নিজেদের ও জাহাজের অস্তিত্ব রক্ষাতেই ব্যস্ত থাকলো।

চোদ্দ তারিখে সাউথ জর্জিয়ার পাঁচশো মাইল পূবে পৌঁছলো ওরা। ইতোমধ্যে দিনের আলো প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা স্থায়ী হয়ে গেছে। পনেরো তারিখে বৃষ্টি হলো না, দৃষ্টিসীমা আগের চেয়ে বাড়লো, এবং এই প্রথম আইসবার্গ দেখতে পেলো ওরা। সন্ধ্যার খানিক পর মাস্তুলের মাথা থেকে লুকআউট জানালো, পোর্ট সাইডে তীর দেখতে পেয়েছে সে। স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের প্রথম দ্বীপ ওটা। পলকের জন্যে দেখা দিয়ে এতো দ্রুত মিলিয়ে গেল যে সন্দেহ হলো, সত্যি ওরা কিছু দেখেছে কিনা। অকস্মাৎ ঘন কালো মেঘে ঢাকা পড়ে গেল দিগন্ত, তুমুল বর্ষণ যেন নিশ্চিহ্ন দেয়াল ভুলে দিলো ওদের সামনে।

এরপর থেকে মাঝে মাঝেই আইসবার্গ দেখতে পেলো ওরা। কোনো কোনোটা বিশাল, বরফের স্তূপ নিয়ে টাওয়ারের মতো উঁচু, আবার কোনোটা হয়তো ছব্বছ ভূগর্ভ আকৃতির। একটাকে ওরা পাশ কাটালো, লম্বা সেটা নির্ধাৎ তিন মাইল হবে, মাথার দিকটা প্রায় পুরোপুরি সমতল, শুধু মাঝখানে মাস্তুল আর চিমনির আকৃতি নিয়ে খাড়া হয়ে আছে কয়েকটা বরফের পিলার, ফলে আইসবার্গটা দৈত্যাকৃতি একটা এরাক্রাফট ক্যারিয়ারের চেহারা পেয়েছে।

কোকুনের দেয়া সর্বশেষ পজিশনে পৌঁছচ্ছে লিবার্টি-বি, কাজেই সারাক্ষণ ব্রিজে থাকতে হলো রানাকে। কোকুনের সাথে ওদের রেডিও টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ থাকা উচিত ছিলো, আর/টি সেটের রেঞ্জ চারশো মাইল বা তারও বেশি। কিন্তু ঝড়ের শুরুতেই ওদের এরিয়াল ভেঙে গেছে, তারপর সেটা আর মেরামত করা সম্ভব হয়নি।

ষোলো তারিখ রাতে মরণকামড় দিলো ঝড়। দৃষ্টিসীমা কমতে

কমতে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে দুশো গজ দূরে কি আছে জানার উপায় থাকলো না। মাঝরাতেও দিকে জাহাজের গতি কমতে বাধা হলো রানা। খানিক পর লুকআউট চিৎকার করলো, 'আইসবার্গ!'

'স্নো অ্যাহেড,' নির্দেশ দিলো রানা। কয়েক মুহূর্ত পর সামনে চকচকে একটা সাদাটে ভাব লক্ষ্য করলো ও। ওটা আইসবার্গ নয়। এই প্রথম আলগা প্যাক আইস চাক্ষুষ করলো ওরা। দক্ষিণের নিরেট প্যাক আইস থেকে ঝড়ের সাথে ভেসে এসেছে তুষারস্তর।

থমথমে চেহারা নিয়ে কক্সন জানালো, 'গ্রীষ্মকালে এদিকে কখনো বরফ দেখা যায়নি।'

জাহাজ পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে নিলো রানা, স্নো অ্যাহেড নির্দেশ আগের মতোই বহাল থাকলো। সেদিন সকালে হঠাৎ করে শান্ত হলো বাতাস, সরে গেল মেঘ, আটদিন পর এই প্রথম রোদ লাগলো ওদের গায়ে। তবে সাগর আগের মতোই ফুঁসছে, গর্জনও কমেনি, অদৃশ্য এক সবুজ রঙ পেয়েছে পানি। দূর দক্ষিণে চকচকে সাদাটে ভাব দেখা গেল, দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে আলগা প্যাক আইস।

তারপর ক্রমশ স্নান হতে শুরু করলো সূর্য। আকাশ হারালো তার নীল। ভেজা ভেজা, স্নাতসৈতে ঠাণ্ডা গ্রাস করলো জাহাজকে। অদৃশ্য হলো দিগন্ত। সাদাটে চকচকে ভাবটুকু ঝাপসা হয়ে এলো, তারপর আর দেখাই গেল না। এক সময় সম্পূর্ণ অদৃশ্য হলো সূর্য। চারপাশের সমস্ত কিছু থেকে উধাও হলো রঙ। সবশেষে চারদিক অন্ধকার করে নেমে এলো কুয়াশা। শীত আরো জোরে কামড় দিলো।

সকাল দশটার দিকে ব্রিজে এলেন কর্নেল রোসেট। ঘুম আর খাদ্যের অভাবে সরু হয়ে গেছে তাঁর মুখ। 'আপনার পজিশন কি?' জানতে চাইলেন তিনি। 'রেডিও টেলিফোনে ফ্যাক্টরি শিপের সাথে

যোগাযোগ করা দরকার।’

‘ফিফটি-এইট সাউথ, থারটি-থ্রি, ওয়েস্ট,’ বললো রানা। তাঁকে নিয়ে হাইল্যান্ডসে চলে এলো, চার্ট খুলে পজিশনটা দেখালো। দক্ষিণ পিউল-এর কমবেশি দুশো মাইল পশ্চিমে রয়েছে ওরা। ‘নতুন এন্ট্রাল লাগানো হচ্ছে, ক্যাপটেন ভেনসম যোগাযোগ করলেই আপনাকে জানাবো।’

মাথা ঝাঁকিয়ে ত্রিজে চলে গেলেন কর্নেল। কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে কুরাশা দেখলেন তিনি। তারপর ঝট করে ফিরলেন রানার দিকে। তিনি শিকারের সাথে আমি পঁয়ত্রিশ বছর জড়িত, গ্রীষ্মকালে এমন দুর্ঘোষের কথা কখনো শুনিনি। আপনার চোখে হুঁ একটা তিসি পড়েছে?’

‘না।’

‘শেডি কোথায়?’

‘ঝড় শুরু হবার পর থেকে তাকে আমি দেখিনি।’

ঝড় ফিরিয়ে একদম জুর উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়লেন কর্নেল। তার দিকে ফিরলো লোকটা। ঠিক তাচ্ছিল্য নয়, তবে তার চেহারায় কেমন যেন নিলিঙ্গ ভাব দেখা গেল। ‘যাচ্ছি,’ বলে অলস পায়ে মইয়ের দিকে এগোলো সে।

চাবুকের মতো হিনহিস করে উঠলো কর্নেলের কণ্ঠস্বর, ‘যাচ্ছি, অনারবল ডিরেক্টর।’ কালো হয়ে গেল লোকটার চেহারা, কথাগুলো নিচু গলায় পুনরাবৃত্তি করলো সে, তারপর মই বেয়ে নেমে গেল। ত্রিজের স্টারবোর্ড সাইডে গিয়ে হাঁপাতে শুরু করলেন কর্নেল। নিক শেডি ত্রিজে না আসা পর্যন্ত ওখানেই একা দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি।

কোম্পানীর চেয়ারম্যানের সামনে সরু, ঝগ্ন লাগলো ডঃ শেডিকে।

তার চোখ জবা ফুলের মতো টকটকে লাল হয়ে আছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তবে আজ তাকে শাস্ত দেখালো, মদ খায়নি। মদ না খাওয়ায় চেয়ারম্যানের সামনে নার্ভাস হয়ে পড়লো সে।

‘চার বছর হলো পাইটন তোমাকে নিজানী হিসেবে চাকরি দিয়েছে কোম্পানীতে,’ কর্নেল তাকে বললেন। ‘এবার তুমি তোমার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করো। এবারের গ্রীষ্মকালটা এখানে স্বাভাবিক নয়। কোকুন থেকে সর্বশেষ রিপোর্টে জানা গেছে, ওদিকে তিমি নেই বললেই চলে। এদিকেও আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কাল-সকালের মধ্যে তোমার কাছ থেকে একটা রিপোর্ট চাই আমি, এ-অবস্থায় তিমির সম্ভাব্য গতিবিধি সম্পর্কে।’

‘কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে, আপনি আমাকে বরখাস্ত করেছিলেন,’ শুকনো গলায় বললো নিক শেডি, তার মস্ত কণ্ঠ ঘন ঘন ওঠা-নামা করলো।

‘ও-সব ভুলে যাও,’ কর্নেল বললেন। ‘তখন তুমি মাতাল ছিলে। আমি ধরে নিয়েছি, কি বলেছো তুমি নিজেও জানো না। এখন তুমি যেতে পারো, কাল সকালে রিপোর্ট চাই আমি।’

মাথা নিচু করে ব্রিজ থেকে নেমে গেল ডঃ নিক শেডি। খানিক পর কর্নেলও চলে গেলেন। এক ঘণ্টা পর ভয়েস পাইপে কাইন্স ওকোমোর গলা পেলো রানা, রেডিও আবার কাজ শুরু করেছে। কক্সনকে দায়িত্ব দিয়ে নিচের ডেকে নেমে এলো ও। ঘুমুতে না পারায় চোখ কলকল করেছে ওর, সারা শরীরে ব্যথা। কর্নেল ও মারিকা, দু’জনকেই ওয়ায়েরলেস রুমে পেলো ও। মারিকার চোখের নিচে কালি জমেছে। তবে তার হাসি এতোটুকু ম্লান হয়নি, রানাকে দেখে তার চোখ দুটোও নেচে উঠলো। ‘তুমি নিশ্চয় মারা গেছো, মাসুদ রানা।’

‘যেভাম, বাচিয়ে রেখেছে দৈনন্দিন বরাদ্দের ত্র্যাণ্ডটুকু,’ বললো রানা।

ডাড়াডাড়ি আরেক দিকে তাকালো মারিকা, যেন ধন্যবাদ পোয়ে ইচ্ছুক নয়। প্রকাণ্ড মাথাটা রানার দিকে ঘোরালেন কর্নেল ওয়াকার। ছোট্ট ফার ক্যাপটা মাথায় না থাকায় বিস্মিত পঁচার চেহারা পোয়েছেন তিনি। ‘আর/টি-তে কোকুনকে পাবার চেষ্টা করছিলাম,’ রানাকে বললেন। ‘এইমাত্র সাদার্ন উইণ্ডের সাথে কথা হলো। গত দশ দিনে মাত্র আটটা তিমি পেয়েছে ওরা। আরো দক্ষিণে, ওয়েডেল সাগরে যাচ্ছে। ওদের ক্যাপটেন সোলেংসেন বলছে, এ-ধরনের অবস্থার কথা কখনো শোনেনি সে। আমাদের কাছ থেকে তিনশো মাইল পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে ওরা।’

ঘড়ঘড় করে উঠলো রেডিও। স্পষ্ট যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এলো রিসিভার থেকে। ভাষাটা নয়ওয়ের। মাইকের দিকে ঝুঁকে পড়লো রেডিও অপারেটর। ‘হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো—লিবার্টি-থ্রু অপারেটর বলছি।’ কয়েক সেকেন্ড শুনলো সে, তারপর কর্নেলকে বললো, ‘কোকুনের ক্যাপটেন জোনাথ ভেনসম।’

অপারেটরের হাত থেকে মাইক্রোফোনটা ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিলেন কর্নেল। ‘ক্যাপটেন ভেনসম?’

জবাব এলো, ‘বলছি, অনারেবল ডিরেক্টর।’

‘তোমার পজিশন কি?’ জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল। রানার ইঙ্গিতে পজিশন লিখে নেয়ার জন্যে তৈরি হলো অপারেটর। ফিফটি-এইট পরেন্ট থ্রু ফোর সাউথ, থারটি-ফোর পরেন্ট ফাইভ সিঙ্গে ওয়েস্ট। মনে মনে দ্রুত একটা হিসাব কষলো রানা।

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকালেন কর্নেল। ‘আমাদের প্রায়



চল্লিশ মাইল পশ্চিমে,' বললো রানা। মাথা ঝাকালেন কর্নেল, এবার ভেনসমের সাথে আলাপ চালিয়ে গেলেন নরওয়ের আঞ্চলিক ভাষায়। ভালো করে শুনলো না রানা, চোখের পাতা ধরে রাখতে পারছে না ও। কেবিনের দেয়ালে হেলান দিলো ও, মাথাটা পিছন দিকে কাত হয়ে পড়লো।

তারপর হঠাৎ চোখ মেলে বুঝতে পারলো রানা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল ও। রেডিও থেকে নতুন একটা গলা ভেসে আসছে, ভাষাটা ইংরেজি। 'তদন্তের আয়োজন না করা হলে ওরা কর্মবিরতির হুমকি দিচ্ছে। আমি বলে দিয়েছি, মালিক পক্ষকে কোনো ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না। তদন্ত মানে শুধু শুধু সময় নষ্ট। তাছাড়া, তদন্ত করার আছেটাই বা কি? বোনার পাইটন চলে গেছেন, তাঁর চলে যাবার সময় হয়েছিল, বাস। আসল সমস্যা হলো, আমরা তিমির দেখা পাচ্ছি না।' মাজিত, পরিশীলিত কণ্ঠস্বর, গলার আওয়াজ দামী গাড়ির মতোই সাবলীল, যদিও আওয়াজটা ব্যক্তির কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে না। 'এমনকি স্যাটেলাইটের লোকজনও মুখ হাঁড়ি করে আছে। আর টনসবার্গ লোকদের কথা কি বলবো, রীতিমতো বেয়াড়া হয়ে উঠেছে ওরা। তুমি আসছো, তা না হলে ওদের সবাইকে আমি ফেরত পাঠাতাম।'

'এ-সব নিয়ে সাক্ষাতে কথা হবে, মার্ক,' বললেন কর্নেল ওয়াকার, রাগ চেপে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন তিনি। 'তিনি ক'টা মেরেছো তাই বলা।'

'কিন তিনি? একশো সাতাশটা, মাত্র। এইমাত্র কুয়াশা কটিতে শুরু করেছে। ভাগ্য বদলাতেও পারে। তবে আমাদের দক্ষিণ-পূবে প্যাক আইস রয়েছে, কেউ সেটাকে ভালো চোখে দেখছে না।'

যাত্রা অন্তত-১

‘এ-সব আমি জানি,’ কর্নেল বললেন। ‘তোমার প্ল্যান কি?’

‘প্যাঙ্কের উত্তর কিনারা ধরে পূর্ব দিকে যাচ্ছি আমরা।’ দেখা দাঁড়  
কি পাওয়া যায়।’

‘দেখা যাচ্ কি পাওয়া যায়!’ কর্নেলের চিবুক কৈপে উঠলো।  
‘আহাঙ্কের বহর নিয়ে বেরিয়ে তোমাকে তিমি ধরতে হবে, তাগো  
ওপর ভরসা করলে চলবে না। যেভাবে পারো তিমি খুঁজে পের দর  
কি বলছি বুঝতে পারছো? তিমি ছাড়া একটা দিন মানে লালবাতি  
ঝালার দিকে আরেকটু এগোলো কোম্পানী।’

‘বাহ, তুমি আমার ওপর চোটপাট দেখাচ্ছে। কেন? তুমি তে  
আসছোই, নিজে এবার চেষ্টা করে দেখো না।’

কর্নেল শুরু করলেন, ‘পাইটন বেঁচে থাকলে...।’

‘পাইটন পাইটন করো না তো,’ ছেলেও এবার খেপে উঠলো।  
‘তার কথা শুনতে শুনতে কান ছটো পচে যাচ্ছে আমার। বোনার  
পাইটন কি জাহ্ন জানতেন, নাকি সমুদ্রের দেবতা ছিলেন তিনি।  
তার কথা তুলে কি লাভ, তাণ্ডে কি তিমি পাওয়া যাবে?’

‘তোমার সাথে সাক্ষাতে কথা হবে,’ শান্তকণ্ঠে বললেন কর্নেল।  
‘ভেনসমকে দাও।’ ক্যাপটেনের সাথে নরওয়ের ভাষার কথা বললেন  
তিনি। হঠাৎ চুপ করে গেল ভেনসম।

খানিক পর তার চিৎকার ভেসে এলো। হঠাৎ হাসতে শুরু করলেন  
কর্নেল ওয়াকার। কেবিনে উপস্থিত সবাই তাঁর সাথে হাসতে লাগলো।  
মারিকার দিকে তাকালো রানা। ওর দিকে ঝুঁকলো সে, সে-ও উত্তে  
জিত হয়ে পড়েছে। ‘ফ্যান্টরি শিপ থেকে ওরা তিমি দেখতে পেয়েছে।  
অনেকগুলো পড। তিমিগুলো দলবেঁধে দক্ষিণে যাচ্ছে—বরফের  
ভেতর। একেকটা পডে চার থেকে পাঁচটা ফিন তিমি থাকতে পারে;

নীল তিমি হলে তুমি একটার বেশি আশা করতে পারো না। তবে ওগুলোর বরফের দিকে যাওয়াটা শুভ লক্ষণ নয়।’

ত্রিজে ফিরে এসে নতুন কোর্স সেট করলো রানা, তারপর গত আটদিনে এই প্রথম পুরো চার ঘণ্টা ঘুমোবার ইচ্ছে নিয়ে নেমে এলো নিম্নের কেবিনে। চার ঘণ্টা পেরোলো না, তার আগেই মেনবয়ের ডাকে ঘুম ডাঙলো ওর। ত্রিজে উঠে এলো ও, ওকে দেখেই কক্সন নিশব্দে হেসে জিজ্ঞেস করলো, ‘কোনো গন্ধ পাচ্ছেন, ক্যাপটেন? বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, ওটা টাকার গন্ধ। তিমি।’

বাতাসে উৎকট একটা গন্ধ মই বেয়ে ওঠার সময়ই পেয়েছে রানা। ‘কোকুন থেকে?’ জিজ্ঞেস করলো ও। উত্তরে মাথা ঝাঁকালো কক্সন।

‘কতো দূরে?’

‘পনেরো কিংবা বিশ মাইল!’

আতকে ওঠার ভান করলো রানা, ‘ক্যান্টরি শিপে তাহলে কি অবস্থা!’

এক ঘণ্টা পর কুয়াশা হালকা হতে শুরু করলো, ফুল স্পীড-এর অর্ডার দিলো রানা। আকাশের নিচের দিকে মেঘ রয়েছে, সাগরের রঙ সবুজাভ বরফের মতো। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এই প্রথম বরফের ছাতি দেখতে পেলো রানা। কাছাকাছি প্যাক আইস থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে আলো, প্যাক আইসের সারফেস মেঘের গায়ে ছাপ ফেলেছে। সাদা রঙের উজ্জ্বল বিস্তৃতি, গায়ে অসংখ্য কালো কালো রেখা। রেখাগুলো ভাসমান বরফস্তরের মাঝখানে সরু সরু পানি পথ। মেঘগুলো যেন আয়না, নিচের প্রতিটি জিনিস নিখুঁতভাবে এঁকে নিয়েছে গায়ে।

ক্যামেরা হাতে ত্রিজে উঠে এলো কাইসু ওকোমো। ‘কর্নেল বলছেন, আমরা নাকি আরো দক্ষিণে, ওয়েডেল সী-তে যাবো। দারুণ যাত্রা অশুভ-১

হবে, কি বলেন? সাধারণ উইণ্ডের ক্যাপটেন সোলেংসেনের হান নাকি বোনার পাইটনের পরেই, সে যখন তার জাহাজকে নিয়ে ওদিকে গেছে, আমরা কেন বসে থাকি? ওয়েডেল সী-তে ডালে চবি ভোলার সুযোগ পাবো বলে আশা করা যায়।’

দশ মিনিট পর মাস্তুলের মাথা থেকে লুকআউট ঘোষণা করলো, ‘জাহাজ দেখা যায়।’ আরো দশ মিনিট পর স্টারবোর্ড বো-র দিকে খানিকটা ধোঁয়া দেখতে পেলো ওরা। কর্নেল ওয়াকার, মারিকা, হেল-মুট বার্গার—সবাই উঠে এলো ব্রিজে। কেউ কারো চেয়ে কম উত্তেজিত নয়। সবার শেষে এলো নিক শেডি, সবার কাছ থেকে খানিক দূরে একা দাঁড়ালো সে, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো ধোঁয়াটার দিকে। কি যেন ভাবছে লোকটা, চোরা চোখে বারবার কর্নেলের দিকে তাকাচ্ছে। তার হাবভাব লক্ষ্য করে মনে মনে শংকিত হলো রানা। ঠিক তখনই ওর দিকে তাকালো মারিকা, ওর দৃষ্টি আর মুখের ভাব লক্ষ্য করে ঝট করে ফিরলো শেডির দিকে। মারিকা টের পেলো, শেডিকে নিয়ে ছুশ্চিন্তায় পড়েছে রানা।

এরপর ওয়ায়েরলেস রুমে চলে গেলেন কর্নেল, সবাই তাঁকে অহু-সরণ করলো। গেল না শুধু একজন, নিক শেডি। হুঁহাতে শক্ত করে উইণ্ডব্রেকার ধরে দক্ষিণ দিকে, বরফের সাদাটে উজ্জলতার দিকে তাকিয়ে থাকলো সে। অবাক চোখে তাকে লক্ষ্য করছে রানা। আবার ফ্যাক্টরি শিপের দিকে তাকালো নিক শেডি, তারপর মুখ তুললো মেঘের দিকে। কয়েক সেকেন্ড পর ঝট করে ঘুরলো সে, বললো, ‘বাই, রিপোর্টটা তৈরি করে ফেলি।’ ব্রিজ থেকে বেরিয়ে যাবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকালো সে, তার ঠোঁটে অদ্ভুত রহস্যময় এক চিলতে হাসি ফুটে থাকতে দেখলো রানা।

# পাঁচ

চোখে বিনো কিউলার তুললো রানা। দেখার মতোই একটা দৃশ্য বটে। শুধু ফ্যাক্টরি শিপ কোকুন নয়, জাহাজের বড় একটা বহর। কোকুনের পিছনে এক লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাঁচটা ক্যাচার। আরেকটা ক্যাচার প্রায় পাশে। ছোটো টোইং জাহাজ দেখলো রানা। মাল্টিভাল আমলের আরো ছোটো ক্যাচারকে চিনতে পারলো ও, আগেই শুনেছে ওগুলো বয়্য বোট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এগুলোর পিছনে রয়েছে পুরনো একটা হোয়েলিং শিপ, তিমির মাংস রেফ্রিজারেটর শিপে বয়ে নিয়ে যায়, ওটা ছ'হাজার টনী। কাছাকাছি রয়েছে বড় একটা ট্যাংকার। অন্যান্য ক্যাচারগুলোকে দিগন্তরেখার কাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা গেল।

রানার একটা হাত খামচে ধরে পোট বো-র দিকে ইঙ্গিত করলো কাইসু ওকোমো। জলকণা আর বাষ্পের একটা বর্না সাগরের বুকে মাথাচাড়া দিলো, ওদের কাছ থেকে দুই কেবল দূরেও নয়। ওখানটায় সাগর টগবগ করে ফুটতে শুরু করলো, তারপর মসৃণ ও পিচ্ছিল একটা আকৃতি, সাবমেরিনের মতো, পিঠ তুললো পানির ওপর। আরো

একটা বর্না মাথাচাড়া দিলো জাহাজের একেবারে কাছাকাছি, বর্নার চূড়া দশ ফুট উচু হলো, বাতাসের সাথে ওদের ডেকে এসে ছড়িয়ে পড়লো কিছু জলকণা। ক্যামেরার দিকে ডাইভ দিলো কাইসু ওকোমো। একটা পড-এর মাথখানে চলে এসেছে ওরা। এই প্রথম ওরা তিমি দেখতে পেল।

বিশাল এক বৃত্ত রচনা করে পিছন দিক থেকে ফ্যাক্টরি শিপের পাশে চলে এলো লিবাটি-থি। তীব্র গন্ধে বমি পেলো রানার। ফ্যাক্টরি শিপের স্টার্ন খোলা অবস্থায় রয়েছে, যেন হাঁ করে আছে প্রকাণ্ড একটা ওহামুথ। মুখের ভেতর দিয়ে একটা তিমিকে টেনে তোলা হচ্ছে, নিয়ে যাওয়া হবে আফটার-প্ল্যান-এ। জাহাজটা বিরাট, প্রায় বিশ হাজার টনী। ত্রিজে একজন লোককে দেখা গেল, মাথায় ফার ক্যাপ, হাতে মেগাফোন। নিজের ভাষায় কি যেন বললো সে।

রানার পাশ থেকে মারিকা জানালো, 'ক্যাপটেন জোনাস ভেনসম। বোট নামিয়ে উনি নিজেই আসছেন।' তার চেহারায় বিশ্বয় ফুটে উঠলো। 'কারণটা কি?'

কর্নেলের দিকে তাকালো রানা, ত্রিজের পোর্ট সাইডে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। চেহারা কালো মেঘের মতো থমথমে।

ক্যাপটেন ভেনসম যখন এলো, ত্রিজে শুধু ওরা তিনজন রয়েছে। অস্বাভাবিক চওড়া হাড় নিয়ে লোকটার কাঠামো চৌকো আকৃতির, সারাক্ষণ ঠোঁটের কোণে একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি নিয়ে দাঁত দিয়ে কামড়ানো তার অভ্যাস। 'কি ব্যাপার?' ত্রিজের ভেতর যেন বহু-পাত হলো, রক্তচক্ষু মেলে জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল। 'কোথায় কি অসুবিধে? সব ক'টা ক্যাচার বেরিয়ে যায়নি কেন?'

চট করে চারদিকে তাকিয়ে ভেনসম বললো, 'আমি ইংরেজিতে

বলবো।’ লক্ষ্য করেছে, হেলমসম্যান ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।  
‘অসুবিধে হলো, টনসবার্গের লোকেরা হাত ওটিয়ে রেখেছে। স্বাস্থ্য-  
জের প্রায় অর্ধেক লোক। পাঁচটা ক্যাচার আর একটা টোইং বোটের  
জুরাও কাজ করতে রাজি নয়। হুমকি দিয়েছে, তাদের দাবি মানা-না  
হলে অন্যদের কাছে বাধা দেবে তারা।’

অকস্মাৎ শান্ত হয়ে গেলেন কর্নেল। ‘আমি কি করি দেখার জন্যে  
অপেক্ষা করছে ওরা, নাকি?’

মাথা ঝাঁকালো জোনাথান ভেনসম।

হঠাৎ আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কর্নেল। ব্রিজ রেইলের ওপর  
ঘুসি মারলেন তিনি। ‘ছ’হুগা কাজ করে একশো সোয়াশোর বেশি  
তিমি মারতে পারোনি!’ চিৎকার করে বললেন। ‘আর যে-ই তিমির  
খোঁজ পাওয়া গেল অমনি বলছো, ওরা ধর্মঘট করেছে! কেন? কি  
তাদের অভিযোগ?’

‘ওরা বলছে বোনার পাইটনের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। তদন্ত হতে  
হবে।’ ইতস্তত করলো ভেনসম, তারপর বললো, ‘ওদের আরেকটা  
দাবি, অ্যাকটিং ম্যানেজারের পদ থেকে আপনার ছেলেকে সরিয়ে  
নিতে হবে।’

‘কে, ওদেরকে নাচাচ্ছে কে? পেছন থেকে নিশ্চয়ই কেউ একজন  
কলকাঠি নাড়ছে।’

‘ক্যাপটেন সার্ভিক, আমার ধারণা। সবার মুখপাত্র হয়ে সে-ই কথা  
বলছে। তবে তদন্ত অসুষ্ঠানের দাবি সবার—সার্ভিক, বডলার, মাই-  
কেলসেন, ফেডম্যান, পিটারসেন, কেউ বাদ নেই।’

চোখ থেকে চশমা খুলে ক্রমাল দিয়ে কাঁচ ছুটো মুছলেন কর্নেল।  
থরথর করে কাঁপছেন তিনি। অনেকক্ষণ পর মুখ তুলে জিজ্ঞেস কর-  
যাত্রা অশুভ-১

লেন, 'আমার ছেলের বদলে কারেক ওরা অ্যাকটিং ম্যানেজার হিসেবে  
পেতে চায় ?'

'ক্যাপটেন পিটারসেনকে,' বললো ভেনসম। 'মিডার হিসেবে  
ভালো সে। তিনবার সাউথ আফ্রিকায় আসা হয়েছে তার।'

'ঠিক আছে, ক্যাপটেন ভেনসম। পাঁচটা ক্যাচার আর টোইং  
শিপের ক্যাপটেনদের জানাও, আমি ওদের সাথে বসতে চাই। আমি  
নিজে সিদ্ধান্ত দেবো। ওদেরকে, হয় তারা কাজ শুরু করবে তা না হলে  
সব ক'টাকে আমি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবো।'

'ওরা সম্ভবত আসতে রাজি হবে না, স্যার।'

'ওড গড, ম্যান। পরিস্থিতি যদি এভাবে নাগালের বাইরে চলে  
যেতে থাকে, সামলানোর আরো অনেক উপায় আছে, তুমি বোঝো  
না ? ফ্যাক্টরি শিপ থেকে কুয়েল আর সাপ্লাই না পেলে অ্যান্টার্ক-  
টিকায় ওরা টিকবে কিভাবে ? শক্ত হও, ভেনসম। ওরা যদি কোনো  
শর্ত দিতে চায়, জানিয়ে দাও আমাদের। খোঁচানোর পরিণতি ভালো  
হবে না।' রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'মিঃ রানা, কক্সনকে দায়িত্ব  
দিয়ে আপনি আমার সাথে ফ্যাক্টরি শিপে আসছেন।' হঠাৎ হাস-  
লেন তিনি। 'অ্যান্টার্কটিকায় এসেই যখন পড়েছেন, একটা ক্যাচারের  
কমান্ড গ্রহণ করতে অসুবিধে কি ?'

মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছিলো ক্যাপটেন ভেনসম, তাকে বাধা  
দিলেন তিনি। 'মার্ক নিজে কেন রিপোর্ট করতে আসেনি ?'

ফ্যাক্টরি শিপের স্কিপার ইতস্তত করে বললো, 'মার্ক ফোর-প্ল্যান-এ  
রয়েছে। তার আসার উপায় নেই।'

'হুম,' বললেন কর্নেল। 'সাথে লোকজন আছে তো ?'

মার্ক রোসেটের অন্য খানিকটা সহানুভূতি হলো রানার। লোক-



তার চরিত্র যা-ই হোক, কাছটা তাকে দেয়া হয়েছে অত্যন্ত কঠিন।  
মারিকা কি ভাবছে বোঝার জন্যে ঘাড় ফেরালো ও, দেখলো মুখ  
ভুলে ক্যান্ট্রি শিপের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে সে, আর কোনো  
দিকে খেয়াল নেই। রানা বুঝলো, মারিকা তার বাপের কথা ভাবছে।

টনসবার্গ ক্যাপটেনদের সাথে কর্নেলের বৈঠকে উপস্থিত থাকলো না  
রানা, তবে চলে যাবার সময় লোকগুলোকে দেখলো ও। তাদের হাব-  
ভাব দেখে মনে হলো, কর্নেল যাই বলে থাকুন, চিন্তিত হয়ে পড়েছে  
তারা। শক্ত-সমর্থ কঠিন, রুক্ষ চেহারার পাঁচজন লোক, মাথায় ফার  
ক্যাপ, সবারই দাড়ি আছে, পরনে উইণ্ডব্রেকারের নিচে মোটা জাসি,  
পায়ে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা বুট। গ্যাংওয়ের মাথায় থামলো তারা, নিজেদের  
মধ্যে চাপা স্বরে কথা বলছে। একটু পরই তাদের সাথে আরো দু'জন  
লোক যোগ দিলো। একজন একটু খাটো, তবে চওড়া, সীল মাহের  
মতো নাছুরছুর। অপর লোকটার মুখে কয়েকটা কাটা দাগ, ফলে  
সে-সব জায়গায় দাড়ি গজায়নি। খানিকক্ষণ বাকি সবার কাছ থেকে  
সরে দাড়িয়ে নিচু স্বরে কথা বললো নিজেদের মধ্যে। ওদেরকে পাশ  
কাটাবার সময় রানা গুনতে পেলো, একজন অপরজনকে 'ক্যাপটেন  
সাবিক' বলে সম্বোধন করলো। তারপর ওরা দু'জন বাকি লোক-  
দের সাথে মিলিত হলো।

ক্যাপটেন ভেনসমের একজন অফিসারকে নিয়ে জাহাজটা ঘুরে  
দেখতে বেরিয়েছে রানা। ইতোমধ্যে সেকেণ্ড অফিসারের কেবিনে ওর  
খাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রথমেই ওকে ফ্রেনসিং ডেকে নিয়ে এলো অফিসার। ফ্রেনসিং ডেক  
ছোটো, ফোর-প্ল্যান আর আফটার প্ল্যান। লোকজন এখানে হাঁটু সমান  
যাত্রা অন্তঃ-১

উঁচু তিমির নাড়িভূঁড়ির ভেতর হাঁটাচলা করছে, প্রত্যেকের হাতে লম্বা হাতল লাগানো বাঁকা ছুরি, চবির পর্দা সরাবার পর বেদিয়ে আসা রক্তাক্ত মাংস কাটছে তিমির ভেতর থেকে। যন্ত্রচালিত করাতগুলো তিমির মেরুদণ্ড কাটছে। চারদিকে সচল রয়েছে অনেকগুলো উইঞ্চ। আরেক দল লোক প্রকাণ্ড লোহার হুক দিয়ে চবি আর মাংস সরানোর কাজে ব্যস্ত। শব্দগঞ্জনা আর ভূর্গন্ধ, কোনোটাই সহ্য করার মতো নয়। সচল ছোটো ছোটো গাড়ির ওপর তোলা হচ্ছে মাংস, হাড় আর চবি, সব গিয়ে পড়ছে বয়লারে। ওখান থেকেই মহামূল্য তিমির তেল পাওয়া যাবে। একের পর এক তিমি আসছে, দানবীয় শক্তির পরীক্ষা দিয়ে অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছে লোকগুলো, তাজা রক্তে পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে ডেক।

একটা সদ্য ধরা তিমিকে অনুসরণ করলো রানা। আশি ফুট লম্বা হবে ওটা, প্রায় একশো টন ওজন।

আহা! ওটা ঘুরে দেখা শেষ করে ডেকে উঠে এলো রানা, ইতোমধ্যে আগের সেই পাঁচটা ক্যাটার তিমির খোঁজে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। একটা টোইং শিপকে আসতে দেখলো ও, পাঁচটা তিমিকে টেনে আনছে।

এক ঝাঁক তিমির মাঝখানে রয়েছে বহরটা, কাজেই দম ফেলার খুঁসত নেই কারো। চারদিক থেকে হারপুন গানের ভোঁতা আওয়াজ ভেসে আসছে। ডেকে বেশিক্ষণ টেকা গেল না, নাক চেপে নিজের কেবিনে ফিরে এলো রানা। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে পেট থেকে উগরে দিলো সব। ধপাস করে বাকের ওপর পড়লো ও, ক্লান্ত শরীর নেতিয়ে পড়লো গভীর ঘুমে।

ঘুম ভাঙলো সেকেণ্ড অফিসার পেরেট-এর ডাকে। রানার ভয়ের

কিছু নেই, সে জানালো, কারণ তিমিরা সব দলবেঁধে দক্ষিণে চলে গেছে। তার ধারণা, সাদার্ন উইণ্ডের মতো কোকুনও দক্ষিণে যাবে। দক্ষিণে মানে প্যাক আইসের ভেতর। রানার জন্যে এক বোতল হুইস্কি নিয়ে এসেছে সে। ‘ফ্যাক্টরি শিপে সুস্থ থাকতে হলে খানিক পর পর হু’এক ঢোক খেতেই হবে আপনাকে,’ পরামর্শ দিলো সে।

কাপড় পাণ্টে অফিসার্স মেসে চলে এলো রানা। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। বেশিরভাগ লোকের দাড়ি আছে। কেউ কারো সাথে কথা বলছে না। থমথমে একটা ভাব বেশ টের পাওয়া গেল। আড়চোখে অনেকেই কর্নেল ওয়াকারের দিকে তাকাচ্ছে। মারিকাকে নিয়ে টেবিলের একধারে বসেছেন তিনি, তাঁর আরেক পাশে বসেছে ক্যাপটেন ভেনসন। চামচ দিয়ে সুপে ঢেউ তুলছে মারিকা, চোখে শূন্যদৃষ্টি, যেন আর সবার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন নয়। মারিকার আরেক পাশে বসা লোকটা কি যেন বললো, গ্রাহ্য করলো না মারিকা।

‘মার্ক রোসেট কে?’ পাশের সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

রানা যাকে সন্দেহ করেছিল, সে-ই। মারিকার পাশে বসে আছে। লোকটা লম্বা, শক্ত-সমর্থ, তবে বাপের চেহারা পায়নি। মাথাটা গোল, গলাটা ছোটো আর মোটা। তার চেহারায় নির্ভুরতার কোনো ছাপ খুঁজে পেলো না রানা। চোয়াল সরু, চেহারায় দৃঢ়তার কোনো ভাবও নেই। লম্বাটে চোখ, খানিকটা মেয়েলি, শুধু সেখানেই জেদের একটা ভাব ফুটে আছে।

হু’জনের প্রায় কিছুই খাওয়া হলো না। মারিকার খেতে না পারার কারণ যা-ই হোক, রানা খেতে পারলো না পরিবেশিত সমস্ত খাবারই তিমির মাংস বলে। শিকারের মোহুমে জু আর অফিসাররা নাকি আর কিছু খেতে চায় না, তিমির মাংস তাদের এতোই প্রিয়। রানার খেতে যাত্রা অন্ত-১

না পারার কারণটা বুঝতে পেরে হাসাহাসি করলো অনেকে । শুধু এই সময় একবার চোখ তুলে রানার দিকে তাকালো মারিকা । চোখাচোখি হলো, রানাকে যেন নীরবে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো মেয়েটা ।

খাওয়ার পাল্লা শেষ হতে ক্যাপটেন ভেনসম নিজের কেবিনে আমন্ত্রণ জানালো রানাকে । রাসে হুইস্কি ঢাললো সে, এটা-সেটা নিয়ে কিছু কথা হলো দু'জনের মধ্যে, তারপর প্রসঙ্গটা তুললো রানা । জোনাস ভেনসম সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করলো ।

‘হ্যাঁ, বোনার পাইটনের মৃত্যু একটা রহস্যই বটে । এ-বিষয়ে যতো কম কথা বলা যায় ততোই ভালো ।’

‘মার্ক রোসেট সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ?’ ইচ্ছে করেই সরাসরি জিজ্ঞেস করলো রানা, যাতে রাগ হওয়ার উত্তরটা এড়িয়ে যেতে না পারে ভেনসম ।

‘ঠিক কি বলতে চান আপনি ?’ ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকালো ক্যাপটেন ।

‘গুনলাম টনসবার্গের লোকজনকে খেপিয়ে তুলেছে সে ।’

‘বরং উন্টেটা সত্যি । সব মিটমাট করার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে ও । হ্যাঁ, তার বয়স কম, সে অনভিজ্ঞ । কিন্তু এ-সব তো তার দোষ নয় । শেখার জন্যে তাকে সময় দিতে হবে তো । টনসবার্গের লোকজন তার ওপর খেপে আছে, কিন্তু তার ওপর সন্তুষ্ট এমন লোকেরও অভাব নেই ।’

‘বোনার পাইটনের সাথে তার বনিবনা হচ্ছিলো না, এ-কথা সত্যি ?’

‘আপনি কর্নেলকে পাঠানো মেসেজটা দেখেছেন, তাই না ?’

জিঞ্জের করলো ভেনসম। মাথা ঝাঁকালো রানা। 'কি জানেন, বোনার পাইটনের সাথে মানিয়ে চলা সহজ কথা নয়। আমি বলছি না যে লিডার হিসেবে তিনি ভালো ছিলেন না। তবে তিনি আশা করতেন সবাই তাঁর নির্দেশ বিনাতর্কে মেনে নেবে। ক্যাপটেনদের জন্যে ব্যাপারটা ঠিকই ছিলো, তারা কাজ নোবো, চিন্তা করে না। কিন্তু এ-ধরনের মানসিকতা একটা ফ্যাক্টরি শিপের দৈনন্দিন কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।'

'এর মধ্যে আরো অনেক ব্যাপার আছে, সামান্য অবনিবনার কারণে বোনার পাইটন পদত্যাগের ছমকি দেননি,' মন্তব্য করলো রানা।

অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এলো কেবিনের ভেতর। খুক করে কেশে এক সময় ভেনসম বললো, 'আপনি যদি কিছু মনে না করেন, এ-বিষয় আপনার সাথে আমি আলোচনা করতে আগ্রহী নই। আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন, সব কোম্পানীতেই পলিটিক্স আছে। জড়িয়ে না পড়াই ভালো।'

'আপনি বোধহয় স্যাণ্ডেফিওর্ড থেকে এসেছেন, ক্যাপটেন?' জানতে চাইলো রানা।

রানার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ একটু হাসলো ভেনসম। 'আমি থ্রি শিচ-য়ান ল্যাণ্ডের ছেলে। টনসবার্গের ক্যাপটেন অবসর নেয়ার দায়িত্বটা দেয়া হয়েছে আমাকে।'

এরপর আর আলাপ জমলো না। নিজের কেবিনে ফিরে এসে রানা দেখলো, ওর টেবিলে এক প্লেট খাবার রয়েছে, সাথে একটা চিরকুট। মারিকা লিখেছে, 'তাড়াহুড়োর মধ্যে বেশি কিছু পাঠাতে পারলাম না। রুটি, মাখন, জেলি আর সেন্ড ভিমের একটা কণাও যেন

পড়ে না থাকে।’

একটা কথাও ফেলে রাখলো না রানা। খেতে খেতেই ঘুম পেয়ে গেল ওর, যেন ড্রাগস খেয়েছে।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে বসে রানা আবিষ্কার করলো, সব ক’টা পদই তিমির মাংস দিয়ে তৈরি, তবে ওর জন্যে আলাদা নাস্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খানিক পর ওকে জানানো হলো, কর্নেল ওয়ার্ডার ওকে তাঁর কেবিনে ডেকেছেন। ডেকে বেরিয়ে এসে ঝড়ো বাতাসের সামনে পড়লো ও, দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে আসছে। মেঘগুলো খুব নিচ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, ওগুলোর চেহারাও তেমন সুবিধের মনে হলো না। সন্দেহ নেই, আবার একটা দুর্ঘটনা আসছে। দক্ষিণে যতোদূর দৃষ্টি যায় প্যাক আইসের সাদা উজ্জলতা, বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। রানার মনে হলো, চাঁদ উঠতে পারে। ক্যাচার-গুলো ছড়িয়ে আছে, সম্ভবত তিমির খোঁজে। ক্যান্ট্রি শিপ প্রায় নিশ্চকই বলা যায়, তিমি নেই তো ব্যস্ততাও নেই।

জোনাস ডেনসম আর মার্ক রোসেটকে দেখলো রানা কর্নেল রোসেটের কেবিনে। একটা সুইভেল চেয়ারে বসে আছেন কর্নেল, কনুই দুটো ডেকে। নিশ্চল, রান চেহারা। চশমার কাঁচ মুছেছেন। ‘মি রানা, আসুন, আমার ছেলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই—মার্ক, ওর কথাই বলছিলাম তোমাকে। কমান্ডার মানুদ রানা।’

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো মার্ক রোসেট, কেতাহরস্ত ভঙ্গিতে হ্যাণ্ডশেক করলো রানার সাথে। ‘আমাদের মধ্যে আপনাকে পেয়ে আমরা খুশি, মি: রানা,’ বললো সে, হাবভাব বদ্ধপূর্ণ। ‘বাবার ধারণা, আপনি অত্যন্ত দক্ষ একজন নাবিক।’

‘তা যদি হয়, কৃতিত্বটা হুমায়,’ শ্রিত হেসে বললো রানা। লোক-

তার সম্পর্কে বিরাগ ধারণা ছিলো, এরইমধ্যে তা বদলাতে শুরু করেছে। প্রায় সুদর্শনই বলা চলে মার্ক রোসেটকে, অত্যন্ত বিনয়ী এবং ভদ্র। রানার সাথে স্বাভাবিক আচরণ করছে সে। বাপের মতো শক্তিশালী না হলেও, বোঝা যায় আত্মবিশ্বাসে কোনো ঘাটতি নেই।

নিজের চেয়ারে ঘুরে রানার দিকে ফিরলেন কর্নেল। ‘মিঃ রানা, বলুন।’ রানা তাঁর মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসলো। কর্নেল ওকে সিগারেট অফার করলেন। ‘আমাদের এখানে একটা সমস্যা হয়েছে, আপনি জানেন। ব্যাপারটার সাথে আপনার কোনোভাবে জড়িত হওয়ার কথা নয়, তবে আমি চাইছি আপনি একটা ভূমিকা পালন করুন। আমার তরফ থেকে আপনার প্রতি এটা একটা অনুরোধ।’

কর্নেলের নরম স্বর লক্ষ্য করে মনে মনে সতর্ক হয়ে উঠলো রানা। সম্ভবত অপ্রীতিকর কোনও দায়িত্ব ওর কাঁধে চাপাতে চাইছেন তিনি, অন্যায় যদি না-ও হয়। ‘বলুন।’

‘পাইটনের মৃত্যু একটা দুর্ঘটনা, কিন্তু টনসবার্গের লোকজন তা মানতে রাজি নয়। তারা তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্যে জেদ ধরেছে। এদিকে তিমিরা সব চলে গেছে দক্ষিণে, মৌসুমটা নিষ্ফল হতে চলেছে। এ অবস্থায় তদন্ত অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। অনেক ভেবেচিন্তে আমি দেখলাম, গোটা বছরে মাত্র একজনই আছে যে টনসবার্গের লোকদের বুঝিয়ে-বুনিয়ে শাস্ত করতে পারে।’

‘মারিকার,’ অফুটকণ্ঠে বললো রানা, বুঝতে পারলো শুধু অপ্রীতিকর নয়, অন্যায় একটা কাজ চাপাতে চাইছেন কর্নেল ওর ঘাড়।

‘হ্যাঁ। আমি লক্ষ্য করেছি, মারিকার সাথে আপনার সম্পর্ক বহুদূর মতো।’ সরাসরি রানার চোখে তাকিয়ে আছেন কর্নেল। ‘আমার অনুরোধ, আপনি তাকে বোঝান, সে যেন টনসবার্গের লোকদের তদ-

স্তের দাবি ফিরিয়ে নিতে বলে ।’

‘কাজটা অন্যায় হবে,’ স্পষ্ট করে, দৃঢ়তার সাথে বললো রানা।  
‘তাছাড়া, কাকে আপনি অনুরোধ করতে বলছেন ? মারিকার বানার  
মৃত্যুরহস্য নিয়ে কথা বলছি আমরা, তাকে এ-ধরনের একটা অনুরোধ  
করা আর তার বাপের সাথে বেঙ্গমানী করতে বলা কি এক কথা হয়ে  
যাবে না ?’

কেবিনের ভেতর জমাট বাঁধলো নিস্তরুতা । চেয়ার ছেড়ে পায়চারি  
শুরু করলেন কর্নেল । আবার রানাই নিস্তরুতা ভাঙলো, ‘তারচেয়ে,  
সহজ পথটা কেন আপনি বেছে নিচ্ছেন না ? জাহাজে মৃত্যু সম্পর্কে  
তদন্ত নতুন কিছু নয়, বরং এটাই নিয়ম । তদন্তের রিপোর্ট সংরক্ষণ  
করা হবে, বন্দরে জাহাজ ভেড়ার পর পুলিশের হাতে তুলে দেয়া  
যাবে ।’

‘কিন্তু...,’ শুরু করলো মার্ক রোসেট ।

‘তুমি থামো ।’ তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন কর্নেল । ‘মিঃ  
রানার কথায় যুক্তি আছে । সত্যি কথা বলতে কি, মারিকাকে আমি  
বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম, সে আমার প্রস্তাবে রাজি হয়নি । সে-ও  
চায় তদন্ত হোক ।’ আবার পায়চারি শুরু করলেন তিনি । ‘টনসবার্গের  
লোকদের ধারণা, পাইটনের মৃত্যুর সাথে আমার ছেলের কোনো সম্পর্ক  
থাকতে পারে । সম্পর্ক আছে কি নেই সে-ব্যাপারে আমি উদ্বিগ্ন নই,  
আমি চিন্তিত তিমি নিয়ে । তদন্ত যদি অনুষ্ঠিত হয়, কমিটিতে আমার  
বা মার্কের থাকা হবে না । কমিটিতে তিনজন থাকা চাই—আপনি কি  
কমিটির একজন সদস্য হতে রাজি হবেন, মিঃ রানা ?’

এক সেকেণ্ড চিন্তা করে রানা জবাব দিলো, ‘কমিটিতে আর কে কে  
থাকবে তার ওপর নির্ভর করছে ।’



‘ভদ্র হবে, টেনসবার্গ-ক্যাপটেনদের এ-কথা আমি জানিয়েছি।  
তবু একবার চেষ্টা করে দেখছিলাম, ওদেরকে অন্য কোনোভাবে শাস্ত  
করা যায় কিনা। ওরা শর্ত দিয়েছে, কমিটিতে মারিকাকে রাখতে  
হবে।’ রানার দিকে সরাসরি তাকিয়ে ঠোট বাঁকা করে হাসলেন  
তিনি। ‘আপনিও কি সে-ধরনের কোনো শর্ত দিতে চাইছেন, মিঃ  
রানা ?’

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো রানা, তারপর বললো, ‘অফিসারদের কাউ-  
কেই আমি ভালো করে চিনি না, কর্নেল। ইয়া, কমিটিতে মারিকা না  
থাকলে আমিও থাকতে চাই না।’

‘বেশ, তাই হবে। আপনি কমিটির চেয়ারম্যান, মারিকা আর  
ক্যাপটেন ভেনসম সদস্য।’

এই সময় নক হলো দরজায়, ভেতরে ঢুকলো ডঃ নিক শেডি। তার  
হাতে একগাদা কাগজ রয়েছে। ছুই চোখে অদ্ভুত উত্তেজনা। ‘এই যে,  
শেডি, এসো-এসো। তোমার রিপোর্ট তাহলে শেষ হয়েছে ?’

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো নিক শেডি, বেকাস কিছু বলে ফেলার ভয়ে  
মুখ খুলতে রাজি নয়। এগিয়ে এসে ডেস্কের ওপর কাগজগুলো  
রাখলো সে। সেগুলোর দিকে তাকালেনই না কর্নেল।

বললেন, ‘বলো, তোমার উপসংহার কি শোনাও আমাদের। চলতি  
মৌসুমে তিনি পাবার সবচেয়ে আদর্শ জায়গা কোনটা ?’

চোক গিললো নিক শেডি, তার কণ্ঠা ওঠা-নামা করলো ঘন ঘন।

‘কি হলো, চূপ করে আছে কেন। বলো।’ তিমির খোঁজে আমরা  
পিছন দিকে, সাউথ জর্জিয়ায় যাবো, নাকি সামনের দিকে ওয়েডেল  
সী-তে ?’

আরেকবার ঝাঁকি খেলো নিক শেডির কণ্ঠ। ‘প্যাক আইসের ভেতর  
যাত্রা অশুভ-১

দিয়ে,' চাপা গলায়, উদ্বেজনায় সাথে বললো সে। 'প্যাক আইনের  
 ডেডের দিকে ওয়েডেল সাগরে!' তার মুখ একাধিক জ্যান্ত পোকটির  
 মতো মোচড় খেতে শুরু করলো, চোখ দুটো থেকে অশ্রুত আলোর  
 বিকিরণ ঘটছে। হঠাৎ রানা উপলব্ধি করলো, কর্নেলকে দক্ষিণে নিতে  
 যেতে চায় নিক শেডি, নিজের এই ইচ্ছের ওপর ভিত্তি করেই রিপোর্ট  
 টা তৈরি করেছে সে।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, কর্নেলও দক্ষিণ দিকে যেতে চান। 'ওড,  
 ওড।' বললেন তিনি। 'তুমি কি জানতে সোলেনসেনও সাদার উইও  
 কে নিয়ে প্যাকে ঢুকছে?'

'না,' আবার কণ্ঠটা ঝাঁকি খেলো।

'সাভিক, পিটারসেন, এরাও তাই ভাবছে। সবাই ওরা অভিন্ন  
 হোয়েলার। বোনার পাইটনের পরই ওদের নাম করতে হয়।' কর্নেল  
 পাইটনের নামটা উচ্চারণ করার সাথে সাথে মার্ক রোসেটের দিকে  
 তাকালো রানা, কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া দেখলো না। পোর্টহোলে  
 চোখ রেখে বাইরেটা দেখছিলেন কর্নেল, হঠাৎ তিনি চরকির মতো  
 আধপাক ঘুরলেন। 'ঠিক আছে, ক্যাপটেন ভেনসম। ক্যাচারগুলোকে  
 ডেকে নাও। ওগুলো পৌঁছুলেই গানারদের বলো একটা কনফারেন্সে  
 বসবো আমি। আমরা দক্ষিণে যাবো। বাকি আছে আর মাত্র দু'মাস-  
 নষ্ট সময় পুষিয়ে নিতে হলে প্রচুর তিমি দরকার হবে। আমাদের কি  
 যথেষ্ট মাংস আছে, রেফ্রিজারেটর শিপ পুরোপুরি ভরার মতো?'

'না,' জবাব দিয়ে মার্ক রোসেটের দিকে তাকালো ভেনসম।

মার্ক বললো, 'ডলফিনকে মাত্র অর্ধেক ভরতে পেরেছি আমরা।'

'তাহলে ডলফিনও আমাদের সাথে যাবে। যাও, ক্যাচারগুলোকে  
 ডেকে পাঠাও।' হাত নেড়ে ক্যাপটেন আর মার্ক রোসেটকে কেবিন

থেকে বেরিয়ে যাবার ইঙ্গিত করলেন কর্নেল, তারপর রানার দিকে ফিরলেন। 'আমি চাই তদন্তের রিপোর্ট আমরা দক্ষিণে রওনা হবার আগেই তৈরি হয়ে থাক। সেকেন্ড অফিসারকে পাচ্ছেন আপনি, তাকে বললেই সে যে-কোনো লোককে সাক্ষী দেয়ার জন্যে নিয়ে আসবে। টনসবার্গের লোক, ইংরেজি জানে। পাইটন যে-রাতে অদৃশ্য হলো, সে-ই ছিলো ওয়াচে।' দোরগোড়ায় দাঁড়ানো ক্যাপটেন ভেনসমের দিকে তাকালেন তিনি। 'কাল আমরা প্যাক আইসে ঢুকবো।'

## হয়

প্যাক আইসে ঢোকার প্রস্তুতি পূর্বে তদন্তের আয়োজন করা রানার জন্যে অত্যন্ত কঠিন হলো। কর্নেলের সাথে তাঁর কেবিনে আলোচনার পরপরই সাদা উজ্জলতার দিকে বো ঘোরালো ফ্যাক্টরি শিপ। রানা বুঝতে পারলো, প্যাকে একবার ঢোকার পর তদন্তের কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। তখন ক্যাপটেন ভেনসমকে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে না পেরেটকেও।

অদৃশ্য হবার রাতে বোনার পাইটনের গতিবিধি সম্পর্কে সেকেন্ড অফিসারের কাছ থেকে একটা ধারণা পেলো রানা, যাদের সাহায্যকার নেয়া হবে তাদের একটা তালিকাও তৈরি হলো। টাইপ করা একটা নোটিশ পেলো রানা, নিচে কর্নেলের সহ, তদন্ত অনুষ্ঠানকে বৈধ ঘোষণা করলো-১

ঘোষণা করেছেন তিনি। অফিসারদের শ্রোকরূমে লোকজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। পেরেটের মাধ্যমে জাহাজের সবাইকে জানিয়ে দিলো রানা, প্রমাণ বা সাক্ষী যে-কেউ দিতে পারে। এগারোটার সময় তদন্তের কাজ শুরু হবে, ভেনসমকে কথাটা জানিয়ে মারিকার কেনিনে নেমে এলো রানা। 'তুনেছো, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালো মারিকা। 'তোমাকে চেয়ারম্যান করতে হবে, এটাই আমার একমাত্র শর্ত ছিলো। কর্নেল কাকু রাজি হয়েছেন, সেজন্যে আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'এগারোটায় শুরু হচ্ছে,' বললো রানা। 'কমিটিতে তোমার থাকটা...'

'না, রানা, আমি কষ্ট পাবো না। আমার বাবা কিভাবে মারা গেছে আমাকে জানতে হবে।'

এগারোটার সময়, যাদেরকে ডাকা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে, তারা বাদেও আরো পাঁচজন লোককে শ্রোকরুমের সামনে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল, তদন্ত কমিটিকে তারাও কিছু বলতে চায়।

মারিকাকে নিয়ে শ্রোকরূমে ঢুকলো রানা, পেরেট আগেই পৌঁছে গেছে। এক মিনিট পর ভেনসমও হাজির হলো। রানা আসন গ্রহণ করার পর বাকি সদস্য দু'জন নিজেদের চেয়ারে বসলো। 'এবার শুরু করা যায়,' পেরেটকে বললো রানা।

আলোচ্য রাতের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দু'ঘণ্টা বেরিয়ে গেল। কারো ওপর সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। জাহুয়ারীর দুই তারিখ সন্ধ্যায় আর সব দিনের মতো ডিনার খাওয়ার জন্যে অফিসারদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন বোনার পাইটন। কারো সাথেই তিনি তেমন কথা বলেননি। জাহাজ কেপটাউন ত্যাগ করার পর কথা তিনি খুব কমই বলছিলেন। মোশুমটা যে বক্ষ্যা হবে, তা যেন তিনি

আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তিমির অসুস্থিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে বার-বার উদ্বিগ্ন প্রকাশ করতে দেখেছে তাঁর সেক্রেটারী। কোম্পানীতে বড় ধরনের স্বার্থ রয়েছে বোনার পাইটনের। সঠিক সংখ্যা মারিকা বলতে না পারলেও, সেটা শতকরা ত্রিশ বা চল্লিশ পার্সেন্টও হতে পারে।

খাওয়াদাওয়ার পর খানিকটা হুইস্কি পান করেন পাইটন, তারপর নিজের অফিসে বসে আধঘণ্টা কাজ করেন। প্রচুর টেবিল-ওঅর্ক করতে হতো। তাঁকে, জু এবং অফিসাররা কে কতো লভ্যাংশ পাবে, তার হিসেবটা নিজে বের করতেন তিনি। গোটা ম্যানেজমেন্টের সমস্ত বোঝা নিজের কাঁধে বহিতেন শুদ্ধলোক। তাঁর বয়স হয়েছিল বাষট্টি, ইদানীং কাজের চাপে ক্লান্ত দেখাতো তাঁকে।

অফিস থেকে বেরিয়ে ত্রিজে উঠে আসেন পাইটন। অল্প কিছুক্ষণ ছিলেন সেখানে, ডিউটিরত অফিসারের সাথে দু'চারটে কথা বলেন। অ্যান্টার্কটিকার গ্রীষ্মকালীন রাত নেমে আসার সাথে সাথে চারদিকে আধো অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে। তবে পাইটন ত্রিজ ত্যাগ করার খানিক পরই কুয়াশার সব ঢাকা পড়ে যায়।

ত্রিজ ত্যাগ করার পর, যতোটুকু জানা গেল, সরাসরি ক্যাপটেন ভেনসমের কেবিনে যান পাইটন। ওখানে তিনি দু'বার হুইস্কি খান, তারমানে সন্ধ্যা থেকে মোট খেলেন ছয়বার। সবাই স্বীকার করলো, প্রচুর হুইস্কি খেতে পারতেন তিনি, তবে কেউ তাঁকে কখনো মাতাল হতে দেখেনি।

সাক্ষী দিতে উঠে ক্যাপটেন ভেনসম আনালো, ম্যানেজার পাইটনকে সম্পূর্ণ দ্ব্যভাবিক দেখেছে সে। 'একটু হয়তো ক্লান্ত বোধ করছিলেন,' খানিক ইতস্তত করে বললো সে। 'মার্কের সাথে তাঁর একটা যাত্রা অন্তত-১

গোলমাল চলছিল। এ-কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে মার্ক ভালো কাজ বোঝে না। তবে, গোলমালটা বাধলো মার্কের দোষে নয়। বোনার পাইটন ডাকে পছন্দ করতেন না, অপছন্দের ব্যাপারটা গোপনও রাখতেন না। মার্ক অনভিজ্ঞ, সেজন্য কোনো ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না তিনি।

‘ওদের মধ্যে কি প্রকাশ্যে কখনো গোলমাল হয়েছে?’ জিজ্ঞেস করলো রানা।

মাথা নাড়লো ক্যাপটেন ভেনসম। ‘আমার অন্তত জানা নেই। খোঁচা মেরে কিছু বলা হলেও, পাওনা সম্মানটুকু ম্যানিজারকে সব সময় দিয়েছে মার্ক। তারপরও কর্নেল রোসেটকে পদত্যাগের হুমকি দিয়ে মেসেজ পাঠালেন পাইটন। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। টনসবাব্গের লোকজন সমর্থন করলো পাইটনকে, আর স্যাণ্ডেফিওর্ডের লোকেরা ভিড়লো মার্কের দলে। ফলে কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হলো।’

‘মার্কের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন পাইটন, আপনি বলছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘ফলে তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন?’

মাথা ঝাঁকালো ভেনসম।

ভেনসমের কেবিন থেকে বেরিয়ে ওয়াশিংটন রুমে যান পাইটন। মাঝরাতেই খানিক পর পর্যন্ত ওখানে ছিলেন তিনি, কথা বলেছেন চীফ ওয়াশিংটন অফিসারের সাথে।

এরপর সাক্ষী দিতে ডাকা হলো পেরেটকে, পাইটন অদৃশ্য হওয়ার সময়টায় ওয়াচ-এ ছিলো সে। পেরেটের ডিউটি শুরু হয় মাঝরাতে। জাহাজ তখন স্থির দাঁড়িয়ে ছিলো, কুয়াশার চাদরে ঢাকা। জাহাজের

সিহনের নেভিগেশন লাইট দেখা যাচ্ছিলো না। ডিউটির পুরোটা সময় অস্বাভাবিক কিছু ঘটেনি। ডিউটি শুরু করার আশুঘন্টা পর হঠাৎ করে কুরাশা সরে যায়, দৃষ্টিসীমা, কয়েক মাইল পর্যন্ত বেড়ে যায়। রানা তাকে জিজ্ঞেস করলো, সে কোনো চিংকার বা পানি ছলকে ওঠার শব্দ শুনেছে কিনা। না, শোনেনি। সে কি পাইটন বা পাইটনের মতো দেখতে আর কাউকে ডেকে দেখেছে? না, দেখেনি। ‘কুরাশা খুব ঘন ছিলো,’ বললো পেরেট। ‘ত্রিঞ্জ ছাড়া কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না।’

‘তবে কুরাশা সরে যায় সাড়ে বারোটার দিকে, কেমন?’

‘হ্যাঁ।’

‘কুরাশা সরে যাবার পর জাহাজ থেকে তিনি যদি পড়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে তাকে দেখতে পাবার কথা, তাই না?’

‘হ্যাঁ। আমি ত্রিঞ্জে ছিলাম, ত্রিঞ্জ থেকে সব দেখা যায়। তাছাড়া, লুকআউটও ছিলো।’

কাছেই পরিষ্কার হয়ে গেল, ওয়ায়েরলেস রুম ত্যাগ করার পর থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে কোনো এক সময় জাহাজ থেকে অদৃশ্য হয়েছেন পাইটন।

অবশেষে মার্ক রোসেটকে ডাকলো রানা। চোখ ইশারায় একটা চেয়ার দেখাতে বসলো সে। তার ভুরু ছোড়া সামান্য কুঁচকে আছে, স্ক্র হয়ে আছে চোখ দুটো। একটু নার্ভাসই দেখালো। ‘তোমাকে আমি মাত্র একটা প্রশ্ন করতে চাই, মার্ক,’ বললো রানা। ‘ক্যাপটেন ভেনসমের কেবিন থেকে সাড়ে দশটার একটু পর বেরিয়ে যান বোনার পাইটন। তিনি কি আদৌ তোনার কাছে গিয়েছিলেন?’

‘না। সন্ধ্যার সময় খেতে বসে তাঁর সাথে দু’একটা কথা হয়েছিল

আমার ।’ মারিকার দিকে চট করে একবার তাকালো মার্ক, সামান্য কাঁধ ঝাকালো । ‘তারপর তাকে আমি আর দেখিনি ।’

‘তার সাথে তোমার ঝগড়া হয়েছিল ?’ প্রশ্নটা করলো মারিকা, তার গলার কাঠিন্য লক্ষ্য করে ঘাড় ফেরালো রানা । মারিকার শাস্ত চেহারায় চোখ দুটো যেন অঙ্গারের মতো ঝলছে ।

ইতস্তত করলো মার্ক । ‘উত্তর আমাকে দিতেই হবে ?’ রানাকে জিজ্ঞেস করলো সে ।

‘হ্যাঁ,’ বললো রানা ।

মারিকার দিকে তাকালো মার্ক । ‘হ্যাঁ, হয়েছিল । তুমিও জানো, আমরা মানিয়ে চলতে পারতাম না । এর আগেও তার সাথে আমার তর্ক হয়েছে ।’

‘ঝগড়াটা কি নিয়ে হয় ?’ মারিকার কণ্ঠস্বর আবেগশূন্য ।

‘কিছু না, স্রেফ একটা লোকের পদোন্নতি নিয়ে ।’

‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে তোমার কাজ আমার বাবাকে সাহায্য করা, নিশ্চয়ই তার কাজে বাধা সৃষ্টি করা নয় ?’

‘আমি বাধা সৃষ্টি করিনি,’ মার্কের গলা সামান্য একটু চড়লো । ‘শোনো, মারিকা, তোমার বাবার সাথে আমার বনিবনা হতো না । প্রশ্নটা এখানেই শেষ করলে ভালো হয় । তার মৃত্যুর সাথে আমার সম্পর্ক নেই ।’

‘কেউ বলছে না আছে,’ বললো রানা ।

ঝট করে রানার দিকে ফিরলো মার্ক । ইতোমধ্যে তার চেহারা স্থান হয়ে গেছে, বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে কপালে । ‘বলছে না ? তাহলে কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে মারিকা ? সে শুধু একা নয়, সাতিক আর পিটার-সেন গোটা জাহাজে রটিয়ে বেড়াচ্ছে...সে-সব প্রলাপ বিশ্বাসও করছে



টনসবার্গের লোকেরা । সবাই জানে বোনার পাইটনের সাথে আমার  
বনিবনা হতো না, কিন্তু কারণটা কেউ জানে না ।’ মারিকার দিকে  
কিরলো সে । ‘আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলার জন্যে সম্ভাব্য সব  
কিছু করেছে তোমার বাবা । কাজটায় আমি নতুন, কিন্তু কোথাও  
সামান্য ভুল হলে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে এমন সব কথা বলতেন যে একটা  
কুকুরকেও মানুষ ও-সব বলে না ।’

‘কারণটা কি ? তুমি লোক খারাপ, নাকি আমার বাবা ভালোমানুষ  
ছিলো না ?’ কঠিনসুরে জিজ্ঞেস করলো মারিকা । ‘বাবা কি শুধু একা  
তোমার সাথেই খারাপ ব্যবহার করতো ?’

‘কারণটা আমি কি জানি ।’

‘জানো বৈকি ! তোমার সাথে একজন লোক খারাপ ব্যবহার করেছে  
অথচ কারণটা তুমি জানো না, এ কি হয় ? কারণটা আমরা তোমার  
মুখ থেকে শুনতে চাই ।’

‘কোনো কারণের কথা আমার জানা নেই !’ দরদর করে ঘামছে  
মার্ক রোসেট ।

‘প্রথমে বাবা আমাদের বিয়েতে রাজি ছিলেন, পরে তিনি মত বদ-  
লান, সেটাই কি কারণ, মার্ক ? তোমার বাবা, কর্নেল কাকু মারা গেলে,  
আমার বাবাকে উপকে কোম্পানীর চেয়ারম্যান হতে চাও তুমি, এটাই  
কি কারণ তার সাথে তোমার ঝগড়া বাধাবার ?’

‘এ-ধরনের অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে বাধ্য নই  
আমি,’ জেদের সুরে বললো মার্ক । ‘সত্যি কথা হলো, তোমার বাবা  
এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যাতে আমাকে ডেকে  
পাঠানো হয় ।’

‘কারণ ?’

যাত্রা অন্ত-১

‘কারণ ? কারণ বোনার পাইটন চাইছিলেন বাবা মারা গেলে কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ যেন তাঁর হাতে চলে আসে । আমাকে পথের কাটা ভেবে সরাসরে চাইছিলেন ।’

‘এভাবে কোথাও আমরা পৌঁচাচ্ছি না,’ বললো রানা । ‘বোনার পাইটনের মৃত্যু সম্পর্কে তোমার কিছু বলবার আছে ?’

‘না । কিভাবে তিনি মারা গেছেন সে-সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই । একটামাত্র ব্যাখ্যা যেটা আমি ভাবতে পারি, তা হলো, মারিকার বাবা আর্থিক সংকটে পড়েছিলেন ।’

‘আর্থিক সংকট ?’ জিজ্ঞেস করলো ক্যাপটেন ভেনসন । ‘কি ধরনের আর্থিক সংকট ?’

‘বোনার পাইটন জুয়া খেলছিলেন...,’ কথা শেষ না করে নিজেই সামলে নিলো মার্ক, তারপর বিড়বিড় করে বললো, ‘সেটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার ।’

‘বাজে কথা ।’ শান্ত দৃঢ়তার সাথে বললো মারিকা । ‘বাবা জীবনে কখনো জুয়া খেলেনি । তার আর্থিক সংকটে পড়ার প্রশ্নই ওঠে না । তিনি ছাড়া আর কোনো ব্যাপারে উৎসাহ ছিলো না তার ।’

‘তবে কোম্পানীর মালিক সেজে বসার উৎসাহ ছিলো, কি বলো ?’ ব্যঙ্গাত্মক হাসির সাথে বললো মার্ক । তারপর কাঁধ ঝাঁকালো সে । ‘দুঃখিত, জেন্টলমেন । এ-ব্যাপারে আর কিছু আমার না বলাই ভালো ।’

‘তবে তুমি বলছো বোনার পাইটন আর্থিক ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন,’ বললো রানা । ‘এবং এর সাথে তাঁর মৃত্যুর সম্পর্ক থাকতে পারে ?’

‘পারে ।’

‘কুয়াশা এলো, তারপর সরে গেল, মাঝখানের সময়টা কোথায়

ছিলে তুমি ?

‘নিজের কেবিনে, একা ।’

‘ঠিক আছে, পরে তোমাকে আবার ডাকা হতে পারে ।’ সদস্যদের দিকে ফিরলো রানা । ক্যাপটেন ভেনসম ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝাতে চাইলো, সে সন্তুষ্ট । স্থির পাথর হয়ে আছে মারিকা, মার্কের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে । সে কিছু বললো না দেখে মার্কের দিকে ফিরলো রানা, ‘ধন্যবাদ,’ বললো ও । তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়লো মার্ক, চেহারায় স্বস্তির ভাব । মারিকার দিকে ভুলেও তাকালো না সে, বেরিয়ে গেল স্নোকরুম থেকে । রানা ভাবলো, কোনো কারণ বা ভিত্তি ছাড়া বোনার পাইটনের আর্থিক সংকটের কথা বলেনি মার্ক । এ ব্যাপারে ওর কিছু জানা নেই, মারিকাও ওকে কিছু বললো না । তারও হয়তো কিছু জানা নেই ।

পরবর্তী সাক্ষী মেসবর, প্রতিদিনের মতো সকাল ছ’টায় পাইটনের কেবিনে চা দিতে গিয়েছিল । কেবিনটা খালি দেখে সে, বিছানায় রাতে কেউ ঘুমায়নি । সবশেষে জোনাস ভেনসম, জাহাজের ক্যাপটেন হিসেবে ব্যক্তিগত তদন্ত চালিয়ে যা জানতে পেরেছে, আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিটির অপর দুই সদস্যকে সে-সম্পর্কে অবহিত করলো । এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে তার বাইরে সে-ও কিছু জানতে পারেনি । ‘এই জাহাজে এমন বহু লোক আছে যারা মার্ক রোসেটকে পছন্দ করে না,’ রিপোর্ট করার পর জানালো সে, ‘কিন্তু তারপরও বোনার পাইটনের মৃত্যুর ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে কেউ কোনো প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেনি । এমনকি সরাসরি কেউ কোনো অভিযোগও করেনি । চাপা গুজব বা গুজব, এ-সব আমরা ধর্তব্যের মধ্যে আনছি না । আমার ধারণা, কি ঘটেছে তা একরকম পরিষ্কারই ।’

‘মার্কের মতো আপনিও ইঙ্গিত দিচ্ছেন, বাবা আত্মহত্যা করেছে, তাই না?’ মারিকার গলা কেঁপে গেল।

ভেনসম বা রানা কিছু বললো না।

‘ক্যাপটেন ভেনসম,’ এবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো মারিকা, ‘আমার বাবাকে অনেকদিন থেকে চিনতেন আপনি। আপনার কি মনে হয়, আত্মহত্যা করার মতো লোক ছিলো সে?’

ইতস্তত করলো ভেনসম, দাড়িতে আঙুল চালালো। ‘না,’ বললো সে। ‘স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি আত্মহত্যা করবেন না। কিন্তু...’

‘এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই।’ প্রায় চিৎকার করে উঠলো মারিকা। ‘বোনার পাইটন আমার বাবা, তার সাথে আমার সম্পর্ক ছিলো বন্ধুর মতো। আমি তাকে চিনি। দয়া করে আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করুন, বাবা আত্মহত্যা করেনি, করতে পারে না।’

রানা বললো, ‘তদন্ত আপাতত মূলতবি রাখা হলো। লাঞ্চার পর আবার বসবো আমরা, তখন শোনা যাবে আর কে কি বলতে চায়।’

লাঞ্চ টেবিলে চুপচাপ থাকলো মারিকা। প্রায় কিছুই খেলো না। রানা লক্ষ্য করলো, মারিকার দিকে দু’একবার তাকালো মার্ক, তার দৃষ্টিতে কিসের যেন আবেদন, তাকে খানিকটা সম্বলিত বলেও মনে হলো। কর্নেল রোসেট মাত্র একটা প্রশ্ন করলেন, ‘তদন্ত শেষ হচ্ছে কখন?’

‘বিকেলের দিকে,’ বললো রানা। ‘স্বচ্ছায় যারা কিছু বলতে চায় শুধু তাদের কথা শোনা বাকি।’

‘তাড়াতাড়ি করুন,’ বললেন কর্নেল। ‘আর মাত্র দুটো ক্যাচার ফিরতে বাকি আছে, তারপরই ফুল স্পীডে দক্ষিণে ছুটবে ফ্যাক্টরি শিপ।’

আবার বসলো ওরা, বসে থাকতে হলো সন্ধ্যা পর্যন্ত। তথ্য এবং প্রমাণ দিতে যারা এলো তারা সবাই টনসবার্গের লোক, তাদের কথা শোনার পর গোটা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেল। অতিরঞ্জন বাদ দিলেও, কমিটির তিনজনই উপলব্ধি করলো, ওদেরকে যেমন বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করা হয়েছে তারচেয়ে অনেক গুরুতর ছিলো বোনার পাইটন আর মার্ক রোসেটের বিরোধ।

গোলমালটা শুরু হয় জাহাজ কেপটাউন ত্যাগ করার এক হপ্তা পর। বয় লার আর ক্রিনারদের কাছে যে ধরন, প্রায় লোকেরই খুশকি হয়, প্রতি-রোধ করার জন্যে ওদের জন্যে বিশেষ রেশনের ব্যবস্থা আছে, সেই রেশন বাতিল করে দেয় মার্ক। তুরা একজন প্রতিনিধি পাঠায় মার্কের কাছে, কিন্তু মার্ক নিজের ভুল স্বীকার না করে আগের সিদ্ধান্তই বহাল রাখে। সব কথা শোনার পর বোনার পাইটন নির্দেশটা বাতিল করেন। কয়েক দিন পর প্রায় একই ধরনের একটা ঘটনা ঘটে, জরুরী কিছু কাপড়ের বরাদ্দ নিয়ে। লোকজনের সামনে বোনার পাইটনকে এই বলে অভি-যুক্ত করে মার্ক, তিনি ক্রুদের লাই দিয়ে মাথায় তুলছেন। প্রথম যেদিন তারা তিমি মারলো, জাহাজের একটা যন্ত্র হঠাৎ ভেঙে পড়ায় দু'জন লোক আহত হয়। যন্ত্রপাতি ব্যবহারের আগে পরীক্ষা করার দায়িত্ব ছিলো মার্কের, কথাটা তাকে মনে করিয়ে দেয়া হলে লোকজনের সামনে বোনার পাইটনকে যা-তা বলে অপমান করে সে। এরপর আরো বড় ধরনের গোলমাল বাধে। লিবার্টি-ফোর চারটে তিমি নিয়ে আসে, কিন্তু পরে দেখা যায়, খাতায় লেখা হয়েছে তিমিগুলো নিয়ে এসেছে লিবার্টি-এইট। লিবার্টি-ফোর-এর স্কিপার, পিটারসেন অভি-যোগ করে। ভুলটা মার্কের, কারণ খাতায় লেখালেখির কাজটা তার। লিবার্টি-এইট স্যাণ্ডেফোর্ডের ক্যাচার। বিষয়টা নিয়ে বোনার পাই-  
যাত্রা অশুভ-১

টনের সাথে তুমুল বাকবিতণ্ডা হয় মার্কের। অফিসরূমে কি ঘটেছিল  
স্বচ্ছায় জানাবার জন্যে কমিটির সামনে উপস্থিত হলো ক্যাপটেন  
পিটারসেন।

নিজের ভুল স্বীকার করতে রাজি হয়নি মার্ক। প্রচণ্ড রাগে ক্যাপটে  
ক্যাপটে সে পান্টা অভিযোগ করে, গোটা ব্যাপারটা তার বিরুদ্ধে  
একটা ষড়যন্ত্র। বোনার পাইটনের সামনে হাত নেড়ে সে চিৎকার  
করতে থাকে, ‘আপনি আমাকে ভাগাবার তালে আছেন। আপনার  
মতলব আমি বুঝি। আমার বাবাকেও আপনি সরিয়ে দিতে চান।  
আপনার অনেক দিনের ইচ্ছে গোটা কোম্পানীকে নিজের মুঠায়  
ভরা...।’

তার এ-সব কথা শুনে বোনার পাইটন জিজ্ঞেস করেন, ‘ঠিক কি  
বলতে চাইছেন তুমি?’

জবাবে মার্ক বলে, ‘এ-তো দিবালোকের মতো পরিষ্কার, একটা  
প্ল্যান ধরে এগোচ্ছেন আপনি। টাকা-পয়সা কোথায় কিভাবে ইন-  
ভেস্ট করা যায়, সামনে যাকে পান তাকেই জিজ্ঞেস করেন। আমার  
কাছেও আপনি পরামর্শ চেয়েছেন। এ-সবের একটাই অর্থ, বাজার  
থেকে শেয়ার কিনে কোম্পানীর আগামী চেয়ারম্যান হওয়ার পথ  
পরিষ্কার করা। প্রচুর টাকা দরকার আপনার, তাই না? কিন্তু  
আপনি বুড়ো হয়েছেন, বুদ্ধিমুদ্বি ভোঁতা হয়ে গেছে, কিসে নিজের  
ভালো তা-ও বোঝেন না। কেপটাউনে থাকার সময় ওখানে আপনি  
কি করছিলেন, ভেবেছেন আমি জানি না? ধৈর্য ধরুন, মাথার ওপর  
আকাশ ভেঙে পড়লো বলে। ঠিক কি ঘটবে না জানলে কি তার  
আমি আপনাকে ঐ বুদ্ধি...’ কথাটা শেষ করেনি মার্ক, ঝড়ের বেগে  
কেবিন থেকে বেরিয়ে যায়।

সেক্রেটারীকে ডেকে পাঠালো রানা, তাকে জিজ্ঞেস করলো, ‘ঘটনাটা আপনি আমাদেরকে জানাননি কেন?’ জবাবে সে বললো, ব্যাপারটা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি। তবে, আসল কারণটা আঁচ করতে পারলো রানা। মার্ক রোসেট অ্যাকটিং ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছে, আর তার বাবা কোম্পানীর চেয়ারম্যান, চাকরি হারাবার ভয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গোপন করে গেছে সে। লোকটা একা নয়, তারমতো আরো অনেক লোক রয়েছে জাহাজে। অবশ্য রানা চাপ দেয়ায় ঘটনার প্রতিটি বিবরণ সত্যি বলে স্বীকার করলো সে।

বোনার পাইটনের কেবিনে আরো একবার ঝগড়া বাধে মার্কের। একজন উইঞ্চ-বয় বাইরে থেকে শুনেছে। মার্ক চিৎকার করে কথা বলছিলো, ‘পদত্যাগ করতে রাজি নই আমি। চাইলে আপনি আমাকে বরখাস্ত করতে পারেন। তবে ভেবে দেখুন, বাবা কিভাবে নেবেন ব্যাপারটা।’

উত্তরে বোনার পাইটন বলেন, ‘তোমার বাবা যেভাবে ইচ্ছে নিতে পারে। তোমার মতো একটা বেয়াদপ ছোকরাকে ঘাড়ে করে বয়ে বেড়াতে পারবো না আমি। কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে কোম্পানীর ক্ষতি, তা আমি হতে দেবো না।’

এরপর একটা ঘুসি মারার শব্দ হয়। কয়েক মুহূর্ত পর দরজা খুলে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে আসে মার্ক, রাগে থরথর করে কাঁপছিলো সে। ‘দেখে মনে হলো কঁদে ফেলবে,’ সবশেষে বললো উইঞ্চ-বয়।

ভেনসমের দিকে তাকালো রানা, মনে আছে মার্ককে সমর্থন করেছে লোকটা। এখন আর কোনো সন্দেহ নেই, কেউ তার চোখে ঠুলি পরিয়ে রেখেছিল। কেউ-টা নিশ্চয়ই মার্ক রোসেট নয়। সে এমনকি

রানাকেও প্রায় বোকা বানিয়েছে।

এরপর বিশালসেহী এক লোক দেখ্‌হার সাক্ষী দিতে এলো। তার মুখে বেশ কয়েকটা কাটা দাগ, জায়গাগুলোয় দাঁড়ি গজায়নি। ক্যান্টন সার্ভিকের সাথে গ্যাঙওয়ার মাথায় একেই দেখেছিল রানা।

তার বক্তব্য হলো, আলোচ্য ঘটনার দিন, মাঝরাতেই সামান্য পরে জাহাজের পিছন দিকে যায় সে। দেখতে পায়, একটা বোটের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সিগার খাচ্ছেন বোনার পাইটন। মাঝে মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন তিনি, দেখে মনে হলো অত্যন্ত টেনশনে আছেন। রানা জিজ্ঞেস করলো, ক্যান্টন ভেতর তুমি তার মুখ দেখলে কিভাবে? লোকটা জবাব দিলো, ম্যানেক্সারের মুখে সিগার জ্বলছিল। ওখান থেকে জাহাজের সামনের দিকে সরে আসার জন্যে ধুরে দাঁড়ায় সে, বোনার পাইটন তখনো পায়চারি করছেন। কয়েক পা এগিয়েই মার্ক রোসেটকে দেখতে পায় সে, বোনার পাইটনকে লক্ষ্য করে এগোচ্ছে। তাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে সে, চিন্তা করে ছ'জনের মধ্যে নতুন কোনো গোলমাল বেধেছে কিনা। না, কি কি কথা হয়েছে তা সে শোনেনি। অনেকটা দূরে ছিলো সে। তবে, ওদের ছ'জনের গলাই ধীরে ধীরে চড়ছিল। কথাগুলো বোঝা না গেলেও, ছ'জনেই যে প্রচণ্ড রেগে আছে তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি তার। হঠাৎ একটা আতঁচিকার শব্দ শুনে পায় সে, তারপর সব চুপ। মার্ক রোসেটকে ফিরে আসতে দেখলো সে। তার চেহারা একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। এরপর জাহাজের পিছন দিকে ছুটে আসে সে, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন ম্যানেক্সার। কিন্তু তাঁকে সেখানে পায়নি সে।

‘মার্ক তোমাকে দেখেছে?’ পেরেটের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করলো রানা।



‘না । আমি একটা ভেটিলেটর-এর পাশে ছিলাম, তাছাড়া কুয়াশা ছিলো ।’ মুখের একটা দাগের ওপর, মস্তক চামড়ায় আঙুল বুলিয়ে রানার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে থাকলো সে । এটা তার একটা অভ্যাস, খানিক পরপরই একটা হাত মুখের দাগগুলোয় উঠে যাচ্ছে ।

‘অথচ বলছো মার্কের চেহারা সাদা দেখাচ্ছিল ?’

লোকটা চুপ করে থাকলো ।

‘অথচ কুয়াশা এতো ঘন ছিলো যে মার্ক তোমাকে দেখতে পেলো না ।’

‘সে খুব নার্ভাস ছিলো ।’

ক্যাপটেন ভেনসন নড়ে উঠলো । ‘এ-সব কথা তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন ?’

মাথা চুলকে লোকটা বললো, ‘ভয়ে ।’

দেখে মনে হয় না বিশালদেহী লোকটা সহজে ভয় পেতে পারে ।

‘জাহাঞ্জে তোমার কাজ কি ?’ জিজ্ঞেস করলো রানা ।

‘আমি সীম্যান ।’ প্রশ্ন শুনে অবাক হয়েছে লোকটা ।

‘ক্যাচারে কাজ করেছো কখনো ?’

মাথা ঝাকালো লোকটা ।

‘ক্যাপটেন সাভিকের ক্যাচারে ?’

চট করে আরেকদিকে তাকালো বিশালদেহী, জবাব দিলো না ।

রানা বললো, ‘তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না ।’ হঠাৎ অস্থির দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকালো লোকটা । ‘কেউ তোমাকে এ-সব কথা বলার জন্যে শিখিয়ে দিয়েছে—কে সে ?’ লোকটা চুপ করে আছে দেখে আবার প্রশ্ন করলো রানা, ‘ক্যাপটেন সাভিক, তাই না ? গতকাল, ক্যাচারগুলোর ক্যাপটেনরা যখন কর্নেল ওয়াকারের

সাথে মিটিং করতে এসেছিল, তাই না ? সে-ই তোমাকে এ-সব বলতে বলেছে ।’

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলো লোকটা, মুখে কথা নেই, কান দাগের ওপর আঙুল ।

‘ঠিক আছে,’ কঠিন সুরে বললো রানা । ‘তুমি যেতে পারো । শ্রমোৎসব থেকে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল লোকটা ।

ক্যাপটেন ভেনসমের দিকে ফিরলো রানা । ‘কেন ?’ প্রশ্নটা নিজে-কেই করলো ও ।

দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে ভেনসম বললো, ‘আমার ধারণা, ক্যাপটেন সান্তিককে ডাকা উচিত ।’

মারিকার দিকে ফিরলো রানা । নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো সে । কনুই দুটো ডেস্কের ওপর, দু’হাতের ভাঁজ করা আঙুলে চিবুক ঠেকিয়ে পাথুরে মূর্তির মতো বসে আছে । রানা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়নি বুকতে পেরে মুহূর্তে বললো, ‘সান্তিক বোধহয় জানেন কিছু । বানার অত্যন্ত ভক্ত উনি ।’

খোজ নিয়ে জানা গেল, ক্যাপটেন সান্তিকের ক্যাচার এইমাত্র ক্যান্ট্রি শিপের গায়ে ভিড়েছে । লোক পাঠানো হলো তাকে খবর দিয়ে আনার জন্যে । হঠাৎ মারিকা জানালো, ‘ক্যাপটেন সান্তিককে আমি নিজে জেরা করবো ।’

খাটো, চওড়া, সীল মাছের মতো নাহুসনাহুস ক্যাপটেন সান্তিক হাজির হলো । ইঙ্গিত পেয়ে চেয়ারের কিনারায় আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসলো সে, দেখেই বোঝা গেল নার্ভাস । ভেনসম বা রানার দিকে তাকানো করে তাকালোই না, গাঢ় নীল চোখ দুটো স্থির হয়ে থাকলো মারিকার মুখের ওপর । দৃষ্টিতে শুধুই কি সহানুভূতি, নাকি আরো

কিছু আছে ? রানার যেন মনে হলো, নীরবে তাকিয়ে থেকে মারিকা-কে কি যেন বলতে চাইছে লোকটা।

‘ক্যাপটেন সাভিক,’ শুরু করলো মারিকা। ‘কাল আপনি কোকুনের একজন জুর সাথে কথা বলেছেন, তার নাম এমারিক।’

‘হ্যাঁ।’

‘আমরা এমারিকের কথা শুনেছি,’ বললো মারিকা, কি বলেছে এমারিক তা-ও সংক্ষেপে বর্ণনা করলো। ‘কমাগার মাসুদ রানার দৃষ্টিতে তার বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাঁর ধারণা, মিথ্যে সাক্ষী দেয়ার জন্যে আপনি তাকে পাঠিয়েছেন।’

‘কিন্তু আপনি, মিস মারিকা, আপনি কি ভাবছেন ?’

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে মারিকা বললো, ‘আমিও তাই ভাবছি।’

কাঁধ ঝাকালো সাভিক। কিছু বললো না সে। শুধু তাকিয়ে আছে মারিকার দিকে।

‘কেন, ক্যাপটেন সাভিক ?’ জিজ্ঞেস করলো মারিকা। ‘কেন আপনি এমারিককে বলতে পাঠিয়েছিলেন যে বাবা অদৃশ্য হবার রাতে ডেকের ওপর মার্কের সাথে ঝগড়া বাধে তার ?’

‘মিস মারিকা, আপনি ষথেষ্ট কষ্টের মধ্যে আছেন, আপনার কষ্ট আমি আর বাড়াতে চাই না,’ ক্যাপটেন সাভিক এমন নরম সুরে কথা-গুলো বললো যেন একটা পোষা বেড়ালকে আদর করছে। ‘তবে, আমার বিশ্বাস ঠিক তাই ঘটেছে।’

‘আপনি কোম্পানীর চেয়ারম্যানের ছেলেকে খুনী বলে অভিযোগ করছেন,’ বললো মারিকা। ‘অভিযোগ করছেন সে আমার বাবা-কে খুন করেছে। আপনি সরাসরি আমাদের কাছে আসেননি কেন, বা ক্যাপটেন ভেনসমকে লিখিতভাবে জানাননি কেন ?’ ইতিমধ্যে আগরা

জানতে পেরেছি, সে-রাত্রে মার্ক রোসেটের সাথে বাবার দেখাই হয়নি।  
'কি করে জানলেন আপনি?' রাগের সাথে জিজ্ঞেস করলে  
সান্ত্বিক।

'তদন্ত কমিটির সামনে সাক্ষী দিয়েছে মার্ক...।'

'তাহলে সে মিথ্যে কথা বলছে,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো সান্ত্বিক।

অথাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো মারিকা, রানা।  
করলো তার কথা বিশ্বাস করছে সে। বাপের তত্ত্ব, অনেকদিনের  
শোনা, মারিকা হয়তো ছোটবেলা থেকে আদর পেয়ে আসছে সে-  
টার কাছ থেকে—সে যদি এমন জোর দিয়ে বলে, অবিশ্বাস করে  
তাবে! 'ওহ, গড!' বিড়বিড় করে উঠলো মারিকা, শরীরটা  
নেতিয়ে পড়লো।

'কিভাবে জানলেন আপনি মার্ক মিথ্যে কথা বলছে?' প্রশ্ন করল  
রানা। তাবলো, লোকটা যদি নিজের বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ দেখাতে  
না পারে, তাহলে এ-ধরনের একটা অভিযোগ করতে গেল কেন।

'আমার আর কিছু বলার নেই,' ভারি গলায় বললো ক্যাপ্টেন  
সান্ত্বিক। 'যা ঘটেছে বলে বিশ্বাস করি তাই আমি বলাতে চেয়েছি  
এমারিককে দিয়ে। আমি চেয়েছি, তদন্ত কমিটি ব্যাপারটা চাফা  
তারপর এই সূত্র ধরে কাজ করুক।'

'কিন্তু এতো জোর দিয়ে কিভাবে আপনি বলছেন, সেদিন বোনার  
পাইটনের সাথে মার্ক রোসেটের দেখা হয়েছিল?'

'জোর দিয়ে বলতে পারছি এইজন্যে যে আমি জানি ঘটনাটা ঘটে  
ছিল।'

'এটা তাহলে আপনার বিশ্বাস?'

'হ্যাঁ।'

‘আপনার হাতে কোনো প্রমাণ নেই?’

‘প্রমাণ পাবেন, মার্কিকে প্রশ্ন করুন।’

কয়েক সেকেন্ড পর রানা বললো, ‘ঠিক আছে, আপনাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই। আপনার আচরণ নিন্দনীয় বলে ঘোষণা করছি আমি। আশা করি পুলিশ যখন জেরা করবে তখন আপনি আরো সহযোগিতার মনোভাব দেখাবেন। এখন আপনি যেতে পারেন, ক্যাপটেন সাভিক।’

মারিকার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে চেয়ার ছাড়লো সাভিক। গলাটা পরিকার করলো সে, যেন কিছু বলতে চায়। তারপর হঠাৎ ঝট করে ঘুরে হনহন করে বেরিয়ে গেল স্মোকরুম থেকে।

ভেনসমের দিকে ফিরলো রানা। ‘আবার একবার মার্কিকে ডাক। দরকার,’ বললো ও।

ভেনসম সমর্থন করলো ওকে। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো মারিকা। থমথম করছে তার চেহারা।

মার্কিকে ডেকে আনার জন্যে লোক পাঠানো হলো। অপেক্ষা করছে ওরা। স্মোকরুমের ভেতর নিস্তব্ধতা যেন বোমার মতো বিক্ষোভিত হচ্ছে। লাউডস্পীকারে মার্কের নাম শোনা গেল। গোটা জাহাজ থেকে শুনতে পেলো সবাই।

## সাত

মার্ক রোসেট নয়, এ-যেন সম্পূর্ণ নতুন এক লোক। তার হাবভাব মারমুখো, ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে, যেন এইমাত্র তিনমাইল দৌড়ে এলো। তবে চোখের দৃষ্টি চঞ্চল, খানিকটা যেন সন্ত্রস্ত বলেও মনে হলো। রানার। তাড়াতাড়ি বসে পড়লো সে, অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করলো না। কামরার উদ্বেজনা ভারি পাথরের মতো চেপে বসলো তার গোটা অস্তিত্বে। রানা বা কমিটির আর কারো দিকে সরাননি তাকালো না; রক্তখালে জিজ্ঞেস করলো, ‘আবার আমাকে ডাকা হলো কেন?’

‘এইমাত্র এক লোকের জবানবন্দী শুনলাম আমরা,’ বললো রানা, বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। সামান্য কৌশল অবলম্বন করলে তার ভয়ের কারণটা জানা যেতে পারে, ভাবলো ও। তারপর বললো, ‘এখনো কি তুমি তোমার কথায় অটল থাকবে, অদৃশ্য হবার রাতে তোমার সাথে বোনার পাইটনের দেখা হয়নি?’

চোখ পিট পিট করে রানার দিকে, তারপর মেঝের ওপর তাকালো মার্ক। ‘হ্যাঁ, অবশ্যই!’ পরমুহুর্তে চেয়ারের হাতল ছুটো শক্ত করে

ঝাকড়ে ধরলো সে। ‘আহাজে আপনারা সাভিককে আনিয়েছেন। তার সাক্ষী নিয়েছেন, তাই না?’ রানা বললো, সাভিকই তাহলে মার্কের ভয়ের কারণ। ‘নিশ্চয়ই সমস্ত দোষ আমার বাড়ে চাপানার চেঁটা করেছে সে, জানা কথা। বোনার পাইটনের শিষ্য সে, আমাকে ছ’চোখে দেখতে পারে না। যা-ই সে বলে থাকুক, মিথ্যে কথা বলেছে। সে একটা মিথ্যেবাদী।’

‘তিনি বলছেন, তুমি মিথ্যে কথা বলছো,’ বললো রানা।

‘সে কিছু জানলে তবে তো সত্যি কথা বলবে!’ বেসুরো হাসির আওয়াজ বেরলো মার্কের গলা থেকে। ‘ঘটনার সময় ফাঙ্কিরি শিপে সে ছিলো না। যা-ই বলুক সে, আন্দাজে বলছে।’

‘এক মিনিট, মার্ক,’ বললো রানা। ‘তুমি ভুল করছো। আমরা সাভিকের দেয়া এভিডেন্স নিয়ে কাজ করছি না। সাক্ষীদের মধ্যে একজন প্রত্যক্ষদর্শীকে পাওয়া গেছে। তার কথা হলো, মাঝরাতে দিকে বোনার পাইটনকে আহাজের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সে, একটা বোটের কাছাকাছি।’ লোকটা যে মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছে জানে রানা, জানে মার্ককে মুখ খুলতে বাধ্য করার জন্য ঘটনার মিথ্যে বর্ণনাটুকু ব্যবহার করার কোনো অধিকার ওর নেই। তবে, সত্যি কি ঘটেছিল জানতে হবে ওকে। মার্ক যে কিছু একটা লুকাচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ‘বোনার পাইটন সিগার খাচ্ছিলেন,’ বলে চললো ও। ‘লোকটা ফিরে আসছে, এই সময় তোমাকে দেখতে পায় সে। তুমি সরাসরি বোনার পাইটনের দিকে যাচ্ছিলে।’ রক্তশূন্য সাদা হয়ে গেল মার্কের চেহারা। মনে হলো, দশ আটকে রেখেছে। ‘কিছু বলো?’ জিজ্ঞেস করলো রানা। ‘কথাটা কি সত্যি? তুমি কি বোটের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা বোনার পাইটনের দিকে যাচ্ছিলে?’

‘না ।’ চিংকার করে উঠলো মার্ক । ‘না ।’

তার চিংকারটা এতো জোরালো, রানার সম্মুখে আরো বাড়লো ।  
‘লোকটা একটা ভেটিলেটরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো । তোমাদের মধ্যে  
তর্ক-বিতর্ক শুনেছে সে । হঠাৎ একটা চিংকার । তারপর আর কোনো  
শব্দ নেই । সত্যি ?’

‘না । সব মিথ্যে... আমাকে ফাঁসাবার ষড়যন্ত্র... সব মিথ্যে ।’ এমন-  
ভাবে চিংকার জুড়ে দিলো, মার্কের গায়ে যেন আগুন ধরে গেছে ।

‘তারপর তোমাকে ফিরে আসতে দেখে সে, জাহাজের সামনের  
দিকে যাচ্ছিলে তুমি । তোমার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিলো ।  
তাকে তুমি দেখতে পাওনি, কারণ লোকটা ভেটিলেটর কাউলিং-এর  
আড়ালে ছিলো, আর কুয়াশা তো ছিলোই । লোকটা তারপর এগিয়ে  
গিয়ে দাঁড়ায়, যেখানে খানিক আগে বোনার পাইটনকে দেখেছে সে ।’  
হ্যাঁ, হয়ে গেছে মার্ক, সম্মুখিতের মতো তাকিয়ে আছে রানার  
দিকে । ‘কিন্তু তখন আর বোনার পাইটন সেখানে ছিলেন না ।’

মুখ হাঁ করলো মার্ক । কিন্তু শব্দ বেরলো না । মনে হলো শ্বাসকষ্টে  
ভুগছে । তারপর সবাইকে হতবাক করে দিয়ে চিংকার করে বললো,  
‘ঠিক আছে ! ছিলাম আমি ওখানে ! বোনার পাইটনের সাথে আমার  
দেখা হয়েছে ! হ্যাঁ, তর্ক করেছি । কিন্তু ওই পর্যন্তই । বিশ্বাস করুন,  
আর কিছু ঘটেনি ।’

‘কি নিয়ে তর্ক হয় ?’ জিজ্ঞেস করলো রানা ।

‘কি নিয়ে আবার !’ কি বলবে ভেবে পেলো না মার্ক, কামরার  
চারদিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালো যেন পালাবার পথ খুঁজছে । দ্বিভ-  
বের করে ঠোঁট ভেজালো বার কয়েক । ‘সে অভিযোগ করলো আমার  
বাবা নাকি তাকে ডুবিয়ে দিয়েছে ।’



‘কিভাবে ?’

রানার দিকে তাকালো মার্ক, এমনভাবে তাকিয়ে থাকলো যেন  
কোনো রানার মগজে গেঁথে দিতে চাইছে সে। ‘পাইটনের ইচ্ছে  
ছিলো কোম্পানীটা সে তার ইচ্ছে মতো চালাবে। স্যাণ্ডওফিওর্ডের  
লোকদের বাদ দিয়ে টনসবার্গের লোকদের ঢোকাতে চেয়েছিল সে।’

‘সম্পূর্ণ বাজে কথা !’ দৃঢ়তার সাথে প্রতিবাদ জানালো মারিকা।

তার দিকে তাকালো না মার্ক, বলে চলেছে, ‘পাইটন আমাকে  
জাহাজে চায়নি। আমি যাতে টিকতে না পারি তার জন্যে সম্ভাব্য সব  
কিছু করেছে ওই লোক। সে এমনকি খাতার হিসেবও পান্টে ফেলে,  
টনসবার্গের লোকেরা যাতে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে।  
তার ভয় ছিলো, আমার বাবা মারা গেলে আমি না কোম্পানীর চেয়ার-  
ম্যান হয়ে যাই।’

‘প্রসঙ্গ থেকে সরে যেয়ো না,’ বললো রানা। ‘তোমার বাবার  
বিরুদ্ধে ভুবিয়ে দেয়ার অভিযোগ কেন করলেন পাইটন ?’

‘তার বিস্তর টাকার দরকার ছিলো,’ জবাব দিলো মার্ক। ‘কোম্পা-  
নীর যেখানে যতো শেয়ার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সব কিনে নিতে  
চেয়েছিল সে। কিন্তু জমা টাকায় কুলোচ্ছিলো না। আমার বাবা  
দক্ষিণ আফ্রিকার এক সোনার খনির শেয়ার কেনার পরিকল্পনা কর-  
ছিলো, তার দেখাদেখি ওই খনির শেয়ার পাইটনও কিনতে চায়।  
অনেক হাতে-পায়ে ধরে খনি কোম্পানীর নাম বাবার কাছ থেকে  
জেনে নেয় সে। আমরা কেপটাউন ছাড়ার দু’হপ্তা পর খবর আসে,  
খনিটা ভুয়া ছিলো, লালবাতি জ্বলছে।’

এর আগে প্ল্যান ফোরম্যান জানিয়েছে, আর্থিক পরামর্শ কর্নেল  
ওয়াকারের কাছ থেকে নয়, মার্ক রোসেটের কাছ থেকে চেয়েছিলেন

পাইটন। ইতস্তত করলো রানা। তবে প্রসঙ্গটা তুলে কোনো লাভ নেই। ‘তারমানে তুমি বলতে চাও, পাইটন খনির শেয়ার কিনে বড় একটা মার খান?’

‘মার খান মানে? সর্বস্ব হারিয়ে ফতুর হয়ে গিয়েছিল সে! তার সব সম্পত্তি ও নগদ টাকা, এমনকি পোলার হোয়েলিং কোম্পানীতে তার সমস্ত হোল্ডিং পর্যন্ত বন্ধক রেখে টাকা যোগাড় করেছিল, খনির শেয়ার কিনে তিনগুণ লাভ করার লোভে।’

‘সেই লাভের টাকা দিয়ে পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর শেয়ার কিনতে চেয়েছিলেন তিনি?’

‘হ্যাঁ, যাতে শেয়ারের সংখ্যার কারণে কোম্পানীটা তার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।’

‘তারপর তিনি তোমার বাবাকে কোম্পানী থেকে সরিয়ে দিতেন, এই তোমার ধারণা?’ জিজ্ঞেস করলো রানা।

আবার ইতস্তত করলো মার্ক। ‘আমি জানি না,’ অবশেষে বললো সে।

‘তোমার আসল ভয়টা কি ছিলো,’ জিজ্ঞেস করলো রানা। ‘পাইটন তোমাকে সরিয়ে দেবেন?’

‘প্রশ্নই ওঠে না,’ বললো মার্ক। ‘আমার বাবা অতো বোকা নয় যে পাইটনের ফাঁদে পা দেবেন। আসল কথা হলো, সব হারিয়ে পথের ভিখিরি হয়ে গিয়েছিল বোনার পাইটন। সে জানতো। ডেকে দাঁড়িয়ে সে আমাকে অভিশাপ দেয়।’

‘তিনি চিৎকার করে উঠেছিলেন কেন?’

হাতের উন্টে পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো মার্ক। ‘সে কেন চিৎকার করবে!’ অবাক হয়ে বললো সে। ‘সম্ভবত আমি চিৎকার

করেছিলাম। ঠিক মনে নেই। পাইটনই বোধহয় আমাকে ঘুসি মারে। তাকে আমি কিছু না বলে ছেড়ে দিই। বুড়ো একজন মানুষের গায়ে আমি হাত তুলতে চাইনি, বিশেষ করে সন খুইয়ে যার মাথা ঠিক নেই।’

‘কিন্তু পাইটনের কেবিনে তো তাকে তুমি ঘুসি মারতে দ্বিধা করোনি।’ বললো রানা। লক্ষ্য করলো, প্রায় চমকে উঠলো মার্ক। ‘ঠিক করে বলো, ডেকে কে কাকে আঘাত করেছিল—তুমি, না পাইটন?’

‘পাইটন, এখন মনে পড়ছে,’ বললো মার্ক। ‘মার খেয়ে আমি চলে আসি।’

‘যার কথা থেকে এ-সব ঘটনা জানা গেছে সে বলছে,’ ধীরে ধীরে বললো রানা, ‘তুমি চলে যাবার পরমুহূর্তে সরাসরি এগোয় সে, গিয়ে দাঁড়ায় পাইটন আর তুমি যেখানে মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে দাঁড়িয়ে-ছিলে। পাইটনকে সে কোথাও দেখেনি।’

‘আমি তো আপনাকে বারবার বলছি, পাইটন সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়ে-ছিল।’ উত্তেজনায় কঁপে গেল মার্কের গলা। গোটা ব্যাপারটা তার দৃষ্টিতে দেখতে বলছে সে। ‘তার আর কোনো আশা ছিলো না। সম্পত্তি নেই, নগদ টাকা নেই, কোম্পানীর শেয়ার নেই, এরপর একজন লোক কিভাবে বাঁচতে চায়? ফলে একমাত্র পুথটাই বেছে নিয়েছে সে।’

‘আমার বাবা আত্মহত্যা করেননি,’ শান্ত গলায় বললো মারিকা।

‘অবশ্যই করেছেন।’ মারিকার দিকে নয়, রানার দিকে তাকিয়ে বললো মার্ক।

ভেনসমের দিকে তাকালো রানা। ‘আর কোনো প্রশ্ন আছে?’ মাথা নাড়লো ভেনসম। মারিকার দিকে ফিরলো রানা। তার ঠোঁট যাত্রা অন্ততঃ-১

পলম্পরের সাথে গৌটে আছে শক্তভাবে, আতংক ভরা চোখের দৃষ্টি  
মার্কের ওপর স্থির। 'ঠিক আছে, মার্ক,' বললো রানা। 'আর কোনো  
প্রশ্ন নেই।'

ধীরে ধীরে দাঁড়ালো সে, যেন চায়নি বা আশা করেনি এভাবে  
তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। কিছু বলার জন্যে মুখ খুললো সে, কিন্তু  
মারিকার সাথে চোখাচোখি হতে তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রোণক  
থেকে বেরিয়ে গেল। রানা উপলব্ধি করলো, এরপর আর মারিকাকে  
বিয়ে করার কথা ভাববে না মার্ক রোসেট। ব্যাপারটা মারিকার জন্যে  
স্বস্তিকর বলে মনে হলোও, আসলে হয়তো তা নয়। মারিকার জন্যে  
অন্য এক ধরনের বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে মার্ক রোসেট।

দরজা বন্ধ হবার পর রানা জিজ্ঞেস করলো, 'আর কাউকে ডাকার  
দরকার আছে কি?' ও ভাবছে, ব্যাপারটা এখন পুলিশকে সামলাতে  
হবে। হয় মার্ক খুন করেছে পাইটনকে, নয়তো পাইটন আত্মহত্যা করে-  
ছেন। মারিকা বলছে, তার বাবা আত্মহত্যা করবেন না। কেউ যদি  
চেনে, মারিকারই তাঁকে চেনার কথা। তাঁর মেয়ে মারিকা। কিন্তু  
জুয়ার সর্বস্ব খুইয়ে বসা একজন লোক কি আচরণ করবে তা কি  
নিশ্চিতভাবে কিছু বলার উপায় আছে?

রানার চিন্তায় বাধা দিলো মারিকা। 'আমি নিক শেডিকে ডাকতে  
চাই,' নিড়বিড় করে বললো সে।

তার দিকে অবাক চোখে তাকালো রানা। 'ডঃ শেডিকে? কেন?'  
জিজ্ঞেস করলো ও। 'ঘটনার সময় কোকুনে তো সে ছিলো না! ছিলো  
কেপটাউনে, আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল।'

'আমার ধারণা, সে বোধহয় কিছু বলতে পারবে,' আর কিছু বললো  
না মারিকা।

‘ঠিক আছে,’ বলে পেরেটের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালো রানা।

আসার পর দেখা গেল, নার্সাস হয়ে আছে নিক শেডি, যেন সে জানতো তাকে ডাকা হবে। মারিকা বললো, ‘নিক, বাবা সম্পর্কে কিছু তথ্য দরকার আমাদের।’ নিক শেডির কথা লাফ দিলো একটা, তবে হাত দুটো স্থির, মারিকার দিকে তাকিয়েও আছে সরাসরি। ‘বাবা কি কোনো সোনার খনির শেয়ার কিনেছিলো?’

‘রাস্তা গোন্ডমাইনের শেয়ার, হ্যাঁ কিনেছিল।’

‘আচ্ছা,’ শান্তভাবে বললো মারিকা। ‘কিনেছিল কর্নেল কাকুর পরামর্শ মতো?’

‘কার পরামর্শে তা আমি জানি না।’

মাথা ঝাঁকালো মারিকা। ‘কথাটা তাহলে সত্যি,’ বিড়বিড় করে বললো সে। ‘ধন্যবাদ।’

ইঙ্গিতে নিক শেডিকে চলে যেতে বললো রানা। কিন্তু চেয়ার ছাড়লেও, দাঁড়িয়ে থাকলো সে, মারিকার নিচু করা মাথার দিকে তাকিয়ে। মেয়েটাকে সাহুনা দিতে চায় সে, রানা তার চোখের ভাষা পড়তে পারলো। লোকটাকে এই মুহূর্তে কুৎসিত লাগলো না। মারিকা মুখ তুলছে না দেখে চলে গেল সে।

‘ডঃ নিক শেডি তোমার বাবার কথা এতো জানে কিভাবে?’ মারিকাকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘নিক আর বাবা খুব ঘনিষ্ঠ ছিলো,’ অক্ষুটকণ্ঠে বললো মারিকা।

‘তুমি সন্তুষ্ট, তোমার বাবা দক্ষিণ আফ্রিকায় জুয়া খেলছিলেন?’

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো মারিকা।

‘ইচ্ছে করলে কর্নেল ওয়াকারকেও ডাকতে পারো তুমি,’ বললো রানা।

‘তার দরকার নেই। নিক আমার কাছে মিথ্যে বললে না।’

ভেনসমের দিকে ফিরলো রানা। সে-ও বললো, ‘আর কাউকে ডাকার দরকার নেই।’

‘বেশ। এবার একমত হওয়ার পালা। প্রথমে মারিক। বলো, তুমি কি ভাবছো?’ জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘তুমি যা ভাববে তার প্রতি আমার সায় আছে, রানা,’ যেন বহুদূর থেকে ভেসে এলো মারিকার গলা।

ফোন বাজতে রিসিভার তুললো রানা। কর্নেল ওয়াকার। জানতে চাইছেন, ওদের কাজ শেষ হয়েছে কিনা। ‘আর পাঁচ মিনিট,’ বললো রানা। ‘বাকি আছে শুধু নিজেদের মধ্যে আলোচনা।’

‘ওড। কাজ শেষ হওয়ারামাত্র আমি চাই ভেনসম যেন সেলুনে চলে আসে। ওর সাথে আপনিও আসবেন। গানাররা সবাই এখানে হাজির হয়েছে।’

রিসিভার রাখার সময় রানা লক্ষ্য করলো, উঠে দাঁড়িয়েছে মারিক। ‘মতামত না জানিয়ে কোথায় যাচ্ছে?’

‘এখানে বসে থাকতে আমার ভালো লাগছে না,’ বললো মারিক। ‘এ-বিষয়ে কথা বলার আর কোনো ইচ্ছে নেই আমার। শিখ, আমাদের ক্ষমা করো। তোমরা যে রায় দেবে আমি তার সাথে একমত।’ রক্ত পায়ে স্মোকরুম থেকে বেরিয়ে গেল সে।

‘কর্নেল আমাদেরকে সেলুনে ডাকছেন,’ বললো রানা। ‘আপনি কি ভাবছেন, বলবেন?’

‘আমার দারগা, এটা একটা পুলিশ কেস। আমরা যতোদূর জানতে পেরেছি, পাইটনকে জীবিত অবস্থায় শেষ দেখেছে মার্ক। ব্যাগারটা হয় খুন, নয়তো আত্মহত্যা।’

‘ফাইন, আমিও তাই ভেবেছি,’ বললো রানা। ‘আমাদের বোধহয় কোনো রায় দেয়া উচিত হবে না। এই তদন্ত কমিটির কোনো আইন-গত ভিত্তি নেই। আমরা শুধু সংগ্রহ করা তথ্যগুলো পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি, ওরা যাতে ওদের ইনভেস্টিগেশনে কাজে লাগাতে পারে।’

‘রায় দিতে না পারাটা খারাপ হলো,’ বললো ভেনসম। ‘কর্নেল ব্যাপারটা পছন্দ করবেন না। জাহাজের লোকদের তিনি শাস্ত করবেন কিভাবে? তবে, আপনার সাথে আমিও একমত, রায় দেয়া সম্ভব নয়। চলুন, কনফারেন্সে ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।’

দীর্ঘ সময় ধরে কষ্ট করে লেখা প্রমোশুর পকেটে ভরে উঠে দাঁড়ালো রানা। ডেকে পৌঁছে থামলো ভেনসম, দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরিয়ে সাদা দীপ্তির দিকে তাকালো। সাদা উজ্জ্বলতা নিচু মেঘের গায়ে প্রতিফলিত হয়েছে নিখুঁতভাবে, চওড়া ও গভীর অনেকগুলো দাগ। ‘দেখছেন?’ বললো সে। ‘অনেকগুলো চওড়া পানিপথ। সব ক’টা দক্ষিণ দিকে গেছে। লক্ষণ ভালোই বলতে হবে।’ বিস্তৃত বরফরাজ্যের মানচিত্র ফুটে আছে মেঘের গায়ে।

ধোঁয়ায় বাপসা হয়ে আছে সেলুনের ভেতরটা। প্রকাণ্ড এক চেয়ারে বসে আছেন কর্নেল ওয়াকার। তাঁকে ঘিরে গোল হয়ে বসেছে ক্যাচারগুলোর ক্যাপটেনরা। সবাই ধূমপান করছে। মেঝেতে এলো-মেলোভাবে পড়ে রয়েছে চাট। মার্ক রোসেটও উপস্থিত। সে তার বাবার কাছাকাছি বসেছে।

‘ক্যাপটেন ভেনসম,’ ওরা বসার পর কর্নেল বললেন। ‘সবাই আমার সাথে একমত হয়েছে, প্যাকের ভেতর দিয়ে দক্ষিণেই যাওয়া হবে। আমাদের ছ’শো মাইল দক্ষিণে খোলা সাগরে পৌঁচেছে সাদার্ন

উইও । এছাড়া তিমির খবর দিয়েছে ওরা ।’

‘তাহলে আমাদেরও দক্ষিণে যেতে হবে,’ ভেনসম বললো । ‘পানি-পত্রগুলো দেখলাম, বেশ চওড়া । অবহাওয়াও চমৎকার ।’

‘গুড । তাহলে সিদ্ধান্ত হয়ে গেল ।’ মেসবয়কে ডেকে ছইন্সি পরিবেশনের নির্দেশ দিলেন কর্নেল । এরপর তিনি চেয়ার ছেড়ে রানার সামনে এসে দাঁড়ালেন । ‘আপনার সাথে একটা কথা ছিলো, মি. রানা ।’ পিছু পিছু বেরিয়ে এসে করিডর হয়ে তাঁর কেবিনে ঢুকলো রানা । দরজা বন্ধ করে দিলেন কর্নেল । ‘এবার বলুন, তদন্ত কমিটি কি জানতে পারলো ।’

প্রমাণ-পত্রগুলো পকেট থেকে বের করে কর্নেলের দিকে বাড়িয়ে দিলো রানা । সেগুলো নিয়ে ডেস্কের দিকে ছুঁড়ে দিলেন কর্নেল । ‘ও-সব পড়ার সময় কোথায় আমার ? কি রায় হয়েছে তাই বলুন । তাড়াতাড়ি করুন, প্লিজ ।’

‘আমরা একটা উপসংহারে পৌঁছেছি,’ বললো রানা । ‘কিন্তু আপনার সেটা পছন্দ না-ও হতে পারে । আমাদের বিশ্বাস, বোনার পাইটনের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা পুলিশ কেস ।’

‘কেন ?’ ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি ।

‘দুটো সম্ভাবনা দেখতে গেয়েছি আমরা,’ বললো রানা । ‘হ্যাঁ বোনার পাইটন আত্মহত্যা করেছেন, নয়তো খুন হয়েছেন ।’

‘বলে যান ।’

‘আপনাকে যে কাগজগুলো দিলাম, সংশ্লিষ্ট সবার সব কথা লেখা আছে ওগুলোয় । প্রথম বন্দরে পৌঁছোনোমাত্র ওগুলো আপনি পুলিশের হাতে তুলে দেবেন ।’

‘মাই গড ! আপনি, ক্যাপটেন ভেনসম এবং মারিকা, তিনজনই  
রানা-১৭০



এ-ব্যাপারে একমত যে এটা একটা মার্ডার কেস অথবা সুইসাইড ?

‘আমি আর ভেনসম একমত,’ বললো রানা। ‘মারিক্স এতো বেশি মুষড়ে পড়েছে যে নিজের কোনো মতামত দিতে পারেনি।’

‘এবং আমার ছেলে... ব্যাপারটার সাথে জড়িত ?’

‘হ্যাঁ,’ বললো রানা। ‘সে-ই শেষবার দেখেছে বোনার পাইটনকে প্রথমে অস্বীকার করলেও, পরে সে স্বীকার করে যে ডেকে পাইটনের সাথে তার তর্ক হয়— সেটা পাইটন অদৃশ্য হওয়ার মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগের ঘটনা। বারোটা পর্যন্ত মিনিটে কুয়াশা সুরে যায়। শেষ পনেরো মিনিট কি ঘটেছে কেউ বলতে পারে না। পাইটন জাহাজ থেকে পড়ে যেতে পারেন, কেউ তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারে।’

‘আই সী !’ ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন কর্নেল ওয়া-কার। ‘তবে ব্যাপারটা আত্মহত্যাও হতে পারে।’

‘তার মেয়ে বলছে, না। মারিক্সার কথা হলো, বোনার পাইটনের পলারনী মনোবৃত্তি কোনোকালেই ছিলো না।’

‘কিন্তু আপনার ধারণা, এটা একটা সম্ভাবনা। কারণ ?’

‘কারণটা আপনারই ভালো জানার কথা।’

‘মানে, কি বলতে চান ?’

‘র্যাণ্ড গোল্ডমাইনের শেয়ার কেনার পরামর্শ দেননি তাঁকে আপনি ?’ জিজ্ঞেস করলো রানা। ‘সর্বস্ব বাজি রেখে জুয়টি খেলেন তিনি, এবং হেরে যান।’

‘র্যাণ্ড গোল্ডমাইনের শেয়ার কিনেছে কে—পাইটন ? এই প্রথম শুনছি আমি। অধিক ব্যাপারে কাউকে পরামর্শ দেয়া আমার স্বভাব নয়, তাতে বন্ধুকে শত্রুতে পরিণত করা হয়।’

ভারমানে বুদ্ধিটা পাইটেন মার্কের কাছ থেকে পেয়েছিল।  
আপনার ছেলে সে-কথাই বললো।’

‘আই সী।’ চেয়ার ছেড়ে একটা শোর্টহোলের সামনে  
দাঁড়ালেন কর্নেল। টয়লেট কেবিনেটের মাথায় আঙুল নাড়িয়ে  
তাকিয়ে আছেন সাগরে। অনেকক্ষণ পর রানার দিকে ফিরলেন তিনি  
ক্লান্ত দেখালো তাঁকে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে বয়স যেন  
বহর বেড়ে গেছে। ডেস্কের পিছনে বসে প্রমাণপত্রগুলো টেনে  
নিজের সামনে, পড়তে শুরু করলেন।

পড়া শেষ হলো এক সময়, মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল  
কর্নেল। ‘ঠিকই আছে, মিঃ রানা,’ বললেন তিনি। ‘আমি এক  
পুলিশ কেসই বটে। কিছু পরিবর্তন এখন জরুরী হয়ে দেখা দিয়ে  
আসুন।’

সেলুনে ফিরে এলো ওরা। একজন ক্যাপটেন রানা আর কয়েক  
ছইকি পরিবেশন করলো। নিজের চেয়ারে বসেছেন কর্নেল,  
হাবডাব লক্ষ্য করে থমকে গেছে সবাই। একে একে উপস্থিত  
দিকে তাকালেন তিনি, শুধু মার্ককে বাদ দিয়ে। ‘কমাও কিছু  
বর্তন ঘটতে যাচ্ছে,’ ঘোষণার সুরে শুরু করলেন। ‘বোনার  
মারা যাওয়ায় অভিজ্ঞ লিডার নেই আমাদের। আমি যেহেতু এক  
উপস্থিত, এবং পুরোটা মোস্তম থাকবে। বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কমা  
সমস্ত অপারেশন আমিই পরিচালনা করবো। পিটারসেন, মার্কের কাছ  
থেকে দায়িত্ব বুঝে নাও তুমি, ফ্যাক্টরি শিপ কোকুনের ম্যানেজার  
করা হলো তোমাকে।’ বিষয়সূচক গুঞ্জন উঠলো চারদিক থেকে, থম  
হয়েছে সবাই। ‘কমাওর মাসুদ রানা, পিটারসেনের জায়গায় আপনি  
কে লিবাটি-ফোর-এর ক্যাপটেন করা হলো।’

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে রানা বললো, 'কিন্তু, মিঃ ওয়াকার, গানার হিসেবে আমার যে কোনো অভিজ্ঞতা নেই ?' লক্ষ্য করলো, বয়স্ক ক্যাপটেন পিটারসেন খুঁকে পড়লো কর্নেলের দিকে, চেহারায় দ্বিধা।

রানাকে কর্নেল বললেন, 'আপনাকে সাহায্য করার লোকের অভাব হবে না।' তারপর তিনি পিটারসেনের দিকে ফিরলেন। 'জানি তুমি কি বলতে চাও। কিন্তু এতো কমবয়েসী একটা মেয়েকে আমি ক্যাচারের কমাণ্ড দিতে পারি না। মিঃ রানাই নেতৃত্ব দেবেন, তোমার মেয়ে তার বর্তমান পজিশনে মেট হিসেবেই থাকছে। গানার হিসেবেও কাজ করবে সে। দুটো দায়িত্ব, কাজেই বেতন ও লাভের টাকা দুটোই বাড়বে তার। খুশি ?'

'খুশি, অনারেবল ডিরেক্টর। আমি সন্তুষ্ট।'

'ওউ। মার্ক, তুমি লিবার্টি-থ্রুর কমাণ্ডে থাকবে। এই মুহূর্তে জাহাজে কোনো ডেক অফিসার নেই, তোমার ইচ্ছে মতো যাকে খুশি বেছে নিতে পারো।' আবার তিনি পিটারসেনের দিকে তাকালেন। 'এখন থেকে আমি তোমার ওপর নির্ভর করবো, আর যেন স্যাণ্ডেফিওর্ড আর টনসবার্গের লোকদের মধ্যে কোনো গোলমাল না বাধে। ছ'হুয়ার বেশি পেরিয়ে গেছে, তিসি মারা পড়েছে মাত্র একশোর কিছু বেশি আমরা যদি পুঁথিয়ে নিতে না পারি...'

কর্নেলের কথা শুনে পাচ্ছে না রানা, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মার্কের দিকে। বাবার সিদ্ধান্ত শুনে কঁকড়ে যেন ছোটো হয়ে গেছে সে। কিন্তু চোখে হিংস্র স্বাপদের দৃষ্টি, গা শিরশির করে উঠলো রানার, সরাসরি ওর দিকেই তাকিয়ে আছে সে। সৰু, মেয়েলি চোখ দুটো থেকে যেন অদৃশ্য আগুন বেরুচ্ছে।

একটা ঝাঁকি খেয়ে সংবিৎ ফিরলো রানার। ক্যাপটেন সাঙিয়ে  
একটা প্রশ্ন করেছে, 'বোনার পাইটনের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত কি শেষ  
হয়েছে, অনারেবল কর্নেল ওয়াকার ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিয়ে চট করে একবার রানার দিকে তাকানো  
কর্নেল।

'তদন্ত কমিটির রিপোর্ট কি তাহলে এখন আমরা জানতে পারি ?'

'এখনো সেটা টাইপ করা হয়নি,' বললেন কর্নেল। 'কাল প্রকাশ  
করা হবে।' আর কোনো প্রশ্নের সুযোগ না দিয়ে কাজের কথায় চি-  
গেলেন তিনি। 'তাহলে সব ঠিক হয়ে গেল। তোমরা যে-যার ক্যাচাট  
ফিরে যাওয়ামাত্র রওনা হবো আগরা।' ক্যাপটেনরা সবাই চেয়ার  
ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, তারা বেরিয়ে যাবার পরও নিজের চেয়ারে নি-  
দাঁড়া খাড়া করে বসে থাকলেন কর্নেল। সবার শেষে রানাও দরজার  
দিকে পা বাড়াতে যাবে, ইঙ্গিতে তাকে কাছে ডাকলেন তিনি  
আগেই লক্ষ্য করেছে রানা, জুব্বু হুয়ে এখনো নিজের চেয়ারে বসে  
আছে মার্ক। 'মিঃ রানা,' কর্নেল নরম সুরে বললেন, 'আমি চাই  
আপনি উপলক্ষি করুন, তিনি শিকারই এই অভিযানের প্রথম বিবেচ  
বিষয়।'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'তিনি শিকার এবং আইনকে নিজের পথে  
চলতে দেয়া।'

'আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত,' সায় দিয়ে বললেন কর্নেল।  
'কিন্তু এই মুহূর্তে যেহেতু আমরা সত্যতা থেকে অনেক দূরে রয়েছি,  
আইনের কাজকর্ম স্থগিত না রেখে উপায় নেই, তাই না? আমি যেটা  
বলতে চাইছি, ক্যাপটেন আর জুদের মনে শান্তি না থাকলে, শিকার  
ব্যর্থ হতে বাধ্য। ওদেরকে উত্তেজিত করে এমন কোনো কথা কেউ

প্রচার করবেন না, এটাই আমি আশা করি। আপনাকে আমি ব্যক্তি-  
গতভাবে কথা দিচ্ছি, বোনার পাইটনের নিখোঁজ হওয়া সংক্রান্ত সমস্ত  
তথ্য, আপনাদের রিপোর্ট সহ, প্রথম সুযোগেই পুলিশের হাতে তুলে  
দেয়া হবে। ইতিমধ্যে আমি যদি কোনো সিদ্ধান্ত নিই, ক্যাপটেন  
ভেনসমের পূর্ণ সমর্থন থাকবে তাতে। ঠিক আছে ?

‘হ্যাঁ।’ দরজার দিকে এগোলো রানা।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো মার্ক। ‘আমাকে একটা টোইং শিপের দায়িত্ব  
দেয়া হলো কেন ?’ গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো সে। ‘আমাকে  
এভাবে অপমান করার কি কারণ ?’

ছেলের দিকে তাকালেন কর্নেল। ‘কারণটা তুমি জানো, মার্ক।’

‘কিন্তু তোমার বন্ধু পাইটন আত্মহত্যা করেছে। এটাই একমাত্র  
ব্যাখ্যা। তার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছিল। জুয়া খেলতে গিয়ে সব হারিয়ে  
বসে লোকটা। এই অবস্থায় আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো পথ ছিলো  
তার ? রানাকেও কথাটা আমি বোঝাবার চেষ্টা করেছি। ক্যাপটেন-  
দের তুমি সত্যি কথাটা কেন বোঝাতে চেষ্টা করলে না ? পাইটন  
ভিথিরি হয়ে গিয়েছিল শুনলে তারাও মেনে নিতো যে এটা একটা  
আত্মহত্যার কেস।’

‘আমি যা ভালো বুঝছি তাই করছি, মার্ক,’ রাগতস্বরে বললেন  
কর্নেল, সেলুনের ভেতর তাঁর কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠলো।

‘তুমি একটা দুর্বল লোক।’ চিংকার জুড়ে দিলো মার্ক। তার চোখ  
দুটো বিফারিত হয়ে গেল। ‘তোমার সম্ভাবই হলো...’ থরথর করে  
কাঁপছে সে, ‘...চোখ উন্টে নেয়া। নিজের সুবিধেমতো লোকজনকে  
মাথায় ওপর তোলা, অসুবিধে হলে ছুড়ে ফেলে দাও। ভেবেছো  
তোমাকে আমি চিনি না ? তুমি একটা...।’

‘মুখ সামলে, মার্ক !’ গর্জে উঠলেন কর্নেল । ‘আর একটা কথা যদি বলো, তোমাকে আমি লোহার খাঁচার ডরে কেপটাউনে পাঠিয়ে দেবো ।’ পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে খুললেন তিনি, ভেতর থেকে একটা কাগজ নিয়ে বাড়িয়ে দিলেন ছেলের দিকে । ‘পড়ো এটা ।’

‘নির্দেশমতো সমস্ত কার্গো খালিস করা হয়েছে,’ পড়লো মার্ক, কুঁচকে উঠলো ভুরু জোড়া ।

‘ওটা একটা রেডিও মেসেজের কপি, খ্রীস্টমাস ইভ-এ রিসিভ করে পাইটন । কেপটাউন থেকে নিক শেডি পাঠিয়েছিল ।’

‘এর অর্থ কি ?’

‘কয়েক মিনিট চিন্তা করে দেখো, অর্থটা পরিষ্কার হয় কিনা,’ বলে রানার দিকে ফিরলো কর্নেল । ‘মিঃ রানা, আপনার প্রতি আমার অহরোধ, যা কিছু আপনি শুনলেন, সব আপনার ভেতর চাপা থাকবে । আপনাকে আমি আবারও বলছি, পরিণতি যাই হোক, পাইটনের মৃত্যু-রহস্য সম্পর্কে সব কথা পুলিশকে আমি অবশ্যই জানাবো । বন্দরে ফেরা মাত্র । এবার, শ্রদ্ধা, আপনি আপনার জাহাজে যেতে পারেন ।’

রানা ঘুরতে যাবে, কর্নেল আবার বললেন, ‘নিক শেডিকে আপনার জাহাজে পাঠিয়ে দিচ্ছি । ফ্যাক্টরি শিপে তার না থাকাই ভালো । অস্থির লোক সে, বিশেষ করে মদ খাওয়া অবস্থায়...’ খানিক ইতস্তত করে কাঁধ ঝাকালেন তিনি, তারপর বিড়বিড় করে বলেই ফেললেন, ‘বোনার পাইটন ওর বাবা ছিলো ।’

‘বোনার পাইটন, নিক শেডির বাবা ?’ অবাক হলো রানা, দেখলো বিস্ময়ের ধাক্কাটা মার্ককেও লেগেছে ।

‘হ্যাঁ,’ বললেন কর্নেল ওয়াকার । ‘পাইটনের প্রেমিকা আরেক

লোকের প্রেমে পড়ে, তখন সে গর্ভবতী। বাচ্চা প্রসব হবার পর দ্বিতীয় লোকটাকে বিয়ে করে মেয়েটা। সেজন্যেই ভাবছি, নিক শেডির কোনো একটা ক্যাচারে থাকা উচিত। এরিকা পিটারসেন হয়তো সুন্দরী নয়, তবে অত্যন্ত দক্ষ ফার্স্ট মেট সে।

এই মুহূর্তে এ-ধরনের শুকনো একটা রসিকতা করতে পারলেন দেখে রানা ভাবলো, পাইটনের মৃত্যুতে কর্নেল আদৌ কোনো আঘাত পেয়েছেন কিনা। যে-লোক ভূয়া স্বর্ণখনির শেয়ার কেনাবেচার সাথে জড়িত থাকতে পারে, তার পক্ষে সবই সম্ভব। করিডরে বেরিয়ে এসে হাঁটছে রানা, পিছনে দরজা খোলা ও বন্ধ হবার আওয়াজ শুনতে পেলো। ওরা যেন সন্দেহ করেছিল, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ওদের কথা রানা শুনছে।

## আট

সরাসরি নিজের কেবিনে ফিরে এলো রানা। মারিকা ওর বাজের ওপর বসে রয়েছে, মেঝেতে পায়চারি করছে ডঃ নিক শেডি। 'দরজা বন্ধ করে দিন, মিঃ রানা,' পায়চারি থামিয়ে বললো শেডি। উত্তেজিত হয়ে আছে সে : মারিকার বসার ভঙ্গিটাও আড়ষ্ট।

দরজা বন্ধ করে রানা জানতে চাইলো, 'কিছু ঘটেছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে মারিকা বললো, 'সব কথা ওকে বলো, নিক ।'

'আপনি কথা দিন, যা শুনবেন কেউ তা জানবে না !' রুদ্ধশ্বাসে শর্ত দিলো নিক শেডি ।

'দিলাম ।'

'নো অফেন্স, মিঃ রানা—আপনাকে কতোটুকু বিশ্বাস করা যায় আমি জানি না । শুধু মারিকা বলছে, তাই আপনাকে জানাচ্ছি...,' কথা অসমাপ্ত রেখে আবার পায়চারি শুরু করলো সে । লোকটা যে শুধু উত্তেজিত তাই নয়, তার মুখভঙ্গিতে হিংস্র একটা ভাবও লক্ষ্য করলো রানা । মারিকার পাশে, বাজের ওপর বসলো ও, তাকিয়ে আছে নিক শেডির দিকে । এ যেন একটা পণ্ডর সিদ্ধান্তের জন্যে অপেক্ষায় থাকা, ভাবছে, তোমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করবে কিনা ।

এক সময় পায়চারি থামিয়ে রানার সামনে দাঁড়ালো নিক শেডি । 'মার্ক বলছে, বোনার পাইটন নিঃশ্ব হয়ে গিয়েছিলেন, তাই না ?'

'হ্যাঁ ।'

'এটার ওপর ভিত্তি করেই ধারণা কর হচ্ছে যে বোনার পাইটন আত্মহত্যা করেছেন ?'

মাথা ঝাঁকালো রানা ।

'এটাই একমাত্র ভিত্তি ?'

'হ্যাঁ ।'

'যদি প্রমাণ হয়, বোনার পাইটন সর্বশ্ব খোয়াননি, তারমানে দাঁড়াবে মার্ক রোসেট তাঁকে খুন করেছে ?'

'আমাদের হাতে যে-ধরনের প্রমাণ ইত্যাদি আছে, সেটা ধরে নেয়া অন্যায্য হবে না,' সতর্কতার সাথে বললো রানা, বুঝতে পারছে না কোন্‌দিকে যাচ্ছে নিক শেডি ।



এতো উত্তেজিত যে গলা ভেঙে গেল নিক শেডিং, 'সে-কথাই  
এতোকণ আমি মারিকাকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম। বোনার পাই-  
টন যদি ধনী হন, তাহলে তিনি মার্কের হাতে খুন হয়েছেন, কুয়াশার  
রুগোগ নিয়ে জাহাজ থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়া হয়েছে তাঁকে।'

'ঠিক কি বলতে চাও তুমি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'কারণটা কি মনে করেন, কেন আমাকে কেপটাউনে রেখে আসা  
হয়েছিল?'

'ওনেছি তুমি অসুস্থ ছিলে।'

'সেটা তো স্রেফ একটা অজুহাত। কেপটাউনে আমি রয়ে গিয়ে-  
ছিলাম বোনার পাইটনের স্বার্থ দেখার জন্যে। মার্ক একটা পর্যায় পর্যন্ত  
ঠিকই বলেছে—সমস্ত কিছু বাজি রেখে জুয়া খেলেছিলেন বোনার  
পাইটন। এমন কি পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর সব ক'টা শেয়ারও  
তিনি বন্ধক রেখেছিলেন ওয়াকার রোসেটের কাছে। ওয়াকার রোসেট  
সেগুলো রাখতে দেয় তার জ্বর কাছে।' ঘণায় বিকৃত হয়ে উঠলো  
নিক শেডিং কুংসিত চেহারা। 'মায়ের কাছ থেকে শেয়ারগুলো নিয়ে  
বেচে দেয় মার্ক, নগদ টাকা দিয়ে সে-ও ওই একই জুয়া খেলে—র্যাও  
গোল্ডমাইনের শেয়ার কেনে।'

'ভারমানে কি বোনার পাইটন ও মার্ক রোসেট, হ'জনেই ওরা  
ভুবেছে?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'আমি ওনেছি, র্যাও গোল্ডমাইন  
ভুয়া একটা কোম্পানী।'

'হ'জনের একজনও ভোবেনি, তবে রোসেট পরিবার নিজেদের জন্যে  
ভয়ংকর একটা বিপদ ডেকে এনেছে,' বললো নিক শেডি। 'বোনার  
পাইটন টাকা-পয়সার ব্যাপারে খুব একটা চালাক-চতুর ছিলেন না,  
সত্যি কথা। নিজেও সেটা জানতেন তিনি, তাই অত্যন্ত সতর্ক থাক-

তেন । র্যাণ্ড কোম্পানীর শেয়ার কেনার পরামর্শটা মার্কের তরফ থেকে আসায়, তাঁর মনে সন্দেহ দেখা দেয় । তবু কেনেন, কারণ খবর পান মার্কও প্রচুর শেয়ার কিনেছে । শেয়ারের দাম তখন হু হু করে চড়ছিল । শেয়ার কেনার পর বাজারের ওপর নজর রাখার জন্যে আমাকে কেপ-টাউনে থেকে যেতে বলেন তিনি । আমি শেয়ারের ব্যাপার ভালো বুঝি না, তাই অভ্যস্ত নামকরা একটা এজেন্সির পরামর্শ গ্রহণ করি । তারা আমাকে সময় থাকতে সব শেয়ার বিক্রি করে দেয়ার বুদ্ধি দেয় । আমি দেরি করিনি । সমস্ত শেয়ার তিনগুণ দামে বিক্রি করার পর বোনার পাইটনকে টেলিগ্রাম পাঠাই—

‘নির্দেশমতো সমস্ত কার্পো খালাস করা হয়েছে,’ বললো রানা, গোটা ব্যাপারটা বোধগম্য হতে শুরু করেছে এতক্ষণে ।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালো নিক শেডি । ‘আপনি জানলেন কিভাবে ?’

কিভাবে জেনেছে বললো রানা ।

‘তারমানে বুড়ো কর্নেল জানে !’ হেসে উঠলো নিক শেডি । ‘আত্ম-রাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গেছে তার ।’ রানার একটা বাহু আঁকড়ে ধরলো সে । ‘বোনার পাইটন কোটিপতি ছিলেন । কাজেই তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন না ।’

কি বলবে বুঝতে পারলো না রানা ।

‘আপনি বুঝতে পারছেন না, কি ঘটেছে ?’ রানাকে ঝাঁকি দিলো নিক শেডি । ‘মার্ক রোসেট খোলা ডেকে দাঁড়িয়ে বোনার পাইটনকে জানায়, জুয়ায় হেরে গেছেন আপনি, ধ্বংস হয়ে গেছেন । তার কথা শুনে মুচকি হাসেন বোনার পাইটন, জানান, কোম্পানীটা লালবাতি দ্বালার আগেই তিনি তাঁর সব শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছেন, এখন

তিনি বিপুল টাকার মালিক। শুণু তাই নয়, মার্ককে তিনি বলেন, আমার বন্ধক রাখা শেয়ারগুলো তোমরা বেঅস্থিতির ভাবে খোলা বাজারে বিক্রি করে দিয়েছো, জানো না সেগুলো আগুই কিনে নিয়েছি। ফলে তোমরা ওগুলো আমাকে ফেরত দিতে পারছো না। এর অর্থ কি থাকেন আপনি, মিঃ রানা ?

‘না।’

‘বন্ধক রাখা শেয়ার নির্দিষ্ট সময়সীমার ভেতর চাইলে ফেরত দিতেই হবে, বন্ধকের সময় সেই চুক্তিই হয়েছিল,’ বললো নিক শেডি।

ফেরত দিতে না পারলে ওরা নিজেদের শেয়ারগুলো বোনার পাইটনের হাতে তুলে দিতে বাধ্য থাকবে—সম পরিমাণ শেয়ার। তারমানে পোলার হোয়েলিং কোম্পানীতে ওদের প্রায় কোনো স্বার্থই আর থাকবে না। ডেকে দাঁড়িয়ে সে-কথাই মার্ককে বলেন বোনার পাইটন বলেন, তুমি বা তোমার বাবা, ছ’জনের কেউই কোম্পানীর কোনো কাজে পা রাখতে পারবে না। এরপরই তাকে ধাক্কা দিয়ে লাগরে কেল দেয় মার্ক।

‘এ-সব কথা তুমি তদন্ত কমিটিকে জানাওনি কেন ?’ জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘এখনো নিজের অধিকার বুকে নেয়ার অবস্থায় পৌছোয়নি মার্কি, তাই সব কথা চেপে রাখার সিদ্ধান্ত নিই আমি,’ বললো নিক শেডি।

‘আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন, কাউকে কিছু বলবেন না। ছেলের হারামীপনা সম্পর্কে বুড়ো হয়তো কিছুই জানে না। গুনলাম সে নাকি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ক্যাপটেনদের জানাতে রাজি হয়নি ?’

‘তবে আমাকে কথা দিয়েছেন, সমস্ত তথ্য পুলিশের হাতে তুলে দেবেন।’

হো হো হা হা করে হাসতে শুরু করলো নিক শেডি। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে সে বললো, ‘অপেক্ষা করুন, অপেক্ষা করুন! নিজের চোখেই সব দেখতে পাবেন। গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের কোনো জাহাজে চড়িয়ে কেপটাউনে পাঠিয়ে দেয়া হবে। ক্যাপটেন ভেনসম আর সেক্রেটারীকে বোঝানো হবে, নিন্দাসূচক প্রচারণা কোম্পানীর জন্যে মঙ্গলজনক নয়, কাজেই মুখ বন্ধ রাখলে নিজেদের ভালো করবে তারা। কোনো সন্দেহ নেই, গোটা ব্যাপারটা খামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হবে। সেজন্যেই রূপ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। আমার আস্ত্রিনের ভাঁজে আরো একটা হাতিয়ার আছে, মিঃ রানা।’

নিক শেডি চলে যাবার পর হাতব্যাগ থেকে বের করে রানাকে একটা বড়সড় খাম দিলো মারিকা। ‘দেখো।’ খামটা খুলে কয়েকটা ফটো হাতে নিলো রানা। মার্ক রোসেট আর মারিকা পাইটনের ফটো। একটা ফটোতে দেখা গেল, সৈকতে রয়েছে ওরা—বিকিনি পরা মারিকা ছুটছে, তার পিছনে তাড়া করে ছুটছে মার্ক। দ্বিতীয় ফটোটা বেডরুমে তোলা। বিছানার কিনারায়, দেয়ালের দিকে সরে যাবার চেষ্টা করছে মারিকা, পরনে মিনিস্কার্ট, তার নগ্ন দুই উরু ধরে নিজের দিকে টানছে মার্ক। তৃতীয় ফটো, মারিকার কোমল চেহারায় আড়ষ্ট হাসি। শেষ ফটোয় দেখা যাচ্ছে, একটা সোফার ওপর মারিকাকে শুইয়ে দিয়েছে মার্ক, বুক দিয়ে তার বুকে চাপ দিচ্ছে, চেষ্টা করছে চুমো খাবার—জিভ বের করে তাকে ভেঙাচ্ছে মারিকা।

উন্টোপিঠের লেখাগুলোও পড়লো রানা, তারপর মুখ তুললো। ‘তেমন আপত্তিকর ছবি বলা যায় না, ব্যাকমেইল করার জন্যে অবশ্যই যথেষ্ট নয়। এগুলো প্রকাশ করে দেয়ার ভয় দেখিয়েছিল মার্ক তোমাকে?’

হাতব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করলো মারিকা, বললো, 'এটা পড়ো, মার্কের লেখা।'

ছোট্ট একটা চিরকুট, মার্ক লিখেছে, 'তোমার জিনিস তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম। দেরিতে হলেও বুঝেছি, প্রেমের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি চলে না। তোমাকে আপন করে পাওয়া আমার জীবনের একটা সাধনা, সে সাধনা থেকে কখনোই আমি বিচ্যুত হবো না। অপেক্ষা করবো কবে তোমার দরা হয়। ইতি, তোমার একান্ত অনুরাগত, মার্ক।'

'আমার ভয় করছে, রানা,' ফিসফিস করে বললো মারিকা। 'এ মার্ককে আমি চিনি না। এতোটা নত আর নরম হতে পারে সে, ভাবাই যায় না।'

মারিকার মতো রানাও বিপদের আশংকা করছে। কিন্তু মেয়েটা ভয় পাবে ভেবে প্রসঙ্গটা চেপে গেল। জিজ্ঞেস করলো, 'কি সিদ্ধান্ত নিয়েছো, প্যাক আইসে ঢোকার সময় তুমি কি ফ্যাক্টরি নিপেই থাকবে?'

'নিক বলছে, সেটা উচিত হবে না। তুমি কি বলো, রানা?'

'আমারও তাই মনে হয়।'

আধ ঘণ্টা পর স্মার্টকেস হাতে ডেকে বেরিয়ে এলো রানা। বাতাসের গতি বেড়েছে, হিংস্র জানোয়ারের সাদা দাঁতের মতো লাগলো ঠাণ্ডা পানির গায়ে ফেনাগুলো। গ্যাঙওয়ার মাথায় ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল নিক শেডি। 'জানেন তো, সমস্ত বামেল দূরে ঠেলে দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।' ওকে দেখেই জিজ্ঞেস করলো সে।

'তোমার কথা জানি, আর কার কথা বলছো?'

‘মারিকা,’ বললো নিক শেডি। ‘ওই দেখুন না !’

গ্যাঙওয়ার শেষ মাথায় তিনটে বোট রয়েছে, একটা এইমাত্র রওনা হয়ে গেল। মেটার গটার্নে বসে রয়েছে মারিকা। তার পাশেই আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল সাভিককে।

‘সাভিকের ক্যাচারে থাকছে মারিকা ?’ বিস্মিত হলো রানা, মনও একটু খারাপ হয়ে গেল।

‘বুঝতে পারছেন না, মারিকা এখন বিরাট ধনী ! পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর চাবি এখন মারিকার হাতে। এ-কথা জানার পর একজন লোককে খুন করেছে মার্ক, ভেবেছেন দ্বিতীয় খুন করতে তার হাত কাপবে ? আমিই ওকে বলেছি ...।’

‘কাজটা ভালোই করেছে মারিকা,’ মনে মনে নিক শেডির বুদ্ধি-মস্তার প্রশংসা করলো রানা। ‘তবে ওর উচিত ছিলো আমাদের সাথে থাকা।’

বোটে চড়ে রওনা হলো ওরা। সামনে লিবার্টি-ফোর। মাথা থেকে অন্যান্য চিন্তা ধীরে ধীরে মুছে গেল রানার। প্যাক আইসে ঢোকা মানে বিপদের ঝুঁকি নেয়া। একটা জাহাজের কতৃষ্ দেয়া হয়েছে ওকে। হারপুন গান ছুঁড়ে তিনি শিকার করতে হবে, যুদ্ধ করতে হলে প্রকৃতির সাথে। একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করলো ও। এ-ধরনের রোমাঞ্চের প্রতি জন্মগত দুর্বলতা রয়েছে ওর।

জাহাজে ওঠার পর ওকে অভ্যর্থনা জানালো ডাক পিটারসেন। ‘আপনি মুমা-র ট্রেনিং পেয়েছেন শুনে বিরাট একটা স্বস্তিবোধ করছি, মিঃ রানা। আমি জানি আপনার হাতে আমার জাহাজ ভালো থাকবে।’

‘ধন্যবাদ।’

‘আমার মেয়ে, এরিকা,’ নামটা শুনে ঘুরে দাঁড়ালো বিশাল একটা শরীর, এতোক্ষণ তাকে দেখেও মেয়ে বলে চিনতে পারেনি রানা। মুখে দাড়ি-গোফ নেই, বুক আর নিতম্বের দিকটা অসম্ভব চওড়া, এই তিনটে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য না করলে এরিকা পিটারসেনকে মেয়ে বলে মনে হবে না। চব্বির একটা ডিপো বলা যায় তাকে, নাকটা এতো চ্যাপ্টা যে প্রায় না থাকারই মতো। ‘সুন্দরী, তাই না?’

ঘুসি তুলে বাপের দিকে ছুটে এলো এরিকা। রানার পিছনে লুকালো ডাফ পিটারসেন। এ-থেকেই বাপ-মেয়ের মধুর সম্পর্কটা আঁচ করতে পারলো রানা। করমর্দন করার সময় এরিকার হাত ছুটে লোহার মতো শক্ত লাগলো। ‘আপনাকে নিক শেডির কেবিনে থাকতে হবে, মিঃ রানা, স্যার।’

‘আমার আপত্তি নেই,’ বললো রানা, ‘শেডি যদি তার হুইস্কির শেয়ার দেয়।’

সহাস্যে হাতের বাজ ছুটে দেখালো নিক শেডি। ‘এগুলোর একেক-টার বারোটা বোতল আছে, দু’জনে খেয়েও শেষ করতে পারবো না।’

‘চলুন, ক্যাপটেন,’ রানাকে বললো এরিকা। ‘আপনাকে জাহাজটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনি।’ জুদের সাথে রানার পরিচয় করিয়ে দিলো সে।

জাহাজটা সরু, ঘন্টার সাড়ে তেরো নট ছুটে পারে। লিবার্টি-থ্রির চেয়ে আকার-আয়তনে বেশ অনেকটা ছোটো। বো-র কাছে একটা প্ল্যাটফর্মের ওপর রয়েছে ভয়ংকরদর্শন হারপুন গান। গান প্ল্যাটফর্মের সাথে ত্রিভুজের যোগাযোগ রক্ষা করছে একটা কার্টওয়াক। চেইন লকার-এর সামনে একটা হোল্ড রয়েছে, তাতে এক জোড়া পীচশো ফ্যাদাম কয়েল। এগুলো হোয়েল লাইন, ডেকের উইন্ডের

সাথে সংযুক্ত। হোল্ডের সামনে এঞ্জিন রুম। তারপর কুদের কোয়ার্টার। ব্রিঞ্জের কাছাকাছি ক্যাপটেনের কেবিন, তার নিচে গ্যালি আর মেসরুম।

ব্রিঞ্জে ফিরে আসার পর রানা দেখলো, বিদায় নেয়ার জন্যে তৈরি হয়েছে ডাক পিটারসেন। রানার পিঠ চাপড়ে শুভেচ্ছা জানালো সে। ‘আমার মেয়েটাকেও আপনার হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি,’ রসিকতা করে বললো সদ্য পদোন্নতি পাওয়া ফ্যাক্টরি শিপ কোকুনের ম্যানেজার। ‘একটা ব্যাপারে আমি সব সময় নির্ভর থাকি, কোনো পুরুষের দ্বারা আমার মেয়ের কোনো ক্ষতি হবার আশংকা নেই—এতোই সুন্দরী ও।’

এবার ঘুসি তুলে ছুটে এলো না, তবে জিভের ডগা বের করে বাপকে ভেঙে দিলো এরিকা। ‘বুঝলেন ক্যাপটেন, নিজেকে লোকটা কেউকেটা মনে করছে। বোনার পাইটনের নখের যোগ্যও নয়, অথচ হয়ে বসেছে কোকুনের ম্যানেজার। কাজ দেখাতে না পারলে চাকরি নষ্ট হয়ে যাবে, মনে থাকে যেন। আবার বেশি কাজ দেখাতে গেলে শরীর বেঁকে বসবে। সাবধান।’

‘দেখেছেন, ক্যাপটেন?’ সহাস্যে বললো ডাক পিটারসেন, গ্যাঙওয়ে ধরে নেমে যাচ্ছে সে। ‘কুৎসিত বলে ওকে আমি ছুঁচোখে দেখতে পারি না, অথচ আমাকে কি রকম ভালোবাসে ও!’

বোটে গিয়ে চড়লো ডাক পিটারসেন। রানার পাশ থেকে বিড়বিড় করে এরিকা বললো, ‘এই প্রথম বিচ্ছিন্ন হলাম আমরা। অ্যান্টার্কটিকায় যতোবার এসেছি, সব সময় একই জাহাজে ছিলাম আমরা।’

‘ঘাবড়াবার কিছু নেই,’ বললো নিক শেডি। ‘তোমার বাপের বদলে আরেকজন আছে এখানে।’



আরো অনেক পরে বুঝতে পারবে রানা, কার কথা বোঝাতে চেয়েছে নিক শেডি ।

ও ডিজেস করলো, 'এ-পর্যন্ত ক'টা তিমি মারা পড়েছে ?'

'মাত্র বাইশটা,' মান গলায় বললো এরিকা ।

'চিন্তার কিছু নেই, আমরা সংখ্যাটা বাড়িয়ে নেবো,' আশ্বাস দেয়ার সুরে বললো রানা ।

একটা ঝাঁকি খেলো ও, প্রকাণ্ড হাত দিয়ে ওর পিঠ চাপড়ে দিয়েছে এরিকা । পিঠ চাপড়াবার এই স্বভাবটা সম্ভবত বাপের কাছ থেকে পেয়েছে সে । নিজেকে সাবধান করে দিলো রানা, সতর্ক থাকতে হবে । আচমকা এ-ধরনের ঝাঁকি খেলে হার্টের ব্যারোটা বাজবে ।

ওরা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, লিবার্টি-থ্রু থেকে একটা বোট এসে ভিড়লো জাহাজের গায়ে । একজন মাত্র আরোহী নামলো বোট থেকে । গ্যাঙওয়ে বেয়ে উঠে আসছে ওয়েজনার, লিবার্টি-থ্রুর চীফ এঞ্জিনিয়ার । লোকটাকে চেনে রানা, তাই ওকে ডেকে নিয়েছে লিবার্টি-ফোর-এ ।

সাড়ে আটটার দিকে বার কয়েক ঘন ঘন ফ্যাক্টরি শিপ কোকুনের সাইরেন বাজলো । জাহাজটার পিছনে টগবগ করে ফুটতে শুরু করলো পানি । রানা নির্দেশ দিলো, 'হাফ অ্যাহেড !'

সবগুলো ক্যাচার, লিবার্টি-ফোর সহ, মাদার শিপ কোকুনের পিছনে দীর্ঘ এক লাইনে রওনা হয়ে গেল ।

সেদিন রাত এগারোটায় মুক্ত হলো আকাশ । সূর্যকে দেখা গেল প্রায় দক্ষিণে, হলুদ আগুনের শিখা নিয়ে গোল একটা বল, নিচের কিনারা দিগন্তরেখা ছুঁই ছুঁই করছে । স্টারবোর্ড সাইডে টাওয়ার আকৃতির একটা আইসবার্গ, গায়ে রোদ মেখে আগুন ছড়াচ্ছে প্রকাণ্ড

একটা হীরের মতো। জাহাজ বহরের আশপাশ দিয়ে ভেসে যা-  
বরফের ছোটো-বড় টুকরো, বেশিরভাগই ডুবে আছে পানির তলায়।  
ওদের সামনে অলগা প্যাক আইস বিস্তৃত হয়ে আছে সীমাহীন।  
নিচু লালচে প্রান্তরের মতো, মিশেছে গিয়ে সরাসরি সূর্যের গারে  
মাতানো সুন্দর, রোমাঞ্চকর একটা দৃশ্য।

‘এতো সুন্দর দৃশ্য আগে কখনো দেখেছেন, ক্যাপটেন?’ উ-  
জ্জ্বল রানার একটা বাহু আঁকড়ে ধরলো এরিকা পিটারসেন।  
আর নিক শেডির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে। ‘আমরা দক্ষি-  
বাচ্ছি, আপনি খুশি, স্যার?’

মুহূর্তে মাথা ঝাঁকালো রানা। কিন্তু ওর মনোযোগ নিক শেডি  
ওপর। প্যাক আইসের দিকে তাকিয়ে আছে সে-ও, তবে সৌন্দর্য  
উপভোগ করছে না। তার কুংসিত চেহারায় ধূর্ত, নিষ্ঠুর, নি-  
হাসি লেপ্টে থাকতে দেখলো রানা। বরফের রাজ্য অন্য কোনো  
বহন করছে তার জন্যে। স্থির দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, লম্বা গম্বু-  
সামনের দিকে বাড়ানো, এক হাতে শক্ত করে ধরে আছে ক্যানভাস  
উইণ্ডব্রেকার। তার এই ভাবসার ভালো লাগলো না রানার, লোকটা  
অশুভ কি যেন একটা চিন্তা করছে। মনে পড়ে গেল, নিক শেডি বোন-  
পাইটনের অবৈধ সম্ভান। মারিকা তাকে জানিয়েছে, শেডি আর পাই-  
টন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলো। জাহাজ সম্ভান হলেও, বাপের প্রতি নিক  
শেডির শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিলো প্রচুর। বাপের হত্যাকাণ্ড মেনে  
নিতে পারছে না সে। হয়তো প্রতিশোধ নেয়ার প্লান-পরিকল্পনা  
করছে মনে মনে। নিজেকে সতর্ক করে দিলো রানা। একটা অপরাধ  
ঘটেছে, তার ব্যবস্থা আইন অনুসারে হবে। ওর উপস্থিতিতে দ্বিতীয়  
কোনো অপরাধ ঘটতে দেবে না ও। ‘শেডি!’ কঠিন সুরে ডাকলো

রান্না। একটা ঝাঁকি খেয়ে সংবিৎ ফিরলো নিক শেডি। 'তোমার রিপোর্টটার কেন তুমি বলেছো প্যাক আইসের ভেতর দিয়ে ওয়েডেল সাগরে যেতে হবে আমাদের ?'

কয়েক সেকেন্ড রান্নার দিকে তাকিয়ে থাকলো নিক শেডি, তারপর তার ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটলো। 'আমি চেয়েছি ওয়াকার দক্ষিণে যাক, সেজন্যে।'

'কেন ?'

মুহূর্কালো ঝাঁকালো নিক শেডি। 'কেন ? সিম্বর বলতে পারবে কেন। আমি শুধু চেয়েছি লোকটা দক্ষিণে যাক, সভ্যতা থেকে অনেক দূরে।'

'কিন্তু কেন, কারণটা কি ?'

উইণ্ডব্রেকার ছেড়ে দিয়ে রান্নার একটা বাছ খামচে ধরলো শেডি, বাথা পেলো রান্না। 'কারণ তাকে যদি যথেষ্ট দূরে সরিয়ে আনা যায় ...না, থাক !' রান্নাকে ছেড়ে ঘুরলো সে, হন হন করে বেরিয়ে গেল ব্রিজ থেকে।

'নিককে আপনার বোধহয় খানিকটা অদ্ভুত লাগছে, ক্যাপটেন ?' এরিকার হাসিটা অবাস্তব লাগলো রান্নার কানে। 'বেচারি—ওর জীবনটা মোটেও সহজ-সরল নয়। বোনার পাইটন ছিলেন ওর আদর্শপুরুষ।'

'আর তুমি, এরিকা ? বোনার পাইটন সম্পর্কে তুমি কি মনে করো ?'

'তাকে হারিয়ে কোম্পানীর বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে, যে ক্ষতি কোনোদিন পূরণ হবার নয়। তাঁর মতো মানুষ হয় না, স্যার।'

ব্রিজে এসে ওয়েজনার জানালো, একটা উইন্ড মেশিন ঠিকমতো কাজ করছে না, ফলে নিক শেডিকে নিয়ে আলাপটা থেমে গেল।

মাঝরাতে দিকে, সূর্য তখন দক্ষিণ দিগন্তরেখা থেকে অনেক ওপরে

উঠে এসেছে, প্যাক আইসে প্রবেশ করলো ওরা। প্রায় এক মাস  
চণ্ডা একটা পানিপথ দিয়ে ভেতরে ঢুকলো লিবার্টি-ফোর, গতি  
নট। হু'পাশে চকচকে বরফ, মাঝখানের পানি প্রায় কালোই হল। চার  
ওদের পোর্ট কোয়ার্টার-এর দিকে বড় একটা আইসবার্গ রয়েছে, না  
দিকটা সমতল। ওটা বাদে চারদিক থেকে প্যাক আইস ঘিরে রেখে  
ওদেরকে। সূর্য আরো ওপরে ওঠার পর বরফের রাজ্য থেকে উঠে  
হলো সমস্ত রঙ, চোখ-ধাঁধানো সাদা উজ্জলতা পীড়াদায়ক  
উঠলো। গাঢ় রঙের চশমা পরেও স্বস্তিবোধ করলো না রানা।

বরফের ব্যাপারটা ভীতিকর কিছু নয়। জাহাজের সমস্ত রুটিন কার্য  
কর্ম ঠিকমতোই সারা গেল। পানিপথটা মাঝে মধ্যে এতো চওড়া  
হলো যেন খোলা সাগরে রয়েছে ওরা। আবার কখনো বা সরু হয়ে  
হতে দীর্ঘ হাইওয়ের আকৃতি পেলো, আইসবার্গগুলোর ভেতর দিয়ে  
এঁকেবেঁকে এগিয়েছে। তারপর হঠাৎ সেটা, কানা গলির মতো  
প্যাক আইসের কিনারায় নিশ্চিহ্ন হলো, সামনে আর যাবার পথ  
নেই। শুরু হলো ফ্যাক্টরি শিপ কোকুনের ভোজবাড়ি দেখানোর পানি।  
প্যাক আইস ভেঙে পথ তৈরি করলো ওটা, হু'দিকে শত সহস্র কর্গাস  
মতো বিক্ষোবিত হলো বরফের টুকরো আর কণা। অবশেষে নতুন  
একটা পানিপথে ঢুকলো ওরা।

মাঝে মধ্যে হু'একটা তিমির দেখা পাওয়া গেল। ওগুলোও দক্ষিণ  
দিকে চলেছে। এক ঝাঁক কিলার হোয়েল যাবার পথে থেমে ভাসমান  
বরফে আশ্রয় নেয়া সীল মাছের বংশ ধ্বংস করছে।

চারদিনের দিন সকালে বরফে প্রতিফলিত দক্ষিণের আকাশ অত্যন্ত  
কালো আর ভীতিকর দেখালো। নিচের দিকেও প্রচুর মেঘ দেখে  
রানার ধারণা হলো, বড় উঠবে। লিবার্টি-ফোর-এর তথ্যভাণ্ডার

এরিকা মাথা নেড়ে বললো, 'আরে না, মেথ দেখলেন কোথায় আপনি। ওটা তো খোলা সাগর। বরফের সাদা চোখে লাগলে ওটাকে সব সময় কালোই দেখায়।' কথাটা যে সত্যি একটু পরই তা প্রমাণ হলো। পানিপথটা ধীরে ধীরে চওড়া হতে শুরু করলো। ভাসমান বরফের স্তরগুলোর সংখ্যা কমে এলো, ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। আজ আমুরারীর তেইশ তারিখ সকালে ৬৬.০১ দক্ষিণ, ৩৫.৬২ পশ্চিমে রয়েছে ওরা, খোলা সাগরে, পিছনে ফেলে এসেছে সাদা বরফের চোখ-খাঁধানো উজ্জলতা।

প্রায় সাথে সাথেই লিবার্টি-ওয়ান আর লিবার্টি-থ্রি বহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধূমকেতুর মতো অদৃশ্য হয়ে গেল। মাস্তুলের মাথার কাছাকাছি উঠতে বলা হলো লিবার্টি-ফোর-এর লুকআউটকে, তার ওই আস্তানার নাম দেয়া হয়েছে কাকের বাসা। মাত্র কয়েক মিনিট পরই তার চিংকার ভেসে এলো, 'তিমি! তিমি!'

'কোনদিকে?' বিক্ষোভিত হলো এরিকার কণ্ঠ।

'স্টারবোর্ড সাইডে!'

প্রায় তখনই সেটাকে দেখতে পেলো ওরা। জাহাজ স্টারবোর্ডের দিকে ঘোরাতে বলে, 'ইমার্জেন্সি ফুল অ্যাংগেজ,' অর্ডার দিলো রানা। শুরু হলো ওদের প্রথম খাওয়া।

পানির তলায় ডুব দিয়েছে তিমি। সবার চোখ সামনে, সাগরের পিঠ তন্নতন্ন করে খুঁজছে, অপেক্ষা করছে নাক দিয়ে পানি ছাড়ার জন্যে। আবার কখন মাথাচাড়া দেবে সেটা। 'শিকার করার আগে ক্লান্ত করতে হবে তিমিকে,' বললো এরিকা। 'ওটার ওপর বারবার চড়াও হবো আমরা।' উত্তেজনার চবি-খলখল প্রকাণ্ড মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে তার।

হটলের দায়িত্ব নিলো রানা, গানারের ভূমিকায় এরিকা। একা এই প্রথম একটা ভিডিয়ারে যাচ্ছে মেয়েটা, প্রথমবার সফল হতে পারাটাই তার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আবার চিংকার শোনা গেল লুকআউটের, আবার ফুল স্পীড তুললো রানা। দুই কেবল দূরে পানির ওপর মাথা তুলেছে তিনি। চোখের পলকে তার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো জাহাজ, ওটার পিচ্ছিল কালো পিঠ বাঁকা হয়ে গেল পানি ছাড়ার সময়।

চিংকার করলো এরিকা, 'স্টপ!' এঞ্জিনের শব্দ থামলো, মস্তুরবেগে ভেসে চললো জাহাজ। পরের বার পোর্ট বাঁম-এর দিকে মাথা তুললো তিনি, অনেকটা দূরে। জাহাজ ঘুরিয়ে নিয়ে আবার পিছু নিলো ওরা।

এক এক করে পাঁচবার ভিডিয়ার ওপর দিয়ে জাহাজ চালানো রানা। প্রতিবার আগেরবারের চেয়ে কাছাকাছি পানিতে মাথাচাড়া দিলো তিনি। মাথা তোলার সাথে সাথে জাহাজটাকে একেবারে কাছে দেখতে পাচ্ছে ওটা। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে মাথা তুলতে পারলেও, পানি ছাড়ার সময় পাচ্ছে না, আবার ডুব দিয়ে সরে যেতে হচ্ছে জাহাজের পথ থেকে। 'যথেষ্ট হয়েছে,' চিংকার করলো এরিকা। 'এবার ওটাকে আমরা ঘায়েল করতে পারি!' ব্রিজের দরজা ই্যাচকা টানে খুলে ক্যাটওয়াক ধরে ছুটলো গান প্ল্যাটফর্মের দিকে। ওখান থেকে রানাকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিলো সংকেতের সাহায্যে, মহড়া দিয়ে নিরেছে আগেই।

ধীরগতিতে এগোচ্ছে লিবার্টি-ফোর, পোর্ট-এর দিকে ঘুরছে। গান-এর সফল বাট শব্দ করে ধরে অপেক্ষায় আছে এরিকা। হাফ স্পীড, সংকেত দিলো সে। রানা দেখলো, সরাসরি ওদের সামনে পানির

অপর মাথা তুললো। তিমি, পঞ্চাশ ফুট দূরেও নয়। এঞ্জিনরুম টেলি-  
 গ্রাফে একটা ঝাঁকি দিলো ও। লাফ দিলো ক্যাচার, ছুটলো। ছ'পা  
 কঁক করে দাঁড়ালো এরিকা, হারপুন গান ঘোরালো। তিমির গায়ে  
 চড়াও হতে যাচ্ছে জাহাজ। উচু বো-র আড়ালে অদৃশ্য হলো সেটা,  
 তিমি আর জাহাজের সাথে ধাক্কা লাগবে বুঝতে পেরে আড়ষ্ট হয়ে  
 উঠলো রানার শরীর। হঠাৎ ঝলসে উঠলো আগুনের শিখা, সেই  
 সাথে বিস্ফোরণের শব্দ। রানা দেখলো নিচের দিকে পানিতে উড়ে  
 গেল হারপুনটা, পিছু পিছু এঁকেবেঁকে ছুটলো ফোররানার। আরেক-  
 টা বিস্ফোরণ হলো, আগেরটার চেয়ে ভোঁতা, সেই সাথে লাফ দিলো  
 একটা ঝর্ণা, আর তারপরই উইঞ্চ ড্রামগুলো তারস্বরে চিংকার জুড়ে  
 দিলো, বো-র ফেয়ারলিড হয়ে সগর্জনে বেরিয়ে যাচ্ছে ছ'ইঞ্চি হোয়েল  
 লাইন।

হাঁপাতে হাঁপাতে ব্রিজ ফিরে এলো এরিকা। 'ভালোভাবে  
 ছুঁড়তে পারিনি, বাইরের দিকে বিস্ফোরিত হয়েছে হারপুনটা।  
 লাগানো উচিত ছিলো শিরদাঁড়ায়। গতি কমান, ব্লিজ!'

'ওই দেখা যায়।' লুকআউট চিংকার করলো কাকের বাসা থেকে।  
 লাইন এখনো সগর্জনে ছুটে চলেছে। এরইমধ্যে ডেঞ্জার মার্ক-এ নেমে  
 এসেছে ব্লক। লাইনের দ্বিতীয় গিঁটটাকে বেরিয়ে যেতে দেখলো  
 রানা। একটা গিঁট মানে একশো বিশ ক্যাপস। সব মিলিয়ে মোট  
 চারটে লেন্থ, তিনটে গিঁট। ব্লক-এর ভেতর দিয়ে তিন নম্বর গিঁট  
 বেরিয়ে যাচ্ছে, এই সময় আধ মাইল সামনে পানির ওপর তিমিটাকে  
 মাথা তুলতে দেখলো ওরা।

ছ'হাতে উইণ্ডব্রেকার আকড়ে ধরেছে এরিকা। ফেয়ারলিড-এর  
 ভেতর দিয়ে বেরিয়ে গেল শেষ গিঁটটা। ফুল স্পীড চাইলো রানা,

পরমুহূর্তে দেখতে পেলো রক-টা মাষ্ট বেয়ে উঠতে শুরু করেছে।

‘জিতেছি।’ রানার কানে বোমা ফাটলো এরিকা। ‘আমরা জিতেছি!’ উইঞ্চের দায়িত্বে রয়েছে ওয়েজনার, ত্রেক কয়ছে সে; এঞ্জিনের শব্দকে ডানিয়ে উঠলো ত্রেক ড্রামের তীক্ষ্ণ আওয়াছ। তারপর হঠাৎ ঢিল পড়লো লাইনে। জাহাজ থামবার নির্দেশ দিলো রানা। লাইন ধরে টানতে শুরু করলো ওয়েজনার। স্রবণগতিতে ভেসে চলেছে ক্যাচার, লাইন আগের মতোই নিখিল।

তারপর হঠাৎ আবার টান পড়লো। এবারের টানটা এতো জোরালো যে ছ’ইঞ্চি লাইন সরু হতে হতে আধ ইঞ্চিতে দাঁড়ালো। লাইনটা যেন বেহালার তার। রানার মনে হলো, ছিঁড়ে যাবে। রক ইতিমধ্যে নেমে এসেছে, গোটা জাহাজকে টেনে নিয়ে চলেছে তিমিটা ঘণ্টায় ছ’নট গতিতে। ধীরে ধীরে উইঞ্চ ঘুরিয়ে লাইন ছাড়ছে ওয়েজনার। এই অবস্থা সম্ভবত এক মিনিট ধরে চললো, কিংবা হয়তো ত্রিশ সেকেন্ড। মনে হলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যাচ্ছে। মুক্তি পাবার সর্বশেষ প্রচেষ্টা তিমির। আবার ঢিল পড়তেই উইঞ্চ ঘুরিয়ে লাইন টেনে নিলো ওয়েজনার। তিমিটা এখনো তার বিশাল লেজ দিয়ে পানিতে ঝাপটা মারছে। ধীরে ধীরে সেটার কাছে চলে এলো জাহাজ। এক ছুটে আবার গান প্ল্যাটফর্মে চলে গেল এরিকা, আরেকটা হারপুন গাঁথলো তিমির গায়ে। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো রক্তের মোটা একটা ধারা, তারপর প্রকাণ্ড দানবটা নিশ্চল হয়ে গেল, জাহাজের পাশে স্থির হয়ে আছে যেন একটা আধ-ডোবা সানমেরিন।

দম ফেলারও ফুরসত পাওয়া গেল না, আবার কাকের বাসা থেকে চিৎকার করলো লুকআউট, ‘তিমি! তিমি!’ সূর্য ডোবে না, তিমিরও কোনো শেষ নেই, কাজেই বিজ্রাম বা ঘুম হারাম হয়ে গেল



জবাব। বোনার পাইটনের মৃত্যুসহস্য, মারিকার বিষাদ ভরা দৃষ্টি, মার্ক  
 রোসেটের অপরাধ, এ-সব বহুদূর অতীতের কথা বলে মনে হলো  
 রানার, কোনোটা নিয়েই চিন্তাভাবনা করবার অবকাশ নেই। কাদের  
 আসা থেকে অনবরত আওয়াজ আসছে, 'তিমি! তিমি!' হারপুন গানের  
 ঘন ঘন বিক্ষোভে কানে তাল লাগে গেল। তিন কি চারটে তিমি  
 আরার পর আর/টি-র সাহায্যে টোইং ভেসেল বা বয়া বোটকে ডাকা  
 হলো, তারা তিমিগুলোকে টেনে নিয়ে গেল ফ্যাক্টরি শিপের দিকে,  
 ইতোমধ্যে আবার ওরা নতুন শিকার দেখতে পেয়ে সেটাকে ধাওয়া শুরু  
 করেছে। এইভাবে চললো দিনের পর দিন। ওদের চারপাশে, আব-  
 ছাওয়া খারাপ থাক বা ভালো, অন্যান্য ক্যাচারগুলোও উন্মত্ত ব্যস্ত-  
 তার সাথে ঠিক তাই করে যাচ্ছে। ফ্যাক্টরি শিপ কোকুনে ওরা  
 ফিরলো শুধু যখন ফুয়েল, সাপ্লাই আর নতুন হারপুন দরকার হলো।  
 মাঝে মধ্যে রানা ভাবলো বটে সাভিকের ক্যাচারে কেমন আছে  
 মারিকা, তবে কোনোবারই ভাবনাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। ক্লান্তি,  
 ব্যস্ততা, অনিদ্রা এবং উদ্বেজনার মারিকার চেহারা পর্যন্ত ওর মনের  
 পর্দায় ঝাপসা হয়ে গেছে, যেন বহু বছর আগে একবার মেয়েটার সাথে  
 দেখা হয়েছিল ওর।

তারপর আর/টি থেকে ভেসে আসা ঘোষণাটা শুনলো রানা। কর্নেল  
 ওয়াকার রোসেট তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। আর্থিক  
 সংকটে পড়ে বোনার পাইটন আত্মহত্যা করেছেন।

হঠাৎ যেন ঝপ করে মাটিতে পা পড়লো রানার। হত্যাকাণ্ডের  
 মতো গুরুতর একটা অপরাধকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে?  
 কিন্তু কর্নেল ওয়াকারের সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে ওকে বাধা  
 দিলো নিক শেডি। সে বললো, 'তর্কটা ক্যাপটেনরা সবাই শুনতে  
 যাত্রা অশুভ-১

পাবে। কাজ ফেলে ফ্যাঙ্করি শিপকে ঘিরে ধরবে ওরা। তাতে ক্ষতি হবে মারিকার, কারণ পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর বেশিরভাগ শেয়ারের সে-ই এখন মালিক। ওয়াকার ব্যাটা যা করছে করুক, সময় মতো আমাদের দায়িত্ব আমরা পালন করবো।’

রানা নিজেও আরেকটা কথা ভাবলো। কর্নেল ওকে কথা দিয়েছেন, বন্দরে পৌঁছে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পুলিশের হাতে তুলে দেবেন তিনি। ক্যাচারগুলোর ক্যাপটেনদের তিনি জানিয়েছেন বটে যে বোনার পাইটন আত্মহত্যা করেছেন, তারমানে এই নয় যে রানাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করবেন না। চারপাশে প্রচুর তিমি, এই মুহূর্তে তিনি টনসবার্গের লোকদের উত্তেজিত করতে চাইবেন না, এটাই স্বাভাবিক। তদন্ত কমিটির নামে মিথ্যে রিপোর্ট প্রকাশ করে তিনি শুধু হয়তো মোসুমটাকে সফল করতে চাইছেন।

ছ’ইপ্তায় পঞ্চাশটা তিমি মারলো ওরা। অনেকদিন অভ্যাস নেই, তাই এটা-সেটা এরিকার কাছে শিখতে হলো রানাকে, তারপর সে-ও নিপুণ গানার হয়ে উঠলো, এগারোটা তিমি মারা পড়লো ওর হাতে। এই পক্ষকালের শেষ দিকে একটা ঘটনা ঘটলো, ফলে রানার মনে আবার সমস্ত গুরুত্ব নিয়ে ফিরে এলো বোনার পাইটন মৃত্যুরহস্য। সেদিনটা খুব ভালো গেছে ওদের, চারটে তিমি মারার পর রেডিও মেসেজ পাঠিয়েছে, যেন একটা টোইং ভেসেল পাঠিয়ে শিকারগুলো নিয়ে যাওয়া হয়। ওদের ডাকে সাড়া দিলো লিবার্টি-থি।

সাগরের যে অংশে তিমি খুঁজছিল ওরা, লিবার্টি-থির পথ থেকে একেবারে কাছে। কোর্স বদলে সরাসরি ওদের দিকে ছুটে এলো লিবার্টি-থি, চোদ্দ নট গতিতে। বড় একটা বৃত্ত রচনা করে লিবার্টি-ফোর-এর প্রায় পাশে এসে থামলো সেটা। ত্রিজে মার্ক রোসেটকে

কথা গেল, মুখে লাউড-হেইলার তুলে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সে, ওদের জাহাজে আসার জন্যে অনুমতি চায়।

রানা কিছু বলার আগেই হস্তদস্ত হয়ে ত্রিজে উঠলো নিক শেডি। তার গোটা মুখ অসংখ্য কঁচোর মতো মোচড় খাচ্ছে, হাঁপাচ্ছে যেন একজন ম্যারাথন দৌড়বিদ। 'থবরদার, ও বেন আমাদের জাহাজে পা কেলতে না পারে!' চোখ পাকিয়ে গর্জে উঠলো সে।

'কেন?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'কেন?' রানার বাহু ধরে ধাক্কি দিলো নিক শেডি। 'জিজ্ঞেস করছেন কেন?' তার গলা রাগে কাঁপছে। 'ওকে আমি খুন করবো, তাই। বিশ্বাস করুন, ওকে সামনে পেলে নিজেকে আমি সামনে রাখতে পারবো না। কুস্তাটা স্বেচ্ছা খুন হয়ে যাবে আমার হাতে।'

লোকটার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলো রানা। তার হিংস্র ভাবটুকু এতোই নগ্ন যে সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করলো ও। নিক শেডি যে বাড়িয়ে বলছে না, এটুকুও পরিষ্কার বুঝতে পারলো। 'ঠিক আছে,' নরম সুরে বললো রানা, মেগাফোনটা মুখের সামনে তুললো। 'শোনো, মার্ক। তোমার আসার দরকার নেই। আমি আসছি তোমার জাহাজে।'

## নয়

ছোটো জাহাজের মাঝখানে ব্যবধান বিশ ফুটের মতো। হাত নেড়ে মার্ক জানালো, রানার কথা শুনতে পেয়েছে সে। এঞ্জিন বন্ধ করে পানিতে একটা বোট নামানোর নির্দেশ দিলো রানা।

রানার জন্যে একটা মই নামিয়ে দিলো ওরা, সেটা বেয়ে লিফট-থ্রিতে উঠলো ও। মইয়ের মাথায় ওকে অভ্যর্থনা জানালো মার্ক। নিজেই প্রথমে হাত বাড়িয়ে দিলো, তদ্র হাসির সাথে হ্যাণ্ডশেক করার পর ওর পিঠে একটা হাত রেখে পথ দেখিয়ে নিরে চললো সরাসরি তার কেবিনে। ওর ব্যক্তিগত কুশলাদি জানতে চাইলো সে, জিজ্ঞেস করলো শিকার কেমন চলছে। এতো বিনয় এবং খাতির কেন? মনে মনে সতর্ক হয়ে উঠলো রানা।

কেবিনে ঢোকার পর রানাকে দামী হুইকি অফার করলো মার্ক। মুহূর্তে হেসে মাথা নাড়লো রানা। 'আমি গানার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি।'

'ও, আচ্ছা,' বলে ঢক ঢক করে নিজের থ্রাস্টা খালি করলো মার্ক। সেটা আবার ভরার সময় চোখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলো, 'জানতে

‘না, কেন তোমার সাথে দেখা করতে চেয়েছি আমি ?’

‘তোমার অন্য অরুরী কোনো ব্যাপার, সন্দেহ করছি,’ বললো রানা, লক্ষ্য করলো বোতল ধরা হাতটা একটু কাঁপছে। ‘আমাদের জিজ্ঞাসা নিয়ে চলে যাওয়ার কথা তোমার।’

এবার ধীরে ধীরে গ্লাসে চুমুক দিলো মার্ক, লালচে তরল হাইস্কির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে যেন ভূত-ভবিষ্যৎ দেখতে চাইছে। হঠাৎ চোখ তুলে সামনের দিকে ঝুঁকলো সে, বললো, ‘তোমার ধারণা, পাইটনকে আমি খুন করেছি, তাই না ?’ রানা কিছু বলছে না দেখে আবার জিজ্ঞাসা করলো সে ‘কি, সত্যি না ?’ প্রচণ্ড রাগের সাথে।

এ-প্রসঙ্গে আমার কোনো বক্তব্য নেই,’ বললো রানা। ‘অন্তত তোমাকে বলার মতো কোনো বক্তব্য নেই। আমি একটা তদন্ত কমিটির তরফ থেকে এভিডেন্স রেকর্ড করেছি মাত্র। এরপর কি করা হবে না হবে সেটা পুলিশের ব্যাপার।’

‘স্বগড়া যদি একটা হয়েই থাকে, তো কি হলো ?’ গলা চড়ালো মার্ক। ‘হাতাহাতি, মারামারি হয় না ? ঘুসি খেয়ে এর আগে কখনো কেউ জাহাজ থেকে পড়ে যায়নি ? এতে কি প্রমাণ হয়, আমি খুনী ?’

কি বলবে ভেবে পেলো না রানা। এক অর্থে নিজের অপরাধ স্বীকার করছে মার্ক রোসেট। রানা অস্থির করলো, লিবার্টি-থ্রুতে আসা উচিত হয়নি ওর। ‘সেটা বিবেচনা করবে কোর্ট।’

বাক্সের ওপর হঠাৎ সিঁধে হয়ে বসলো মার্ক, মাথাটা একদিকে কাত করে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালো রানার দিকে। হাত দুটো ঘন ঘন মুঠো পাকাচ্ছে। ‘মারিকার কথা ভুলে যেয়ো না, রানা।’

‘এর সাথে মারিকার কি সম্পর্ক ?’

‘সে বোনার পাইটনের মেয়ে এবং আমার স্ত্রী হতে যাচ্ছে,’ আড়ষ্ট

হাসি দেখা গেল মার্কের ঠোটে, তারপর অকস্মাৎ জিজ্ঞেস করলো,  
'ওকে তুমি ভালোবাসো, তাই না?'

বিস্ময়ের একটা ঝাক্স অনুভব করলো রানা। অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটা  
অন্যান্য সমস্ত বিষয়কে দূরে ঠেলে দিলো। উচ্চারিত হবার সাথে  
সাথে প্রচণ্ড ঝাঁকির সাথে উপলব্ধি করলো রানা, প্রশ্নটা ওর মনেও  
লুকিয়ে ছিলো। মারিকা পাইটনকে ভালোবাসে সে? সে কি মেয়েটার  
প্রেমে পড়েছে?

পিছনের দেয়ালে হেলান দিলো মার্ক, ঢিল পড়লো পেশীতে। তার  
চেহারায় বিজয়ীর একটা ভাব ফুটে উঠলো। 'তুমি নিশ্চয়ই চাইবে না,  
ব্রিটিশ কাগজগুলোর মারিকার কলেংকারী নিয়ে লেখালেখি হোক।  
তুমি জানো, ইংরেজ পাঠকরা ঈশ্বরিত্রা নারীর অশ্লীল কাহিনী শুনে  
ভারি পছন্দ করে? আমাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করলে কোটে  
মারিকার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকবো আমি। আজিতে বলবো, আমাকে  
বিয়ে করতে চাইছে না বলে আমার বিরুদ্ধে খুনের মিথ্যে অভিযোগ  
করেছে সে। আরো বলবো, বিয়ের এনগেজমেন্ট হবার পর বিয়ে  
করতে না চাওয়ার মূল কারণ মাসুদ রানা নামে এক এশিয়ান কাল  
আদমী। বলবো, মারিকার বক্তব্য অনুসারে এই কাল আদমী নাকি  
বিছানায় একটা অসুর বিশেষ। বলবো, মারিকা আমাকে বলেছে,  
তার বিকৃত যৌন রুচি চরিতার্থ করার জন্যে দুনিয়াতে মাত্র একজন  
জন্মেছে তার নাম মাসুদ...'

নিজেও জানে না রানা, কখন মেরে বসেছে ঘুসিটা। ইস্পাতের  
দেয়ালে বাড়ি খেলো মার্ক, ছিটকে বাস্তু থেকে পড়ে গেল কেবিনের  
মেঝেতে। ক্যাৎ করে তার পাজরে লাথি মারলো একটা। ব্যথায়  
নীল হয়ে গেল মার্কের চেহারা। আরো প্রলাপ বকে কিনা দেখার

অন্য এক পা পিছিয়ে তাকে উঠে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিলো রানা।  
 ‘শখ মিটেছে?’ শান্ত গলায় জানতে চাইলো ও। ‘ফের যদি আমার  
 সাথে মারিকাকে জড়িয়ে নোংরা কিছু বলো, তোমার হাত-পা গুঁড়িয়ে  
 দেবো।’

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত মুছলো মার্ক,  
 হাতটা চোখের সামনে এনে রক্তটুকু দেখলো। ধীরে ধীরে দাঁড়ালো  
 সে, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। ‘তুমি মারিকার প্রতি  
 দুর্বল, ভেবেছো এটা আমি কাজে লাগাবো না?’ হিসহিস করে  
 উঠলো তার গলা, হিংস্র নেকড়ের মতো হলো চেহারাটা। ‘আমার  
 লোকজন আছে, তারা সাক্ষী দেবে—তুমি মারিকাকে লিবাটি-থুঁতে  
 রক্ষিতা হিসাবে ব্যবহার করেছে। মজার কথা কি জানো, এনগেজ-  
 মেন্ট হয়ে যাবার পর কোনো মেয়ে যদি বিয়ে করতে অস্বীকার করে,  
 আমাদের দেশে তাকে খুব খারাপ চোখে দেখা হয়। আমি আইনের  
 আশ্রয় নেবো। মারিকার সামাজিক মর্যাদা ধুলোয় লুটাবে। তবে,  
 ফৌস ফৌস করে নিঃশ্বাস ফেললো কিছুক্ষণ, ‘তবে, এই বিপদ থেকে  
 একমাত্র তুমিই তাকে রক্ষা করতে পারো।’

কি বলতে চায় মার্ক বুঝলো না রানা। তবে কোনো প্রসঙ্গ করলো  
 না।

মার্ক নিজেই ব্যাখ্যা করলো, ‘ভেবে দেখো, রানা। মারপিট করে  
 এটার সমাধান হবে না। মন দিয়ে শোনো কথাগুলো। তদন্ত কমি-  
 টির রিপোর্ট সম্পর্কে। মাত্র চারজন লোক জানে রিপোর্টটা রয়েছে  
 আমার বাবার হাতে। সে খুব তাড়াতাড়ি মারা যাবে, জানোই তো।  
 যতোদিন মারা না যায়, তাকে আর ভেনসমকে আমি সামলাতে  
 পারবো। মারিকার সাক্ষ্য আমার তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারবে

না, কারণ আমিই তার বিরুদ্ধে মামলা করবো। বাকি থাকলো  
জন—তুমি !’

‘নিক শেডির কথা ভুলে যেয়ো না,’ বললো রানা। সেই টেলিফোন  
দেখার পর মার্ক নিশ্চয়ই বুঝেছে যে ব্যাপারটার সাথে নিক শেডি  
জড়িত।

‘ও, ই্যা, জারজ লোকটা,’ মার্কের বলার ভঙ্গিতেই বোঝা গেল  
নিক শেডিকে তেমন গ্রাহ্য করে না সে। ‘তাকে সামলানো আমার  
জন্যে কোনো সমস্যা নয়। শুধু তুমি যদি মুখ বন্ধ রাখো, গোটা  
ব্যাপারটা চাপা পড়ে যাবে। ভেবে দেখো, রানা। বিনিময়ে কি পেতে  
পারো হিসেব করো।’

‘উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি না।’

‘ঠিক আছে,’ যেন রানার দেয়া শর্ত মেনে নিচ্ছে মার্ক, ‘মারিকাকে  
তোমার হাতে ভুলে দেবো আমি। ওর ওপর আমার যে দাবি আছে  
সেটা ফিরিয়ে নেবো।’

‘তুমি অত্যন্ত নীচ, তোমার সাথে কথা বলতে ক্রটিতে বাধছে  
আমার,’ বললো রানা, দরজার দিকে ঘুরলো।

লাফ দিয়ে রানার সামনে এসে পথরোধ করলো মার্ক। ‘ভেবে  
দেখো। ওকে তুমি ভালোবাসো না? আমার প্রস্তাবটা বুঝতে  
পারছো কি? চিরকালের জন্যে পেতে পারো মারিকাকে। নাকি...  
ঠিক আছে, ক্যাশ টাকারও ব্যবস্থা করবো। কতো চাও তুমি, কতো  
পেলে খুশি হও? আমার নিজের সমস্ত টাকা তোমাকে দিতে পারি...  
বিশ লাখ ডলার...’

‘পথ ছাড়ো, মার্ক,’ কঠিন সুরে বললো রানা। ‘তোমার ভাগ্য  
ভালো যে আমার হাতে আজ তুমি খুন হলে না। তবে সাবধানে



থেকে, আমাকে বাদেও হু'একজন শত্রু আরো তৈরি করেছে। তুমি।  
কেপটাউনে ফেরার আগে তারাই না তোমাকে খুন করে ফেলে।  
দরজার দিকে দৃঢ় পায়ে এসেগেলো রানা, মার্ক বাধা দিতে যাচ্ছে দে  
দড়াম করে ঘুসি মারলো তার নাকের ওপর, দোরগোড়ায় ধরাশা  
শরীরটাকে টপকে বেরিয়ে এলো কেবিন থেকে।

লিবার্টি-ফোর-এ ফিরে আসতেই পিছনে লাগলো নিক শেডি।  
'কেন ডেকেছিল আপনাকে ? কি বললো নেড়ি কুত্তাটা ?'

তাকে একরকম ধাক্কা দিয়েই নিজের কেবিনে চলে এলো রানা।  
অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করলো। মার্ক রোসেটের সন্দেহটা কি  
একেবারেই ভিত্তিহীন ? সে কি মারিকা পাইটনের প্রেমে পড়েনি ?

অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল, কারণ ব্যাপারটা নিজের কাছে পরি-  
ষ্কার নয়। মারিকা প্রচলিত অর্থে সুন্দরী নয়, তবে তার সরল মন  
নাড়া দিয়েছে রানাকে। কমণীয় চেহারার নিরীহ মেয়েটা গ্রীক দেবী-  
দের মতো যৌবন পেয়েছে শরীরে, একবার তাকালে চোখ ফেরানো  
যায় না। প্রচুর বিস্তারিত অধিকারিণী সে, রানাকে হয়তো ভালোও  
বাসে। কিন্তু রানা কি তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছে কখনো ?  
বিয়ে করে সুখী হতে চাইলে মারিকা আদর্শ মেয়ে, তাতে কোনো  
সন্দেহ নেই। কিন্তু ভালোবাসা আর বিয়ে, দুটোকে এক করে দেখার  
মানসিকতা কি কখনো হয়েছে ওর ?

চিন্তায় বাধা পড়লো। নক হলো দরজায়। বাইরে থেকে এরিকার  
গলা পেলো রানা। 'স্যার, ভেতরে আসতে পারি ?'

'এসো।'

ভেতরে ঢুকে কোনো প্রশ্ন না, এরিকা শুধু জানালো, 'আমরা  
আরো একটা তিমি দেখতে পেয়েছি। আমার ধারণা, আপনার ব্রিজে  
যাত্রা অশুভ-১

ধাক্কা উচিত।’

ব্যক্তিগত কোনো প্রশ্ন না করায় এরিকার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলে রানা। তার সাথে ত্রিজে চলে এলো ও। কিন্তু নিক শেডি নাহে। বান্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। রাতে নিম্নের কেবিনে কিরোডে রানা শোবে বলে, দেখলো ওর ডেস্কে বসে আছে সে। থমথম করতে চেয়ার। ‘মিঃ রানা,’ গম্ভীর গলায় বললো সে, ‘নেড়ি কুত্তাটা কি বলেছে আমাকে জানতে হবে।’

‘বিস্তৃত করো না তো। তোমার মাথাব্যথার কোনো কারণ ঘটেনি।’

‘বোনার পাইটনের বিষয় মানেই আমার মাথাব্যথা,’ ছেদের মৃত্যু বললো নিক শেডি। ‘পাইটনের অদৃশ্য হওয়া সম্পর্কে কি বললো নেড়ি কুত্তা? আমি জানি, এ-প্রসঙ্গেই আপনার সাথে কথা হয়েছে তার।’

‘আমি ক্লান্ত, শেডি।’

‘ঠিক আছে, আপনাকে বেশিক্ষণ কষ্ট দেবো না। আপনি শুধু বলুন কি বললো সে। বোনার পাইটনের মৃত্যু সম্পর্কে কে কি ভাবছে আমার জানা দরকার। জানার অধিকারও আমার আছে। আপনি জানেন, তার সাথে আমার সম্পর্ক...?’

‘হ্যাঁ, জানি।’

‘জানেন?’ হঠাৎ রেগে উঠলো নিক শেডি। ‘কে বললো?’

‘কর্নেল ওয়াকার।’

‘ওই শয়তানের খাড়িটা কি এ-কথাও আপনাকে বলেছে যে আমার মাকে আমার বাপের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় সে?’ উত্তেজনার সাথে পায়চারি শুরু করলো নিক শেডি। ‘মা...তার সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না। হাজার হোক জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সে যদি কোনো অন্যায় করে থাকে, অবশ্যই ভুগতে হবে তাকে। প্রকৃতির মার বলে

একটা কথা আছে না ? জানেন, বহুবার মা'র সাথে দেখা করার চেষ্টা করেছি আমি। শয়তানের ধাড়িটা, ওয়াকার, আমাকে দেখা করতে দেয়নি। দূর থেকে দেখেছি তাকে, তার সম্পর্কে শুনেছিও—এমন সব কথা, শুনতে ভালো লাগে না। সে যাক...।’

লোকটার জন্যে মায়া হলো রানার। ‘নিক, তুমি...।’

‘আপনি, মিঃ রানা, আমার একটা মাত্র প্রশ্নের উত্তর দিন। মার্ক আপনাকে কেন ডেকেছিল ?’

‘না...।’

‘এবার ভেবে দেখুন, বলবেন কিনা,’ নাটকীয় ভঙ্গিতে পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে রানার দিকে তাক করলো নিক শেডি। ‘বুঝতেই পারিছেন, জীবনের ওপর খুব একটা দরদ নেই আমার। এটা থাকলো কি না থাকলো তাতে তেমন কিছু এসে যায় না। মার্ক আপনাকে ডেকেছিল, ব্যাপারটা কিভাবে ধামাচাপা দেয়া যায় তা নিয়ে আলাপ করার জন্যে, তাই না ? সে আপনাকে ভয় দেখিয়েছে, লোভ দেখিয়েছে, ঠিক কিনা ?’

‘কি করে বুঝলে ?’

‘শয়তানের ধাড়ি আর তার ছেলেটাকে আমি চিনি, মিঃ রানা।’ হাঁপাচ্ছে নিক শেডি। ‘ওরা বিপদে পড়লে কিভাবে উদ্ধার পেতে চায় আমার জানা আছে। আমার ধারণা, মার্ক আপনাকে প্রস্তাব দিয়েছে, মারিকার ওপর থেকে নিজের দাবি তুলে নেবে সে, আপনি যাতে বিয়ে করতে পারেন ওকে, ঠিক কিনা ? এখন প্রশ্ন হলো, মিঃ রানা, আপনি কি সত্যি মারিকাকে ভালোবাসেন ?’

‘অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো হয়ে যাচ্ছে,’ সাবধান করার সুরে বললো রানা।

‘দুঃখিত । ঠিক আছে, মারিকার ভাগ্য মারিকা নিজে ঠিক করে  
আমি শুধু মার্কের বোকামির কথা ভাবছি । সব কথা জানা নেই তার  
জানা থাকলে মারিকাকে বিয়ে করার জন্যে জেদ ধরতো সে ।’

‘ঠিক কি বলতে চাও ?’

‘কেপটাউনে আমার দায়িত্ব ছিলো নির্দিষ্ট দিনে র‍্যাও কোম্পানীর  
সমস্ত শেয়ার বিক্রি করা । শুধু তাই নয়, আরো একটা দায়িত্ব ছিলো  
আমার ওপর । সেটা হলো, পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর যত বেশি  
সম্ভব শেয়ার বাজার থেকে কিনে নেয়া । লাভের টাকা দিয়ে তাই  
কিনেছি আমি । ফলে কোম্পানীতে এখন মারিকার শেয়ার হলো শত-  
করা সাতান্ন ভাগ । কথাটা এখনো গুরা জানে না । জানলে আপনার  
হাতে মারিকাকে ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবতো না মার্ক ।’ পিস্তলটা পকেট  
ভরে রাখলো সে । ‘ঠিক আছে । আমি শুধু পরিস্থিতিটা আঁচ করতে  
চেয়েছিলাম । ঈশ্বরকে ধন্যবাদ মারিকাকে আমি লিবার্টি-ফাইভে তুলে  
দিতে পেরেছি । আপনাকে বিরক্ত করলাম, সেজন্যে দুঃখিত, ক্যাপ-  
টেন,’ বলে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল সে ।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বাকি বসলো রানা । নিক শেডি পাগল  
নয় । তবু, লোকটাকে পুরোপুরি সুস্থ বলেও মনে হয় না । বোধবুদ্ধি  
প্রথর, না বলতেই অনেক কথা ধরে ফেলে । হিংস্র একটা ভাবও  
লুকিয়ে আছে ভেতরে, মাঝে মধ্যে সেটা নগ্ন চেহারা নিয়ে বেরিয়ে  
পড়ে । দুর্ভাগ্য একজন লোক ।

পরবর্তী কয়েক দিন নিজের কেবিন ছেড়ে বড় একটা বেরুলো না  
নিক শেডি । তিনি সম্পর্কে মস্ত একটা বই লিখেছে সে, প্রশ্নের উত্তরে  
রানাকে জানালো সে । তার আচরণে স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে, মদও  
খুব কম খেলো । সবার সাথে কথা কম বললেও, এরিকাকে দেখলেই

বকবকানি শুরু হয় তার। নিক শেডির প্রতি এরিকার প্রতিক্রিয়াও  
অদ্ভুত। মেয়েটা যেন মায়ের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হবার মহড়া দিচ্ছে। নিক  
শেডির কেবিনে তাকে খাবারদাবার পৌছে দিতে দেখেছে রানা।  
পাগলাটে লোকটার কাপড়চোপড় নিজের হাতে ধুয়ে দেয় সে, হিটারে  
শুকায়, ইত্থি করে। রানার চোখে একদিন ধরা পড়ে গেল, শেডির  
হেঁড়া শার্টটা সেলাই করছে সে। ‘অবসর সময়টা না ঘুমিয়ে কি করো  
ভূমি?’ কৌতুক করার জন্যে একদিন জিজ্ঞেস করলো রানা।

রীতিমতো রেগে উঠলো এরিকা। স্পষ্ট জানিয়ে দিলো, ‘ক্যাপটেন,  
আপনি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রশ্ন না করলে খুশি হবো।’

চেহারায় কৃত্রিম গাভীর ফুটিয়ে রানা বললো, ‘ক্যাপটেন হিসেবে  
আমার দায়িত্ব, জাহাজে কোনো রকম অনাচার হচ্ছে কিনা দেখা।  
একজন পুরুষের কেবিনে যদি কোনো মেয়ে রাত কাটায়, ত্রুদের মধ্যে  
অসন্তোষ দেখা দিতে পারে।’

‘ওরা সবাই টনসবার্গের লোক,’ ঝাবের সাথে বললো এরিকা,  
‘এরিকা কেমন মেয়ে জানে।’

‘অস্বীকার করছো না যে? তারমানে সত্যি ভূমি শেডির কেবিনে  
রাত কাটাও?’

‘কাটাই, কারণ মাথায় হাত বুলিয়ে না দিলে ওর ঘুম আসে না।  
ওর লেখা কেমন হচ্ছে তা-ও আমাকে দেখতে হয়।’

হেসে ফেললো রানা। ‘বাহ, সাংঘাতিক জোরালো যুক্তি তো!’

জানুয়ারীর ছ’তারিখে ফুয়েল নিলো ওরা। হঠাৎ করে অভাব দেখা  
দিয়েছে তিমির। দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে ক্যাচারগুলো। তিমির  
খোঁজে, কোনো কোনোটা ফ্যাক্টরি শিপ কোকুনের কাছ থেকে দ্রুশো  
মাইল দূরে সরে গেছে। লিবার্টি-ফাইভ রিপোর্ট করলো, তারা একটা  
যাত্রা অন্তত-১

পড় দেখতে পেয়েছে, একশো পঞ্চাশ মাইল উত্তর-পূবে।

ফ্যাক্টরি শিপ থেকে সেদিকে যাবার নির্দেশ দেয়া হলো। লিবার্টি-ফোরকে। সাত তারিখ সকালের দিকে কোকুনের কাছ থেকে একশো মাইল দূরে সরে এলো ওরা, রেডিওতে প্রচার করলো, একটা টোই শিপ দরকার। সাড়া দিলো লিবার্টি-শিপ।

আকাশের অবস্থা সুবিধের মনে হলো না রানার। মেঘগুলো কালো, খুব নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। বাতাসের সাথে তুষার বণা রয়েছে। দৃষ্টিসীমা কমতে শুরু করলো দ্রুত। এক মাইল দূরে কি আছে দেখার উপায় থাকলো না।

দিনের বাকি সময় ধীরগতিতে উত্তর-পূব দিকে এগোলো ওরা। খুঁজছে। তুষারপাত বন্ধ হলেও, শুরু হয়েছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ঢেউ-গুলোর মাথা থেকেও ঝর্ণার অবিরাম ধারা বরছে জাহাজের ওপর। আশপাশে তিমি যদি থাকেও, দেখতে পাবার উপায় নেই। কাকের বাসা থেকে খানিক পরপরই 'বরফ! বরফ!' চিৎকার ভেসে আসছে লুকআউটের। মাঝে মাঝে আইসবার্গ বলেও চিৎকার করছে সে। এরিকার সাথে পরামর্শ করে বো-র কাছে একজন লোককে পাহারায় রাখলো রানা। বড় কোনো বরফের স্তর দেখতে পেলে সমাধান করবে সে।

এরপর অবস্থা আরো খারাপের দিকে গেল বাতাস বইতে শুরু করায়। জাহাজ এতো বেশি হুলছে যে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়লো। এরিকা শুরু করলো, ক্যাটওয়াকটা না ভেঙে যায়।

কাকের বাসা থেকে ভয়ানক আতর্জন ভেসে এলো, 'আইসবার্গ!'

বৃষ্টির ভেতর দিয়ে দেখার চেষ্টা করলো ওরা। অপেক্ষার মুহূর্ত-গুলো ক্লান্তি আসে কেটে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ সামনে দেখা গেল

আকাশছোঁয়া বরফের পাঁচিল। রানার নির্দেশ অনুতে পানার আগেই হুইল ঘোরাতে শুরু করেছে হেলমসগ্যান। ঘুরে গেল ক্যাচার, বরফের পাঁচিলের সাথে একই সমান্তরাল রেখা ধরে এগোলো ওরা, পাঁচিলটা দুটিসীমার শেষ প্রান্তে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলো। 'এখানে আমাদের আশ্রয় পেতে হবে!' রানার কানে চিংকার করলো এরিকা।

আইসবার্গটা বিরাট। ওটার পাশ দিয়ে প্রায় দু'মাইল এগোবার পর একদিকের প্রান্ত চোখে পড়লো। কয়েক মিনিট পর উত্তর-পশ্চিম দিকে ঘুরে গেল ক্যাচারের বো, আগের চেয়ে শান্ত পানিতে চলে এলো। 'স্টপ!' নির্দেশ দিলো রানা। ঝড় আর সাগরের গর্জনে এঞ্জিনের আওয়াজ আগেও শোনা যাচ্ছিলো না, সেটা বন্ধ হবার পর জাহাজের কাঁপুনি থানিকটা কমলো শুধু। প্রায় নিঃশব্দে ভেসে চললো লিবার্টি-ফোর। পোর্ট সাইডে কোনোরকমে দেখা যায় আইসবার্গটা। প্রকাণ্ড ঢেউগুলো একের পর এক ছুটে এসে জাহাজটাকে অবলীলায় তুলে নিচ্ছে মাথার ওপর, পরমুহূর্তে ঢেউয়ের ঢালু গা বেয়ে তীরবেগে নামছে ওরা। আইসবার্গের পিছনে আশ্রয় পাওয়ার পর ঝড়-ভীতি দূর হয়েছে মন থেকে। তবে পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে সবাই সচেতন। আইসবার্গের আরেক দিকে ঝড়ের তীব্রতা শুরু হয়েছে, পাহাড়ের মতো উঁচু ঢেউ একের পর এক আঘাত করছে বরফ পাঁচিলে, ভেঙে পড়ার মুহূর্তে বোমা ফাটার আওয়াজ করছে।

'বিপদের ভয় এখনো আছে,' রানাকে জানালো এরিকা। 'আইসবার্গের মাথার দিকটা যদি ভারি হয়, নিচে ঢেউয়ের ধাক্কায় ধসে পড়তে পারে...'। কথাটা শেষ করলো না সে।

আইসবার্গের মাথা যদি ধসে পড়ে, পানিতে একটা আলোড়ন উঠবে। লিবার্টি-ফোর তো দূরের কথা, আশপাশে যদি কোনো যাত্রা অন্ত-১

এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের মতো প্রকাণ্ড জলযানও থাকে, এক নিমেষে ডুবে যাবে সেটা।

ঠিক এই পরিস্থিতিতে, এক ঘণ্টা পর, এস. ও. এস.-টা রিসিভ করলো ওরা। মড়ার মতো নিঃশব্দ বাক্সে পড়েছিল রানা, পিঠে দমাদম কিল মেরে ওকে জাগালো এরিকা। চোখ মেললো রানা, হঠাৎ বুঝতে পারলো না কোথায় রয়েছে। ‘জলদি, স্যার! জলদি!’ এরিকার চেহারা সাদা হয়ে গেছে। ‘এস. ও. এস. পাঠিয়েছে ওরা!’

ঝট করে বাক্সে উঠে বসলো রানা। ‘কে? কারা?’

‘লিবার্টি-ফাইভ।’

‘মাই গড!’ পায়ে বুট গলাতে শুরু করলো রানা। ‘পজিশন জানিয়েছে?’

‘হ্যাঁ, আমরাই সবচেয়ে কাছে...’

‘চাট! ওটা নিয়ে ওয়ারেরলেন্স রুমে এসো, কুইক! আমি যাচ্ছি। কি হয়েছে লিবার্টি-ফাইভের?’

‘রাডার নষ্ট হয়ে গেছে... সম্ভবত প্রপেলারও,’ কেবিন থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল এরিকা।

গায়ে অয়েলস্কিন চড়িয়ে মই বেয়ে পিছলে নেমে এলো রানা আফটার ডেকে। মারিকার কথা ভাবছে ও। রাডার আর প্রপেলার নষ্ট হয়ে থাকলে লিবার্টি-ফাইভ ঝড়ের দয়ার ওপর টিকে আছে। সেকেন্ড মেট হাভাল-এর কেবিনে ঢুকে রানা দেখলো, রেডিওর ওপর ছমড়ি থেয়ে রয়েছে সে। ‘ফ্যাক্টরি শিপ থেকে বলা হয়েছে উত্তর আর পূবে যে-ক’টা জাহাজ আছে, সবগুলোকে যার যার রেডিওর সামনে স্ট্যাণ্ড বাই থাকতে হবে,’ ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললো সে। ‘এস. ও. এস. শুনেছে এরিকা, ডিউটিতে থাকার সময়।’ তার বাক্সের ওপর



মডিটার দিকে তাকালো রানা, একটা বেজে পাঁচ মিনিট।

বিফোরিত হলো দরজা, ভেতরে ঢুকলো এরিকা, পিছনে নিক শেডি। 'ওদের পজিশন বের করেছি আমি,' হাভালের বান্ধের ওপর চাটের ভাঁজ খুলে বললো এরিকা। '৬৬.২৫ দক্ষিণ, ৩৩.৪৮ পশ্চিম। আর, আমরা এখানে,' চাটের গায়ে আঙুল রাখলো সে। 'চল্লিশ মাইলের মধ্যে।'

'কোকুনকে আমাদের পজিশন জানানো হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'হী-হ্যা। এদিকের সবগুলো জাহাজের পজিশন জানা আছে ফ্যাক্টরি শিপের।'

দরজার দিকে ঘুরলো রানা, জরুরী মুহূর্তে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে কখনোই বিলম্ব হয় না ওর। 'হাভাল। আবার যখন ফ্যাক্টরি শিপ যোগাযোগ করবে, বলবে আমরা লিবার্টি-ফাইভের সাহায্যে যাচ্ছি।'

'জী,' মাথা ঝাঁকালো হাভাল, 'অনারেবল ক্যাপটেন।'

দরজার কাছে পৌঁছে গেছে রানা, পিছু ডাকলো হাভাল। ঘড়ঘড় শুরু করেছে রেডিও, তারপরই একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। কিছুই বুঝলো না রানা, ভাষাটা নরওয়ের। তবে লক্ষ্য করলো, তিনজনই ওরা শিউরে উঠলো।

'কি হয়েছে?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইলো রানা। 'কি বলা হলো মেসেজ?'

রেডিও থেকে তখনো মেসেজ আসছে। রানা কথা বলার বিরক্ত হয়ে তার সামনে একটা হাত ঝাপটালো নিক শেডি। তিনজনই ওরা গভীর মনোযোগের সাথে শুনছে। সবশেষে দ্রুত তিনবার হুইসেলের শব্দ ভেসে এলো। তারপর বন্ধ হয়ে গেল রেডিওর যান্ত্রিক শব্দগুণন।

‘কি ঘটেছে?’ আবার জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘লিবার্টি-ফাইভ বরফে আটকা পড়েছে, স্যার,’ রুদ্ধশ্বাসে বললো এরিকা। ‘ওরা ভয় করছে, জাহাজটা বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না।’

‘ওদের জানাও, আমরা আসছি।’ বাক থেকে হেঁ। দিয়ে চাটটা তুলে নিলো রানা। ‘রেডিও ছেড়ে কোথাও তুমি যাবে না, হাভাল।’ দরজা খুলে তীব্রবেগে বেরিয়ে এলো ও, ত্রিজে ঢুকে নির্দেশ দিলো, ‘হাফ অ্যাহেড। স্টিয়ার নর্থ-ইস্ট।’ মইয়ের মাথা থেকে প্রায় ডাইভ দিয়ে নেমে এলো নিজের কেবিনে, অংক কষে কোর্সটা নির্ধারণ করলো বাস্ততার সাথে। ত্রিজে আবার ফিরে এসে নির্দেশ দিলো, ‘উত্তর ৫৫ পূর্ব।’ বোর দিকে একজন লোককে পাহারায় রাখলো ও। ইতো-মধ্যে ত্রিজে ফিরে এসেছে এরিকা। কি যেন বললো সে, ভালো করে শুনতে পেলো না রানা। আইসবার্গের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছে ওরা ঝড়াবিধ্বস্ত উন্মুক্ত সাগরে। ঝড়ের তীব্র ধাক্কায় একপাশে কার্তি হয়ে গেল ক্যাচার।

মৃত্যু মনে হলো হঠাৎ ওদের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। বাতাসের দিকে মুখ করে বৃষ্টির ভেতর দিয়ে দূরে তাকাবার চেষ্টা করলো রানা। আর কিছু না, বারবার শুধু মারিকার ছবি ভেসে উঠলো চোখের সামনে। আর কল্পনায় দেখতে পেলো, একটা বরফ পাঁচিলের গায়ে মাথা ঠুকছে লিবার্টি-ফাইভ। দাঁতে দাঁত চাপলো রানা। হাফ স্পীডের বেশি নির্দেশ দিতে পারছে না ও। এই ঝড়ের ভেতর ফুল স্পীড তুললে লিবার্টি-ফাইভকে উদ্ধার করা তো দূরের কথা, নিজেরাও বাঁচবে না ওরা।

‘বরফ ! বরফ !’ কাকের বাঁশ থেকে চিংকার ভেসে এলো । ক্যাটওয়া-  
কের শেষ প্রান্ত থেকে লুকআউট স্টারবোর্ড-এর দিকে ইঙ্গিত করলো ।  
বন বন করে ছইল ঘোরালো হেলমসম্যান । বরফ স্তরের সমতল মেঝে  
ভেসে গেল পাশ দিয়ে । আফটার-ডেক ধরে বাদরের মতো কসরত  
করতে করতে ছুটে এলো মেসবয়, খানিক আগে টাঙানো লাইফ-  
লাইন ধরে প্রায় ঝুলে পড়লো সে । ত্রিজে এসে রিপোর্ট করলো,  
লিবার্টি-ফাইভ এখনো পানির ওপর ভেসে আছে, তবে ছুটো বরফ  
স্তরের মাঝখানে আটকা পড়ার বিপদ দেখা দিয়েছে ।

খানিক পর উদয় হলো নিক শেডি । ‘এখনও টিকে আছে ওরা,’  
রানার কানে চিংকার করলো সে । ‘ফাস্ট মেট বিসমার্কের সাথে কথা  
বললাম । বরফে আটকা পড়লেও, এখুনি ভূবে যাবার ভয়টা কেটে  
গেছে । ভেনসনের সাথেও কথা হলো । আপনার সিদ্ধান্ত ঠিক আছে :  
জানালো সে । আমরাই সবচেয়ে কাছের জাহাজ । লিবার্টি-থ্রিকে  
তার বর্তমান পজিশনে স্ট্যাণ্ড বাই থাকতে বলা হয়েছে । কিন্তু নির্দেশ-  
টা পেয়েছে বলে পাল্টা কোনো বার্তা পাঠায়নি ওরা ।’

‘তোমার কি মনে হয়, ওরাও কোনো বিপদে পড়লো নাকি?’  
জিজ্ঞেস করলো রানা।

জবাব না দিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো নিক শেডি।

‘বরফ! বরফ!’ আবার দিক পরিবর্তন। আরেকটা বরফ স্তর। নিক  
শেডির শাটের আঙ্গিন ধরে টান দিলো এরিকা। ‘নিক, তোমার কি  
মনে হয়, সময়মতো ওদের কাছে পৌঁছতে পারবো আমরা?’ চিৎ-  
কার করে জিজ্ঞেস করলেও, গলাটা কোনোরকমে শুনতে পেলো রানা।

‘পারবো, পারতেই হবে!’ চোখ পাকিয়ে বললো নিক শেডি। কিন্তু  
রানা আশাবাদী হতে পারছে না। ব্যাপারটা নির্ভর করছে লিবার্টি-  
ফাইভ আর ফোর-এর মাঝখানে বরফ স্তরের সংখ্যা কতো তার  
ওপর।

‘বরফ! বরফ!’ লুকআউটের চিৎকার ক্ষীণ আর্তনাদের মতো  
শোনালো।

গতি কমিয়ে নির্দেশ দিলো রানা, ‘স্লো অ্যাহেড!’ হঠাৎ করে  
ওদের চারপাশে শুধু বরফ আর বরফ। তীব্র এক ঝাঁকি খেলো জাহাজ  
কঠিন বরফের সাথে ইস্পাতের সংঘর্ষে কর্কশ আওয়াজ হলো। কিছু  
না, একটা বরফ স্তরের সাথে শুধু একটু ঘষা খেয়েছে ক্যাচার। নিখিল  
আক্রোশে হাত ছুটো বারবার মুঠি পাকালো রানা। এঞ্জিন বন্ধ করার  
নির্দেশ দিলো ও। ভারি, নিশ্চিহ্ন পর্দার মতো বৃষ্টি পড়ছে। আপন-  
গতিতে ভেসে চলেছে জাহাজ, চারদিকে ভাসমান বরফ। তবে সাগর  
আগের চেয়ে শান্ত।

রানা কি ভাবছে বুঝতে পেরে এরিকা বললো, ‘ই্যা, প্রচুর বরফ  
থাকায় সাগর বাড়াবাড়ি করতে পারছে না।’

বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় রয়েছে ওরা। এঞ্জিন বন্ধ করার পর আধ ঘণ্টা

পেরিয়ে গেছে। মাঝে মধ্যেই ক্যাচারের গায়ে ঘষা খাচ্ছে কঠিন বরফ। তবে ঝড় দুর্বল হয়ে পড়ছে। বৃষ্টিও বোধহয় কন্মের দিকে, দৃষ্টিসীমা আগের চেয়ে বিস্তৃত হয়েছে। ওরা দেখলো, ছোটো আকারের অসংখ্য বরফ স্তরের মাঝখানে আটকা পড়েছে ওরা।

ধীরে ধীরে কন্মে এলো বাতাসের গতি। তবে পিছন দিকের আকাশে আবার নতুন করে কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে, আরেকটা ঝড়ের প্রস্তুতি চলছে ওখানে। সামনে বরফের সাদা উজ্জলতা বাড়তে বাড়তে চোখ ধাঁধিয়ে যাবার অবস্থা হলো। বরফ স্তরে আড্ডা দিচ্ছে এমপারার পেঙ্গুইন, জ্ঞান-তাপসের ভঙ্গিতে মাথা একদিকে কাত করে ওদেরকে দেখলো তারা।

বরফের সাদা উজ্জলতার গায়ে অসংখ্য কালো, গভীর রেখা। সবচেয়ে সুবিধেজনক পানিপথটা খুঁজে বের করা দরকার। সন্ধ্যা একটাকে পছন্দ হলো রানার, উত্তর-পূবে লম্বা চওড়া একটা পানিপথের সাথে মিলিত হয়েছে সেটা। বো সামান্য ঘুরিয়ে সেদিকে রওনা হলো লিবার্টি-ফোর। ওদেরকে ঘিরে থাকা সমতল বরফের রাজ্য শত-সহস্র চিড় ধরা সীমাহীন সচল প্রান্তরের মতো, যেন একটা ভূমিকম্পের প্রভাবে বিরতিহীন আলোড়িত হয়ে চলেছে, এতো উজ্জল যে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না। দূরে স্থির হয়ে আছে প্রকাণ্ড আইসবার্গ, পাহাড়ের মতো উঁচু। আরেকটা, আকারে কিছুটা ছোটো, ওদের পিছনে কালো মেঘের গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে। ওটাকে দেখে ছবছ একটা পালতোলা জাহাজের মতো লাগলো।

এখন আর ব্রিজ থেকে নেমে যাবার সাহস পাচ্ছে না রানা। এরিকা আর নিক শেডি সারাক্ষণ হাভালের কেবিনে থাকছে, রেডিওর মেসেজ যা আসছে তারাই খানিক পরপর জানিয়ে যাচ্ছে ওকে। লিবার্টি-  
যাত্রা অন্তত-১

ফাইন্ড রিপোর্ট করেছে, প্রপেলার শ্যাফট-এ ফাটল দেখা দিয়েছে, আর রাডার-টা প্রায় ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ওটাকে সরিয়ে আনেকটা রাডার ফিট করার চেষ্টা করেছে তারা। বড় থেমে যাওয়ায় এই মুহূর্তে বিধ্বস্ত হবার ভয় নেই। একটা চওড়া পানিপথ সম্পর্কে রিপোর্ট করলো তারা, দক্ষিণ-পশ্চিমে লম্বা, ওদের পজিশন থেকে আধ মাইল দূরে।

‘আমরা যদি ওটায় পৌঁছুতে পারি,’ আপন মনে বললো রানা, ‘আর কিরে গিয়ে যদি গল্পটা রাডার মাকে শোনাই, নির্ধাৎ মীরপুর মাজারে ছুটবে সে।’

ওদের পানিপথটা ক্রমশ সরু হয়ে যাচ্ছে দেখে চেহারা কালো হয়ে গেল নিক শেডির, ঘন ঘন লাফাচ্ছে কণ্ঠের হাড়। তবে মাইল-খানেক এগোবার পর আবার চওড়া হলো পানির বিস্তার, সামনে অসংখ্য টুকরো বরফের ছড়াছড়ি। হেল্মসম্যানকে সরিয়ে দিয়ে হুইলের দায়িত্ব নিজে নিলো রানা। চারদিকে শুধু বরফের ভাসমান স্তর, সামনের পানিপথটা দেখা যাচ্ছে না।

তারপর আবার পানির বিস্তৃতি আকারে ছোটো হতে শুরু করলো। খানিক পরপর এঞ্জিন বন্ধ রাখতে বাধ্য হলো রানা। তবে ভাগ্য ভালো যে বরফের কিনারাগুলো মসৃণ, জাহাজের সাথে ধাক্কা লাগলেও কোনো কতি হলো না।

তারপর চওড়া পানিপথটা দেখা গেল ব্রিজ থেকে। যদিও জাহাজ আর পানিপথের মাঝখানে একটা জমাট বরফের প্রাচীর রয়েছে। প্রাচীরের গা ঘেঁষে এগোলো জাহাজ, রানার আশা একটা গলিপথ পেয়ে যেতে পারে। পাওয়া গেল, কিন্তু সেটা ধরে খানিক দূর যাবার পর সামনে কঠিন বরফের বাধা দেখতে পেলো ওরা। কানাগলি, ঢোকা যায়

কিন্তু বেঙ্গার পথ নেই। অথচ মাত্র ছ'শো গজ দূরে ওদের কাক্ষিত  
পানিপথটা দেখা যাচ্ছে। বিপদ দেখা দিলো পিছন থেকেও। ঢোকার  
সময় সরু গলিপথটায় বরফ ছিলো না, কিন্তু ঢোকার পর ছ'পাশের  
বরফ মাঝখানের ব্যবধান কমিয়ে গলিপথটাকে বন্ধ করে দিয়েছে।  
অর্থাৎ ফিরে যাবার আর কোনো রাস্তা নেই।

‘ওঁতো মারুন,’ পরামর্শ দিলো নিক শেডি। সামনের বরফ পাঁচি-  
লের দিকে তাকিয়ে আছে সে। ‘খুব একটা চণ্ডা নয়। সংঘর্ষের  
মুহুর্তে, ফর গডস সেক, এঞ্জিন বন্ধ করে দেবেন।’

‘জাহাজের সবাইকে বলে দাও,’ নির্দেশ দিলো রানা। ‘ডেকের  
ওপর শুয়ে পড়তে হবে।’ মই বেয়ে তরতর করে নেমে গেল নিক  
শেডি। পাঁচিলটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রার্থনা করলো রানা।  
দেড় কি ছ'ফুট পুরু হবে ওটা। কিনারা সামান্য একটু মাথা তুলে  
আছে পানির ওপর। ক্যাচারের বো কতোটা শক্ত কে জানে। তবে,  
ওঁতো মেরে পাঁচিল ভাঙার চেষ্টা করা ছাড়া আর কোনো উপায়ও  
নেই। লিবাটি-ফাইভ অচল অবস্থায় বরফে আটকা পড়েছে, মানুষ-  
জলোকে উদ্ধার করার জন্যে বরফ গলার অপেক্ষায় থাকা অমানবিক  
সিদ্ধান্ত হবে।

সবাইকে সাবধান করে ত্রিজে ফিরে এলো নিক শেডি। টেলিগ্রাফের  
অধ্যক্ষ এঞ্জিনরুমকে ইমার্জেন্সি ফুল অ্যাহেড-এর নির্দেশ দিলো  
সবাই।

জাহাজে লাভ করে ছুটলো জাহাজ। ছইলটাকে আলিসন করলো  
বরফের অবিচ্ছিন্ন পাঁচিলটা ছুটে কাছে চলে আসছে। একে-  
একটি মুহুর্তে এঞ্জিন বন্ধ করার নির্দেশ দিলো রানা। কয়েকটা  
মুহুর্ত। তারপর সংঘর্ষ। অকস্মাৎ স্থির হয়ে গেল জাহাজ।

হুইলটা যেন ছিটকে এসে ধাক্কা দিলো রানার বুকে, কুসকুস শালি করে বেরিয়ে গেল সমস্ত বাতাস। সামনের দিকে কুকলো ব্রিজ। ওদের সামনে যেন রাইফেল গর্জে উঠলো, পরমুহূর্তে ইম্পাক্টের সাথে বরফের ঘষা খাওয়ার শব্দে বাকি সব আওয়াজ চাপা পড়ে গেল।

একনাগাড়ে বিশ-পঁচিশবার ঝাঁকি খেলো লিবার্টি-ফোর, তারপর দিবাি হেলেছলে বরফমুক্ত পানিতে বেরিয়ে এলো। 'স্নো অ্যাডেড,' নির্দেশ দিলো রানা। মই বেয়ে এরিকা ব্রিজে উঠে এলো যেন একটা দমকা বাতাস। রানা সাবধান হবার আগেই, ওর পিঠে প্রচণ্ড এক চাপড় মারলো সে। 'ওয়েল ডান।'

'বাবারে।' ককিয়ে উঠলো রানা।

'বরফ! বরফ!' আরেকটা অর্ধ-জলমগ্ন বরফস্তর।

খানিক পর, এরিকা নেমে গেছে ব্রিজ থেকে, নিক শেডি বিড়বিড় করে উঠলো, 'ভাবছি রোসেটের মতলবটা কি!'

'তারমানে?'

'স্ট্যাণ্ডবাই-এর অর্ডারটার উত্তরে সাড়া দেয়নি সে, মনে আছে?'

'তারা হয়তো নির্দেশটা শুনতে পায়নি,' বললো রানা। 'রেডিও হয়তো কাজ করছিল না।'

'হয়তো।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো নিক শেডি, তারপর বললো, 'মিঃ রানা। আপনি কি উপলব্ধি করেন, তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ার লোক শুধু আমি আর আপনি?'

'আসল কথাটা কি বলতে চাও বলে ফেলো।'

'কি জানি। কেমন যেন একটা অসুভূতি হচ্ছে আমার। আমরা আইস প্যাকে ঢুকতে যাচ্ছি, একশো মাইলের মধ্যে লিবার্টি-থ্রি বাদে সচল কোনো জাহাজ নেই।'



‘তাতে কি ?’ রানা ধারণা করলো, আর্টার্কটিকার নির্জনতা প্রভাব ফেলেছে নিক শেডির ওপর, মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে সে।

‘আমাকে হয়তো আপনি পাগল ভাবছেন,’ বললো নিক শেডি, ‘কিন্তু কেন যেন বার বার শুধু একটা কথাই ফিরে আসছে মনে। মার্ক রোসেট যদি এক টিলে আপনাকে আর আমাকে সরিয়ে দিতে পারে, ইলেকট্রিক চেয়ারে বসার ভয়টা দূর হবে তার।’

‘কেন, আর সবার কথা ভুলে যাচ্ছে ? মারিকা, ভেনসম, সাত্তিক ছাড়াও আরো লোক আছে না ?’

‘ওদেরকে সে গুরুত্ব দেয় না, তা দিলে আপনার সাথে দর কষতো না।’ ব্রিজের ওপর পায়চারি শুরু করলো নিক শেডি। ‘ভেনসমের মুখ বন্ধ করা কঠিন কিছু না। চেয়ারম্যানের ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সে তার এতো সুন্দর ক্যারিয়ার কেন নষ্ট করতে যাবে ? এ-ধরনের লোকেরা বিশ্বাস করে পানিতে বাস করতে হলে কুমীরের সাথে লাগতে নেই। আর মারিকার সাক্ষী কোনো গুরুত্ব বহন করে না।’

‘সাত্তিক ?’ জিজ্ঞেস করলো রানা। ‘আমার ধারণা, কিছু একটা জানে সে।’

‘পরীক্ষার কিছুই সাত্তিক জানে না। আপনারা জেরা করার পর তার সাথে আমার কথা হয়েছে।’

‘তাহলে এতো পরীক্ষার করে কিভাবে বর্ণনা দিলো ঘটনাটার ? ডেকে বোনার পাইটনের সাথে ঠিকই দেখা হয়েছিল মার্কের। ঠিক যা ঘটেছে, তাই বলেছে সে। এমনকি বোনার পাইটনের মুখে সিগার ছিলো, তা-ও বলতে ভুল করেনি। বানানো গল্প হলে এভাবে মিলে যেতো না।’

‘বানায়নি,’ বললো নিক শেডি। ‘বোনার পাইটনকে শেষবার যাত্রা অণ্ড-১

জীবিত এরা শুধু মার্ক দেখেনি, সাভিকও দেখেছে। পাইটনের  
ডেকে ছিলো সে। বারোটোর ঠিক পরপরই তাঁকে রেখে চলে আসে  
হ'জনেরই ধারণা হয় কুয়াশা সরে যাবে, তাই লিবার্টি-ফাইভে দিগে  
বলে একটা নোট রেডি করার জন্যে চলে আসে সাভিক। পনের  
মিনিট পর সরে যায় কুয়াশা।

গভীর হলো রানা। 'কথাটা তদন্ত কমিটিকে জানায়নি কেন সে।  
'তার বক্তব্য নিরপেক্ষ নয় বলে ধরে নেয়া হবে, তাই। ঘটনা  
সাভিক ঘটেতে দেখেনি। কি ঘটেছে আন্দাজ করেছে মাত্র।  
অদৃশ্য হবার আগের কয়েকটা মুহূর্ত বোনার পাইটন কোথায় ছিলো  
তা জানতো সে। আপনি যদি মার্ককে বলতেন যে ঘটনার বর্ণনা  
সাভিকের কাছ থেকে পেয়েছেন, বোনার পাইটনের সাথে তার তর্ক  
কথা স্বীকারই করতো না সে।'

'হুম।'

'আমি ভবিষ্যতের কথা ভাবছি,' নিক শেডি বললো। 'আমরা যদি  
লিবার্টি-ফাইভকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হই, কি ঘটবে আন্দাজ করতে  
পারেন ?'

'হ্যাঁ,' বললো রানা, 'এই ভয়টা নিজেও করছে ও। 'কোকুন তখন  
লিবার্টি-থ্রু কে চেষ্টা করে দেখতে বলবে।'

'আর তখন যদি মার্ক জানায়, পরিস্থিতির দরুন তারা এগোতে  
পারছে না, ওদেরকে হয়তো কোনোদিনই আর উদ্ধার করা সম্ভব  
হবে না। আপনি ভেবেছেন হ'জন সাক্ষীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার  
এই সুযোগ ছাড়বে সে ?'

'মার্ক রোসেটকে তুমি জাত খুন্সী বলে ধরে নিচ্ছে কেন ?'

'তাকে আমি চিনি, আমাকে তার সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ বলতে

পারেন।' নিক শেডির তিক্ত হাসিটুকু কর্কশ শোনালো। 'বাপ আলাদা হলেও, আমরা একই মায়ের সন্তান, তবে মাতুলের একা শুধু সে পেয়েছে—আমি পাইনি, সেটা বোধহয় আমার সৌভাগ্য।'

'কেন, একথা বলছো কেন?'

'মায়ের হাতে গড়া ওটা একটা শয়তানের বাচ্চা,' বললো নিক শেডি। 'ছোটবেলা থেকে দেদার পরসা পেয়েছে হাতে। কখনো কোনো জিনিসের জন্যে কষ্ট করতে হয়নি তাকে। বোট, পার্টি, গাড়ি, মেয়ে আর টাকা, চাহিবামাত্র মা জননী এই সব মহাঘা বস্তু তাহার হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। শুধু একটা জিনিস পারিনি মার্ক, সেটা দান করার ক্ষমতা এমনকি তার মায়েরও ছিলো না বা নেই।'

'কি সেটা?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ক্ষমতা। পাওয়ার সম্ভাবনা সব সময়ই ছিলো, কিন্তু বুড়োও মরে না, মা তার হাতে সর্বময় ক্ষমতাও তুলে দিতে পারে না। কর্নেল ওয়াকার রোসেট নিজেই ক্ষমতালোভী, শরীরে যতোদিন কুলিয়েছে ছেলেকে ভাগ বসাতে দেয়নি। ফলে, দা এট সাইকোলজিস্ট নিক শেডির বিশ্বাস, প্রকাণ্ড একটা হীনমন্যতারোধে ভুগছে মার্ক রোসেট। তার ভেতর নৈতিকতার বালাই নেই, নিঙ-নাংসীদের দলে ভিড়ে অসহায় যুবতী মেয়েদের ওপর ক্ষমতা ফলিয়েছে, কিন্তু সত্যিকার ক্ষমতার অভাবে হতাশা তার ভেতর বাকদের মতো অপেক্ষায় আছে বিস্ফোরণের। সব মিলিয়ে, মার্ক রোসেট এখন একটা বিপজ্জনক নোমা।' হঠাৎ কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসলো সে। 'অবশ্য, এ-সব আমার ধারণা মাত্র। ভুলে যান।' মইয়ের দিকে এগোলো সে, ঘাড় ফিরিয়ে শেষ একবার তাকালো রানার দিকে। 'তবে, যতোটা পারা যায় স্পীড বাড়ান।' ব্রিজ থেকে নেমে গেল।

নিক শেডি বিপদের যে ভয় করছে সেটা অমূলক নয়, ভাবনা রানা। ওদের পিছন দিকে কোথাও রয়েছে লিবার্টি-খি। রানার বন্ধ করার প্রস্তাব দিয়ে মার্ক আসলে স্বীকার করে ফেলেছে, বোনার পাইটনকে সে-ই খুন করেছে। একজন খুনী তার অপরাধ চাপা দেবার জন্যে আরো খুন করতে পারে।

আবার বৃষ্টি শুরু হওয়ায় মার্কের কথা আপাতত ভুলে গেল রানা। দৃষ্টিসীমা আবার ক্ষুণ্ণ কমে এলো। কয়েক শো গজ দূরে কি হচ্ছে বোঝার উপায় থাকলো না। বিপজ্জনক বুঁকি নিয়ে স্পীড না কমানোর সিদ্ধান্ত নিলো রানা।

লিবার্টি-ফাইভের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করছে ওরা। কতিপয় জাহাজটার ছ'মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বিশাল একটা আইসবার্গ রয়েছে, মাথাটা সমতল, শুধু দক্ষিণ কোণে বরফের একটা চূড়া খাড়া হয়ে আছে। ওটাই ওদের চিহ্ন।

ন'টার খানিক পর লিবার্টি-ফাইভের কাছাকাছি পজিশনে ওরা পৌঁছেছে বলে ধারণা করলো রানা। আজ জানুয়ারী মাসের আট তারিখ, সকাল। দৃষ্টিসীমা নগণ্য। আইসবার্গটাকে দেখতে পারার কোনো সম্ভাবনা নেই বুঝতে পেরে জাহাজ ধামিয়ে আবহাওয়া পরিষ্কার হওয়ার অপেক্ষায় থাকার সিদ্ধান্ত নিলো রানা। এই মুহূর্তে খোলা পানিতে রয়েছে লিবার্টি-ফোর, আশপাশে পানির ওপর কোথাও বরফ দেখা যাচ্ছে না। যদিও বাতাসের গতি বাড়ছে, সাগরে ঢেউও তুর্দান্ত। পানির নিচে ডুবে থাকা বরফের সাথে বরফের সংঘর্ষে ভেঁতা শব্দ হচ্ছে বিরতিহীন। সেটাকে ছাপিয়ে আরো একটা গভীর আওয়াজ শুনতে পেলো ওরা। এরিকা জানালো, নিরেট প্যাক আইসের কোথাও একটা প্রেশার রিজ তৈরি হচ্ছে।

সময় কাটিতে চায় না। ওরা যেন অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করছে। দেখতে না পেলেও, রানার মনে হলো ওরা একটা ফাঁদে আটকা পড়েছে। জুদের মানসিক অবস্থা ভালো নয়। অজানা আশংকায় ভুগছে সবাই। নিজেকে ভয় ও আশ্বাস-দানের চেষ্টা করলো রানা, মারিকা কাছাকাছি কোথাও আছে, তাকে উদ্ধার করতে এসেছে ও।

তারপর ত্রিজে উঠে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে এরিকা জানালো, 'লিবার্টি-ফাইভের রেডিও হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। একটা মেসেজের মাঝখানে।'

আন্টার্কটিকার সর্বত্রাসী নির্জনতা যেন আরো এক পা এগিয়ে এলো। 'মেসেজটা কি ছিলো?'

'বরফ এখন অত্যন্ত পুরু আর কঠিন। আমরা বোধহয়...। বাস, এইটুকু। তারপর একটা চিংকার মতো শুনতে পেলাম। সেই সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আমার ভয় হচ্ছে...।'

'হাভাল...?'

'সে বারবার ডাকছে।'

'খামতে নিষেধ করো।'

মই বেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে গেল এরিকা। খানিক পর ত্রিজে এলো নিক শেডি। 'ডাকা হচ্ছে, কিন্তু কোনো সাড়া নেই।'

কানে কামান দাগার শব্দ নিয়ে সিঙ্কান্তে পৌঁছুতে চাইছে রানা। আইস প্যাকে কি ঘটছে, ওগুলো কিসের শব্দ, জানা নেই ওর। শুধু জানা আছে, লিবার্টি-ফাইভ বরফে আটকা পড়ে ডুবে যাচ্ছে, মারা যাচ্ছে অসহায় কিছু লোক, তাদের মধ্যে মারিকাও আছে।

'কিছু একটা করুন, মিঃ রানা। ওদের বাঁচান। এঞ্জিন স্টার্ট দিন।' টেলিগ্রাফের দিকে হাত বাড়িয়েও হাতটা টেনে নিলো রানা। নিঃ-

শব্দে মাথা নাড়লো ও। 'আমাকে সবার কথা ভাবতে হবে, নিক। সামনে কি আছে না দেখে অন্ধের মতো আমি জাহাজ চালাতে পারবো না। ভিজিবিলাটি ইম্প্রুভ করুক।'

প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলো নিক শেডি, অস্থিরতার সাথে পারচারি শুরু করলো সে। তার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটা গ্লেশ ও দরদ অমুভব করলো রানা। একটা পা ছোটো, ফলে হাঁটার সময় তার কোমর অদ্ভুতভাবে খানিকটা মোচড় খায়, দেখে মনে হয় লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে সে। লোকটা সং আর সরলমনা, একমাত্র বোনের অমঙ্গল আশংকায় পাগলপারা হয়ে আছে। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো রানা। কোনো কোনো মানুষের ভাগ্য কেন যে এতো খারাপ হয়!

দশটার দিকে আবহাওয়ার একটু উন্নতি হচ্ছে বলে মনে হলো। বৃষ্টি কমলো। পীড়াদায়ক অলসভঙ্গিতে। সেই সাথে খুব ধীরে ধীরে প্রসারিত হলো দৃষ্টিসীমা। ভোর-রাতের মতো আলোও ফুটলো। ভেজা চোখ নিরে ব্রিজে উঠে এলো এরিকা। 'কোনো সাড়া নেই ওদের।'

কিছু বললো না রানা। সে-ও জানে ওরা যদি পৌঁছতেও পারে, উদ্ধার করার মতো কাউকে হয়তো পাওয়া যাবে না।

আরো খানিক পর বৃষ্টি থামার সাথে সাথে চোখের সামনে থেকে যেন একটা পর্দা সরে গেল। সামনে একটা পানিপথ দেখতে পেলো ওরা, প্যাক আইসের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে, কালো পানিতে ভাসছে বরফের স্তর। দক্ষিণ-পশ্চিম দিগন্ত থেকে মেঘ সরে যাওয়ার সাথে সাথে পারদের মতো স্বলজ্জলে সূর্য উঠলো আকাশে। রোদ পড়ায় আইসবার্গটাকে পরিষ্কার দেখতে ও চিনতে পারলো

ওরা । মাথার দিকটা সমতল, শুধু দক্ষিণ প্রান্ত উচু হয়ে আছে বর্শার-  
ডগা আকৃতি নিয়ে ।

আবার সচল হলো জাহাজ । বো ঘুরিয়ে রাখা হয়েছে মাত্র, দপ-  
করে নিভে গেল সূর্যটা । আকাশে কালি লেপে দিয়ে উঠে আসছে  
পশ্চিম থেকে বিশাল মেঘ । ‘আবার বৃষ্টি আসবে, তুষারও পড়তে  
পারে,’ বিড়বিড় করে বললো এরিকা ।

চোখে বিনো কিউলার তুলে উত্তর-পূর্ব দিকটার তাকালো রানা ।  
বরফ নিরেট ইম্পাভের মতো কঠিন, কোথাও কোনো কঁক বা ফাটল  
নেই—আইসবার্গটার চাপে বরফের বিচ্ছিন্ন স্তরগুলো ছোড়া লেগে  
গেছে । তারপর হঠাৎ জিনিসটা দেখতে পেলো রানা । সাদা বিস্তৃতির  
ওপর কালো একটা দাগ । ওপরের দিকটা ক্যাচার আকৃতির  
বলেই গনে হলো । বার কয়েক সাইরেন বাজালো রানা । মাস্তুল আর  
চিমনি নিচের দিকে কাত হয়ে আছে । ভালো করে দেখার জন্যে  
কাকের বাসা থেকে লুকআউটকে নেমে আসতে বললো রানা, তার  
ছায়গায় নিজে উঠলো ।

মাস্তুলের মাথা থেকে পরিষ্কারই দেখতে পেলো ও । খুব বেশি হলে  
এক মাইল দূরে ওটা । দুটো বরফ স্তরের মাঝখানে আটকা পড়েছে,  
স্তর দুটো আইসবার্গের চাপে সরে আসছে ক্যাচারটাকে পিষে ফেলার  
জন্যে । বরফের ওপর খুদে মূর্তিগুলোকে নড়াচড়া করতেও দেখলো  
রানা, রসদ ইত্যাদি জাহাজ থেকে নামাচ্ছে । চওড়া পানিপথ, যেটায়  
ওরা রয়েছে, আর জাহাজের মাঝখানটায় চোখ বুলালো ও । সংক্ষিপ্ত  
পথে গেলে দূরত্ব আধমাইলের মতো । বেশ কয়েকটা সরু পানিপথ  
ক্যাচারটার দিকে একেবেঁকে এগিয়েছে । গায়ে হঠাৎ বৃষ্টির ফোঁটা  
পড়ায় আকাশের দিকে মুখ তুললো রানা । গোটা আকাশই ঢাকা

পড়ে গেছে মেঘে । এবার উত্তর-পূর্ব দিক থেকেও এগিয়ে আসছে ঝড় ।  
বাতাস যেন বরাফের ওপর এনে ফেলবে মেঘগুলোকে ।

ক্রমা ভেকে বেরিয়ে এসেছে । রেলিঙে ভর দিয়ে লিবার্টি-ফাইভের  
দিকে তাকিয়ে আছে সবাই । শুধু একজন বাদে । নিক শেডি ।

মানুষল থেকে রানা নামতেই ওর একটা বাছ খামচে ধরলো সে ।  
'ওটা কি ? পানিপথ ধরে ওটা কি আসছে ?' প্রচণ্ড উদ্বেজনায় থরথর  
করে কাঁপছে নিক শেডি । লিবার্টি-ফাইভের দিকে নয়, হাতটা লম্বা  
করলো আরেক দিকে, ওদের বো বরাবর সোজা ।

ঝম ঝম করে বৃষ্টি শুরু হলো ।

তাকে পিছু নিয়ে এক ছুটে ব্রিজে ফিরে এলো রানা । আবার বোর  
দিকে সোজা হাত লম্বা করলো নিক শেডি । সেদিকে তাকিয়ে কাঁধ  
ঝাকালো রানা, বললো, 'কই, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না ।  
ভুল দেখেছো তুমি, ওদিক থেকে কোনো জাহাজ আসার প্রশ্নই ওঠে  
না ।'

চেহারা দেখে মনে হলো তর্ক করবে নিক শেডি, তবে কিছু না বলে  
ইতস্তত করতে লাগলো । খানিক পর বিড়বিড় করে শুধু বললো, 'মনে  
হলো যেন পরিষ্কারই দেখলাম, ঠিক যেন একটা ক্যাটার ।'

'আলোছায়ার কারসাজি,' মন্তব্য করলো রানা ।

ইতস্তত ভাবটা তবু যায় না নিক শেডির । 'হ্যাঁ, তাও হতে পারে ।  
কিন্তু...'

লিবার্টি-ফোর ঘন ঘন সাইরেন বাজিয়ে এগিয়ে চলেছে । পানি-  
পথের উত্তর-কিনারা ঘেঁষে জাহাজ চালাচ্ছে রানা । কিনারায় একটা  
ফাঁক দেখতে পেয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ভেতরে ঢুকে পড়লো ও,  
ভাসমান বরফ স্তরগুলোকে এড়িয়ে । ওদের সামনে কামান দাগার

রানা-১৭৮



আওয়াজ তুলে আইসবার্গের দিকে প্রেশার রিঞ্জ তৈরি হচ্ছে। প্রতি ত্রিশ সেকেন্ডেও অন্তর একবার করে সাইরেন বাজালো রানা; আশা, সম্ভব হলে জবাব দেবে লিবার্টি-ফাইভ।

ভাসমান আলগা বরফগুলোর আরো গভীরে ঢুকে পড়েছে লিবার্টি-ফোর। কান পেতে আছে ওরা, কিন্তু তুমুল বর্ষণের ঝম ঝম আর বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজই শুধু শোনা গেল, খানিক পরপর কড় কড় করে বজ্রপাতের মতো তীক্ষ্ণ শব্দ হলো বিক্ষোভিত বরফের।

সামনে গায়ে গা ঠেকিয়ে ভাসছে আলগা বরফের টুকরো, এগো-বার পথ নেই। এঞ্জিন বন্ধ করার নির্দেশ দিলো রানা। একের পর এক ছুটে এসে ঢেউগুলো আঘাত করছে ক্যাচারের গায়ে—পানির ঢেউ নয়, বরফের। প্রতিটি সংঘর্ষের সাথে থরথর করে কাঁপছে লিবার্টি-ফোর। মনে মনে প্রমাদ গুলো রানা। ক্রুদের মুখ শুকিয়ে গেছে, দু'একজনের চোখে আতংকের সুস্পষ্ট ছাপ দেখতে পেলো ও। ওর নিজেরও শুকিয়ে গেছে গলা, বুক। লিবার্টি-ফাইভকে উদ্ধার করতে আসাটা বোধহয় বোকামি হয়ে গেছে। আবহাওয়া আর সাগরের যে অবস্থা, প্রাণ নিয়ে ফেরার কথা ভাবা যায় না। লিবার্টি-ফাইভের জন্যে এখন আর কিছু করবারও নেই ওদের। করণীয় একটাই, সাইরেন বাজানো। ত্রিশ সেকেন্ডেও পরপর বেজে চলেছে সেটা, খামার পর কান পাতার পালা। সাড়া পাওয়া তো দূরের কথা, সাইরেনের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরতও এলো না। শব্দটাকে বাতাস যেন ছোঁ দিয়ে আকাশের দিকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ভোর-রাতের আধো অন্ধকার এখন অনেকটা সবুজাভ হয়ে উঠেছে। এ-যেন জ্যাস্ত কবর হয়েছে ওদের। ফ্লাইং ডাচম্যান এবং অন্যান্য কিংবদন্তীর কথা মনে পড়ে গেল রানার। মনে হলো, চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে ওরা।

ঠিক এই অবস্থায়, স্বভাবমতো, আবার রানার একটা বাহু খামচে ধরলো নিক শেডি। তার অপর হাতটা পোর্ট কোয়ার্টারের দিকে প্রসারিত। তারস্বরে চিংকার ছুড়ে দিলো লোকটা। সেদিকে তাকিয়ে দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে ঝাপসা একটা আকৃতি দেখলো রানা। পর-মুহূর্তে হারিয়ে গেল আবার। চোখ রগড়ালো রানা, ভাললো নিশ্চয়ই ভুল দেখেছে। কিন্তু এক মুহূর্ত পর আবার দেখতে পেলো। জাহাজ। একটা জাহাজ। শুধু চিমনি নয়, ঝাপসা একটা বো-ও দেখতে পেলো। ওটা যেন একটা ভৌতিক জলযান, একবার দেখা যায়, পরমুহূর্তে বৃষ্টির ভারি পর্দার ভেতর গায়েব।

‘ওটা কি লিবার্টি-ফাইভ?’ রানার কানে চিংকার করলো নিক শেডি।

মাথা নাড়লো রানা, আবার হারিয়ে ফেলেছে সেটাকে। তবে জানে, লিবার্টি-ফাইভ নয়। জাহাজটা ক্যাচারের তুলনায় আকারে অনেক বড়, কোর্সও সাদা উজ্জ্বলতা অর্থাৎ প্যাক আইসের দিকে, ওদেরই মতো। দেখে অনেকটা যুদ্ধজাহাজের মতো লেগেছে রানার। নিজের অজান্তেই ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠলো। কি ওটা? কারা আসছে? জাহাজটাকে যেখানে দেখা গেছে, সেদিকে একটা পরিষ্কার পানিপথ চলে গেছে, লক্ষ্য করলো রানা। সিদ্ধান্ত নিলো, খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার। ‘স্নো স্পীড অ্যাংগেড,’ নির্দেশ দিলো ও।

পানিপথে ঢোকান সময় একনাগাড়ে সাইরেন বাজালো রানা। হঠাৎ বো-র কাছ থেকে আর্তনাদ করে উঠলো লুকআইট। ‘ফুল অ্যাংগেড!’ নির্দেশ দিলো এরিকা, গলার রগগুলো ফুলে উঠলো তার, চোখ বিস্ফারিত। বৃষ্টির আকস্মিক বিরতি ওদের চোখের সামনে থেকে যেন একটা নিশ্চিহ্ন পর্দা সরিয়ে দিলো। ভোজবাজির মতো সামনে

উদয় হলো একটা জাহাজের ধারালো বো, সরাসরি ওদের দিকে ছুটে আসছে।

করার কিছুই নেই, তবু অপেক্ষার মুহূর্তটিকে অনন্তকাল বলে মনে হলো। সাইরেনের কর্ড ধরে প্রায় ঝুলে পড়লো রানা। ফল হলো উন্টো, আরো বেড়ে গেল জাহাজটার গতি। সেটার এঞ্জিনের গুঞ্জন পরিকার শুনতে পেলো রানা। চিৎকার করে কি যেন বললো নিক শেডি, লাফ দিয়ে পড়লো ক্যাটওয়াকে। ক্যাটওয়াক ধরে গান প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটেছে সে, কি বলেছে এতোক্ষণে বুঝতে পারলো রানা। মাত্র একটা শব্দ উচ্চারণ করেছে নিক শেডি—মার্ক!

পরমুহূর্তে জাহাজটাকে চিনতে পারলো রানা। ওটা একটা করভেট, ক্যাচারে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এখন রানা জাহাজটার কালো গায়ে সাদা হরফগুলোও পড়তে পারছে—লিবার্টি থি।

‘অল হ্যাণ্ডস অন ডেক,’ ভয়াবহ বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে অস্বাভাবিক শাস্ত ও দৃঢ়তার পরিচয় দিলো রানা। ‘স্টপ এঞ্জিন!’ এরপর রানা এঞ্জিনরুম থেকে সবাইকে ডেকে উঠে আসার নির্দেশ দিলো। চট করে একবার প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকালো ও।

ছুটে আসা জাহাজটার দিকে হারপুন ঘোরাচ্ছে নিক শেডি।

করভেটের ব্রিজে মাত্র একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে কালো মেঘ, ঝাঁক ঝবির মতো লাগছে মূর্তিটাকে। ভিজে অয়েলস্ট্রিন চকচক করছে গায়ে। হাত ছুটো জড়িয়ে ধরে আছে হুইলটাকে। তার গোটা শরীর হুইলের ওপর ঝুঁকে আছে, যেন একজন ঘোড়সওয়ার তার ঘোড়াটাকে লাফ দেয়াতে যাচ্ছে। ভুল দেখেনি নিক শেডি, লোকটা সত্যিই মার্ক রোসেট।

পরমুহূর্তে একসাথে সব কিছু ঘটতে শুরু করলো।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)



সুদ রানা

মাত্রা অশুভ ২

মজী আনোয়ার হোসেন





মাসুদ রানা-১৭১

## যাত্রা অশুভ-২

ছুইখণ্ডে সনাও রোমাঞ্চোপন্যাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

জাহাঙ্গীর ছেড়ে বরফে নামতে বাধ্য হলো ওরা।

কে উদ্ধার করবে এখন ওদের ?

কে উদ্ধার করবে মারিকা পাইটনকে ?

ভাবছেন, ফ্যান্টরি শিপ কোকুন ?

তার নিজেরই কি অবস্থা জানেন আপনি ?

ভয়ঙ্কর বৈরী প্রকৃতির নির্মূর নগ্ন চেহারা

দেখে নিল এবার মাসুদ রানা।

দেখলো মানুষের নীচতা, শঠতা, ভীকৃত্য ;

দেখলো সাহস, সত্যতা ; দেখলো মহত্ত্ব।

— রানার বুক লক্ষ্য করে রাইফেল তুললো মার্ক রোসেট।  
তারপর ?

বাইশ টাকা



সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০

শো-রাম ৪ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

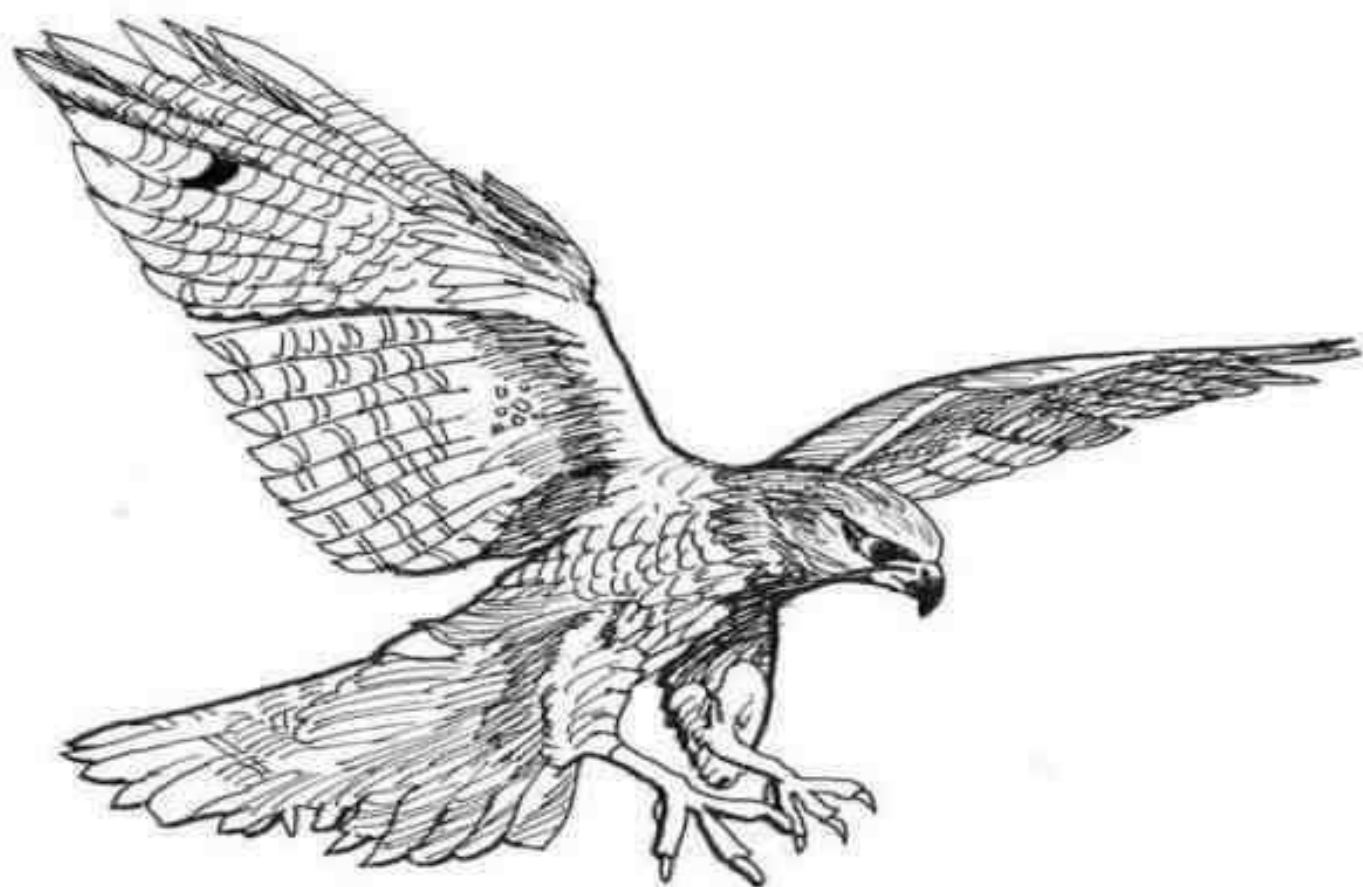


<কাউন্সিল>

থ্রিলার খেবরা

[FB.COM/GROUPS/THRILLERKHEKO](https://www.facebook.com/groups/THRILLERKHEKO)

Scanned By



Blood Falcon

## পূর্বাভাস

দিশেহারা এক যুবতী, মারিকা পাইটন, রানা এঙ্গেলির লগুন শাখায় এলো সাহায্যের আশায়। তার বাবা পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর ফ্যাক্টরি শিপ কোকুনের ম্যানেজার, কোকুন এই মুহূর্তে অ্যান্টার্কটিকায় রয়েছে। মারিকার ধারণা, কোম্পানীর চেয়ারম্যান কর্নেল ওয়াকার রোসেটের ছেলে মার্ক রোসেট তার এবং তার বাবার বিরুদ্ধে ভয়ংকর কোনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মার্ক তাকে জোর করে বিয়ে করতে চায়, ব্ল্যাক-মেইল করার ভয় দেখাচ্ছে। বাবার নিরাপত্তার কথা ভেবেও উদ্বিগ্ন সে। তার বাবার সাথে ফ্যাক্টরি শিপে মার্ক রোসেটও আছে।

প্রথমে ব্যস্ততার দরুন মারিকাকে হতাশ করলেও, শেষ পর্যন্ত ঘটনা-চক্রে অ্যান্টার্কটিকার পথে রওনা হতে হলো রানাকে। কেপটাউনের পথে প্লেনে থাকার সময় পাইটন ও রোসেট পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে জানতে পারলো ও।

ওয়াকার রোসেট আর বোনার পাইটন পুরনো বন্ধু। কোম্পানীর বৈশিষ্ট্যগত শেয়ার রোসেট পরিবারের হলেও, মোটা একটা শেয়ারের মালিক পাইটন পরিবারও বটে। মার্ক রোসেট আর মারিকা পাইটন পরস্পরকে ভালোবাসতো, ওদের বিয়ের কথাবার্তাও পাকা হয়ে গেছে, কিন্তু মার্কের চারিত্রিক অধঃপতন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পর বেকে বসেছে মারিকা, মার্ককে সে বিয়ে করবে না। এ-কারণে বাপ-ছেলে দু'জনেই খুব খেপে আছে মেয়েটার ওপর। এই সময় কোকুন থেকে খবর এলো, ম্যানেজার বোনার পাইটন জাহাজ থেকে নিখোঁজ হয়েছেন।

ফ্যাক্টরি শিপে পৌঁছে জানা গেল, ক্রু আর অফিসারদের মধ্যে ছোটো



দল আছে। টনসবার্গ আর স্যাণ্ডেফোর্ডের লোকজন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী।  
 টনসবার্গের লোকেরা পাইটন পরিবারের ভক্ত। একে চলতি মোস্তাফা  
 তিমির অভাব, তার ওপর টনসবার্গের লোকজন ধর্মঘট শুরু করলো—  
 তাদের দাবি, বোনার পাইটনের মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে তদন্ত  
 কমিটি গঠন করতে হবে। তাদের দাবি ন্যায্য বলে সমর্থন করলো  
 রানা। পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠছে দেখে তদন্ত কমিটি গঠনে রাজি  
 হলেন কর্নেল ওয়াকার রোসেট। কমিটির চেয়ারম্যান করা হলো  
 রানাকে।

প্রথমে সাক্ষী-সাবুদ যা পাওয়া গেল, মার্ক রোসেটকে নিরপরাধ  
 বলেই মনে হলো। সে জানালো, ঘটনার দিন রাতে বোনার পাই-  
 টনের সাথে তার দেখাই হয়নি।

কিন্তু পরে জানা গেল মিথ্যে বলেছে মার্ক। তবে বোনার পাইটন-  
 কে ধাক্কা মেরে আহাজ থেকে ফেলে দেয়ার অভিযোগ অস্বীকার  
 করলো সে। জানালো, অতি লোভের বশে ভুয়া একটা স্বর্ণখনির  
 শেয়ার কিনে সর্বস্ব হারিয়ে ফেলেছিলেন বোনার পাইটন, তাই তিনি  
 আত্মহত্যা করেছেন।

তদন্ত কমিটির সভাই একমত হলো, ব্যাপারটা পুলিশ কেস।  
 রিপোর্টটা কর্নেল ওয়াকার রোসেটকে দিলো রানা, তিনি ওকে প্রতি-  
 শ্রুতি দিলেন কেপটাউনে ফেরামাত্র সেটা পুলিশের হাতে তুলে দেয়া  
 হবে। টনসবার্গের-লোকদের সন্তুষ্ট করার জন্যে কোকুনের আকটিং  
 ম্যানেজারের পদ থেকে মার্ককে সরিয়ে দিলেন তিনি, টনসবার্গের এক-  
 জন লোককে পদোন্নতি দিলেন, মার্ককে দায়িত্ব দিলেন একটা ক্যাচা-  
 রের। রানাও একটা ক্যাচারের দায়িত্ব পেলো। ডঃ নিক শেডি, তিনি  
 বিশেষজ্ঞ, রানার সাথে একই ক্যাচারে থাকলো—ইতোমধ্যে কুৎসিত,

মদ্যপ লোকটা সম্পর্কে অনেক কথা জেনেছে রানা। নিক শেডি বোনার পাইটনের অবৈধ সম্ভান, যদিও বাপকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো সে। যে মায়ের সম্ভান সে, তাকে কখনো কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি তার, মহিলা এখন ওয়াকার রোসেটের স্ত্রী অর্থাৎ মার্ক রোসেটের মা। রোসেট পরিবারকে ছুঁচোখে দেখতে পারে না সে। তার কাছ থেকেই জানা গেল, স্বর্ণখনির শেয়ার কিনে বোনার পাইটন সর্বস্ব হারাননি, কারণ কোম্পানীটা লালবাতি ছালার আগেই তিনি তার সব শেয়ার চড়া দামে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। মারিকার মতো তারও ধারণা, বোনার পাইটন আত্মহত্যা করতে পারেন না, তাকে হত্যা করা হয়েছে।

ক্যাচারগুলো তিনি ধরার জন্যে অ্যান্টার্কটিকার কয়েক শো মাইল জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো। মারিকা পাইটন রয়েছে ক্যাপটেন সাভিকের সাথে অন্য একটা ক্যাচারে, লিবার্টি-ফাইভে। লিবার্টি থ্রুতে রয়েছে মার্ক। রানার সাথে ডঃ নিক শেডি ছাড়াও লিবার্টি-ফোরে রয়েছে এরিকা পিটারসেন, বিগালদেহী মহিলা ফাস্ট মেট।

শুরু হলো তিনি শিকার। মাঝখানে একবার লিবার্টি থ্রু আর লিবার্টি-ফোর মিলিত হলো। রানাকে নিজের কেবিনে নিয়ে গিয়ে একটা অনায় প্রস্তাব দিলো মার্ক রোসেট। তদন্ত কমিটির রিপোর্টটা চেপে যেতে হবে। অনুরোধে কাজ না হওয়ায় রানা আর মারিকাকে জড়িয়ে কুংসা রটনার ভয় দেখালো সে, তাতেও কাজ না হওয়ায় বিশ লাখ ডলার ঘুষ সাধলো। তাকে হতাশ করে নিজের জাহাজে ফিরে এলো রানা।

এরপর মার্ক কি করবে, সহজেই তা অনুমান করতে পারলো নিক শেডি। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট রয়েছে ওয়াকার রোসেটের কাছে।

তিনি অস্থস্থ, যে-কোনো সময় মারা যেতে পারেন, কাজেই একমাত্র ছেলের অনায় আদার তিনি সম্ভবত রক্ষা না করে পারবেন না— অর্থাৎ রিপোর্টটা তিনি পুলিশের হাতে তুলে দেবেন না। বাকি থাকলো মারিকা, নিক শেডি, ক্যাপটেন ভেনসম আর রানা। ভেনসম ভীতু লোক, মালিকপক্ষকে চটানোর সাহস তার নেই। এনগেজমেন্ট হয়ে যাবার পর মার্ককে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না মারিকা, তাই তার চরিত্রের ওপর কলংক লেপনের জন্যে মামলা ঠুকবে মার্ক, ফলে সাক্ষী হিসেবে মারিকা ভেনসম গুরুত্ব পাবে না। বাকি থাকলো শুধু রানা। ওকে যদি সরিয়ে দেয়া যায়, মার্ক রোসেটকে তাহলে আর ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে হয় না।

ভয়াবহ ঝুঁকিগের মধ্যে খবর এলো, লিবার্টি-ফাইভ বিপদে পড়েছে, সম্ভবত ডুবে যাচ্ছে জাহাজটা। মারিকার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো রানা। সিদ্ধান্ত নিলো, উদ্ধার করতে যাবে ওরা।

তুমুল বৃষ্টি, তুষার ঝড়, ভাসমান বরফের বাধা তুচ্ছ করে এগোচ্ছে লিবার্টি-ফোর। হঠাৎ একটা জাহাজ দেখা গেল। একদিকে কাত হয়ে রয়েছে, বরফের ওপর নেমে পড়েছে কুরা। এই সময় আরেকটা জাহাজ, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো, বিপুলগতিতে ছুটে এলো ওদের দিকে, ধাক্কা মারার জন্যে। একেবারে শেষ মুহূর্তে জাহাজটাকে চিনতে পারলো রানা। লিবার্টি-থ্রি, ব্রিজে একা দাঁড়িয়ে আছে মার্ক রোসেট।

ইতোমধ্যে গান প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে গেছে নিক শেডি। হঠাৎ সব কিছু যেন এক সাথে ঘটতে শুরু করলো।

## এক

তীরবেগে ছুটে আসছে লিবাটি-থি, স্থির দাঁড়িয়ে আছে লিবাটি-ফোর, সংঘর্ষ একটা ঘটবেই। অকস্মাৎ কামান দাগার শব্দ নিয়ে বিক্ষোভিত হলো হারপুন গান, গান প্ল্যাটফর্ম থেকে ফায়ার করেছে ডঃ নিক শেডি। বৃত্ত রচনার ভঙ্গিতে ছুটলো হারপুন, বেরিয়ে গেল মার্ক রোসে-টের কাঁধের ওপর দিয়ে, পড়লো গিয়ে ব্রিজের পিছনে, সাপের মতো একেবেঁকে পিছু নিলো ফোররানার। ঠিক সেই মুহূর্তে লাফ দিয়ে ত্রিভুজ ঢুকলো এক লোক, কাঁধের ধাক্কায় মার্ককে একপাশে সরিয়ে দিয়ে বন বন করে ছইল ঘোরালো।

ঘুরতে শুরু করলো লিবাটি-থি, র বো। কাত হলো জাহাজ। এঞ্জিন-রুম টেলিগ্রাফ বেজে উঠলো, বাতাসের আর্তনাদ সত্ত্বেও লিবাটি-ফোর থেকে আওয়াজটা পরিকার শুনতে পেলো ওরা। তবে, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বো-টা এখন আর সরাসরি রানার দিকে ধেয়ে আসছে না। ধাক্কাটা লাগবে জাহাজের পিছন দিকে, বুঝতে পারলো রানা। ওদের প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে লিবাটি-থি, মাঝখানে অল্প কয়েক গজ যাত্রা অন্তত-১

ব্যবধান, প্রতি মুহূর্তে লিবার্টি-থ্রু বো-কে আকারে আরো বড় ও  
 ধারালো বলে মনে হলো। জুদের ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে অন্তর্ভুক্ত  
 করে নিউরে উঠলো রানা। লিবার্টি-থ্রু ওঁতোর লিবার্টি-ফোরের  
 পাতল টিনের মতো তুবড়ে-মুচড়ে ভেঙেহুঁরে একাকার হয়ে যাবে।

এঞ্জিন রুমের ঠিক পিছনে লাগলো আঘাতটা, পোর্ট বোটটানে  
 ওঁড়িয়ে দিলো, খেঁতলে দিলো ডেক প্লেট। আতংকিত জুরা ছিটকে  
 বেরিয়ে এলো আফটার ডেকে। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো জাহাজ, ইম্পা-  
 তের সাথে ইম্পাতের সংঘর্ষে কর্কশ আওয়াজ হলো। ডেকের ওপর  
 বস্তুর মতো সশব্দে আছাড় খেলো লোকজন। ব্রিজের একধারে,  
 কাঠের পার্টিশনের ওপর ছিটকে পড়লো রানা, হুস করে বেরিয়ে গেল  
 ফুসফুসের সমস্ত বাতাস। সংঘর্ষের আওয়াজ থামার লক্ষণ নেই।

তারপর স্থির হয়ে গেল সব। মনে হলো কিছুই নড়ছে না। জুরা  
 বাতাসের আর্তনাদ শোনা গেল, আর বরফ ভাঙছে যেন কামান দাগান  
 শব্দ নিয়ে। মুখ খুলে ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খাচ্ছে রানা।  
 পাঁজরে তীব্র ব্যথা অনুভব করলো। ধীরে ধীরে চারদিকের দৃশ্য সচল  
 হলো ওর চোখের সামনে। ব্রিজের এক কোণ থেকে অলসভঙ্গিতে  
 দাঁড়ালো এরিকা, উদভ্রান্ত দেখালো তাকে। আফটার ডেকেও লোক-  
 জন নড়াচড়া করছে। লিবার্টি-থ্রু বো দাঁড়িয়ে আছে যেন লিবার্টি-  
 ফোরের আফটার ডেকে সঁধিয়ে যাওয়া একটা বিশাল গৌড়-এর  
 মতো। সংঘর্ষের ফলে ওদের চিমনি খুঁকে পড়েছে। এঞ্জিনরুমের বাতাস  
 বেরিয়ে আসছে হু-হু করে।

লিবার্টি-থ্রু ব্রিজ নবাগত লোকটা নড়ে উঠলো। ঘুসি বাগিয়ে  
 তার দিকে ছুটে গেল মার্ক, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে। বাতাসে  
 ভেসে আসা তার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শুনতে পেলো রানা। ব্রিজ থেকে

বেরিয়ে গেল লোকটা। সেই সাথে ওদের দিকে ঘুরলো মার্ক। তার  
 ঠোট ফাঁক হয়ে আছে, হিংস্র পশুর মতো। দাঁতে দাঁত চেপে আছে  
 সে, চোখ দুটো বন্ধ উন্মাদের। ঝট করে এঞ্জিনরুম টেলিগ্রাফের দিকে  
 একটা হাত তুললো সে। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে আতঁচিংকার  
 বেরিয়ে এলো রানার গলা থেকে, লিবার্টি-থ্রিকে পিছন দিকে ঢালাতে  
 নিষেধ করলো ও। ওর গলা শুনতে পেলো মার্ক রোসেট, উত্তরে  
 একটা হাত তুলে টা-টা করলো সে—বিদায় জানাচ্ছে। পরমুহূর্তে  
 বেঙ্গে উঠলো এঞ্জিনরুম টেলিগ্রাফ।

আচ্ছন্ন বোধ করলো রানা, যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছে, চোখে  
 দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না ঠাণ্ডা মাথায় এতোগুলো মানুষকে  
 মৃত্যুর পথে ঠেলে দিতে পারে কেউ। ক্যানভাস উইণ্ডব্রেকার হ'হাতে  
 আঁকড়ে ধরে থরথর করে কাঁপতে লাগলো ও। রাগ, ঘৃণা, ভয় ও  
 বিস্ময়, একাধারে সবগুলো অনুভূতি আস করে ফেলতে চাইলো  
 ওকে।

জ্যান্ত হলো করভেটের এঞ্জিন। জাহাজটার পিছনে কালো পানি  
 টগবগ করে ফুটেছে, পানির রঙ বদলে বরফ-সবুজ হয়ে গেল, তারপর  
 ধীরে ধীরে ওদের কাছ থেকে পিছাতে শুরু করলো লিবার্টি-থ্রি।  
 ওদের জাহাজের পিছনটা ষটার সাথে নড়ে উঠলো। ইম্পাত হেঁড়ার  
 কর্কশ আওয়াজে রী রী করে উঠলো গা, লিবার্টি-থ্রির বো মুক্ত হয়ে  
 পিছিয়ে গেল। গান প্র্যাটফর্ম থেকে তারস্বরে চিংকার করছে নিক  
 শেডি, চিংকার করছে লিবার্টি-থ্রিকে থামানোর জন্যে। হারপুনের  
 ফোররানার পানি থেকে উঠে এলো ঢিলে লুপ-এর আকৃতি নিয়ে, ধীরে  
 ধীরে প্যাচমুক্ত হচ্ছে। সেটা টান টান হতেই করভেটের ভেতর কোথাও  
 থেকে ভোঁতা, চাপা একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। এক কি  
 যাত্রা অন্তত-২

হু'সেকেও নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলো রানা, দেখলো আওরাজ-টার দিকে ঝট করে ঘাড় ফেরালো মার্ক, লিবাটি-খি দীরগতিতে আরো একটু পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। জাহাজটার পেট থেকে সমস্ত বাষ্প বেরুচ্ছে, কর্কশ গলায় চিংকার করছে মার্ক। আর কিছু দেখার ঐর্ষ হলো না রানার, নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পেতে হবে শুকে। এক ছুটে ত্রিজে থেকে নিচে নেমে এলো ও।

পরিস্থিতি গুরুতর, পানির ওপর বেশিক্ষণ ভেসে থাকা যাবে না। আফটার বামহেড-এর দরজা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, হু হু করে পানি ঢুকছে এঞ্জিনরুমে। সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা লেগেছে ক্রুদের কোয়াটারে। হাভাল মারা গেছে, চিঁড়ে-চ্যাপ্টা শরীরটা চেনার উপায় নেই। ইম্পা-তের কর্কশ কিনারা আরেক লোককে তার বাকের সাথে গেঁথে রেখেছে। জ্ঞান নেই, ওদের কারো করারও নেই কিছু। ইম্পাতের টুকরোটা পেটটাকে এ-ফোঁড় ও ফোঁড় করে আটকে আছে। আহত হয়েছে আরো দু'জন লোক—একজনের হাত ভেঙেছে, অপরজনের পাজর। সবচেয়ে বেশি ভয় পেলো রানা গুঁড়িয়ে যাওয়া রেডিও সেটটা দেখে। জাহাজের গর্তটা আট ফুট চওড়া, বন্ধ করার এই ওঠে না।

ওয়েজনারকে এঞ্জিনরুমে পাঠালো রানা এঞ্জিন চালু করা যায় কিনা দেখার জন্যে। ওর নির্দেশ পেয়ে ত্রিজে একজন লোক থাকলো, এঞ্জিন চালু করা সম্ভব হলে বরফের দিকে জাহাজ চালাবে সে। এরিকাকে ডেকে নির্দেশ দিলো রানা, অবশিষ্ট বোটটা খুলে রেডিও করো, রসদ ইত্যাদি জড়ো করো এক জায়গায়—জাহাজ ছেড়ে ওদেরকে হয়তো বরফে আশ্রয় নিতে হতে পারে। এরপর আবার এক ছুটে ত্রিজে ফিরে এলো রানা, মুখের সামনে মেগাফোন তুলে লিবাটি-

ধিক ডাকলো। মাঝখানে ব্যবধান মাত্র বিশ ফুট, জাহাজটার বো-  
সামান্য একটু ডুবড়েছে, এজিনরুমের হ্যাচগুলো থেকে ধোঁয়া আর  
ষাপ বেরুচ্ছে।

ছুটে বো-ডে এসে দাঁড়ালো এক লোক, হাঁপরের মতো হাঁপাচ্ছে,  
বিক্ষোভিত চোখে আতঙ্ক। 'পাশে ভিড়তে পারবে তোমরা?' তাকে  
জিজ্ঞেস করলো রানা। 'আমাদেরকে তুলে নিতে পারবে?'

ঘন ঘন মাথা নাড়লো লোকটা। 'না, অসম্ভব। আমাদের এজিন-  
রুমের ক্ষতি হয়েছে। আগুন ধরে গেছে জাহাজে।'

বুকটা ছাঁৎ করে উঠলো রানার। এতোগুলো লোক বাঁচবে  
কিভাবে? খাড়া ফিরিয়ে ক্যাচারের পিছন দিকে তাকালো ও। এরই-  
মধ্যে সেদিকটা নেমে গেছে পানির নিচে। 'আমরা ডুবে যাবো,  
আর তোমরা চেয়ে চেয়ে দেখবে?' আবার চিৎকার করলো রানা।  
'জাহাজ ভেঙাও, বাঁচাও আমাদের। আগুন নেভাতে আমরা তোমা-  
দের সাহায্য করবো।'

চেহারায় অনিশ্চিত ভাব নিয়ে ইতস্তত করছে লোকটা। খাড়া  
ফিরিয়ে সে-ও পিছন দিকে তাকালো, যেন বুঝতে চায় তাদের জাহা-  
জের অবস্থা ওদের চেয়ে ভালো কিনা। ঠিক এই সময় আগুনের  
বিশাল একটা শিখা জাহাজটার ঠিক মাঝখান থেকে লাফ দিয়ে মাথা  
তুললো। পরমুহুর্তে সগর্জনে বিক্ষোভিত হলো বাষ্প, চোখের পলকে  
গোটা জাহাজ ঢাকা পড়ে গেল সাদা ধোঁয়ায়, ধারালো আর কালো  
বো ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। সাদা বাষ্প কালচে হতে শুরু  
করলো, তারপর হলো ঘন কালো মেঘ। কি ঘটছে বুঝতে বাকি  
থাকলো না রানার। লিবার্টি-থ্রু ভেতরে তেলে আগুন ধরে গেছে।  
নিক শেডির দিকে তাকালো রানা, ওর পাশেই হাঁ করে দাঁড়িয়ে  
যাত্রা অন্ত-২



আছে সে। 'ইউ, ব্রাডি কুল।' রানা জানে, যা হবার হয়ে গেছে, এখন আর গাল দিবে কোনো লাভ নেই, কিন্তু ভয়ে দিশেহারা বোধ করছে ও। এতোগুলো লোকের দায়িত্ব রয়েছে ওর কাঁধে, ওদেরকে বাঁচাবে কিভাবে? শেষ ভরসা ছিলো লিবার্টি-থ্রু। মার্ক নিশ্চয় করলেও, লিবার্টি-থ্রুর জুরা ওদেরকে সাহায্য না করে পারতো না এ-ব্যাপারে নিশ্চিত ও।

ত্রিভের নিচ থেকে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো এরিকা। 'আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না, স্যার।'

রানা দেখলো, এরিকার পাশে ওয়েজনার দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার চেহারাই বলে দিলো, এজ্জিনরুমে বার্থ হয়েছে সে। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিলো রানা, সাথে সাথে পানিতে নামানো হলো বোটটা রসদ সহ এরিকাকে পাঠালো রানা সমতল ও যথেষ্ট লম্বা একট বরফের আশ্রয় খুঁজে বের করার জন্যে। জাহাজে রয়ে গেল ও নিজে প্রয়োজনীয় রসদ ও ইকুইপমেন্ট বাছাই করার জন্যে। খাবারদাবার, কাপড়চোপড়, ক্যানভাস, পেট্রল, তেল, দিয়াশলাই, ইলেক্ট্রোমেন্ট, চাট, রাইফেল আর অ্যামিউনিশন জড়ো করা হলো এক জায়গায়। তাঁর আর লাইটার নিজের সাথে রাখলো রানা। খাবারদাবার ভরা হলো কয়েকটা কাঠের বাগ্জে। তেল নেয়া হলো দুই ড্রাম। কম্বলগুলো স্লীপিং-ব্যাগ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। সুই আর সুতোও তালিকা থেকে বাদ পড়লো না। পেরেক আর তৈজসপত্রও নিতে হলো। এরইমধ্যে আফটার ডেক প্রায় ডুবে গেছে, হাতে আর বেশি সময় নেই।

বোট ফিরতেই কিছু জিনিস তোলা হলো তাতে, লোকজনকেও উঠিয়ে দিলো রানা, নেতৃত্ব থাকলো ওয়েজনার। এরিকাকে জাহাজে

রেখে দিলো রানা, ওর ভুলে যাওয়া ছোটোখাটো কিন্তু দরকারী জিনিস-  
গুলো নারীশুলভ খুঁতখুঁতে মন ঠিক চিহ্নিত করতে পারলো—কাশাই  
করার সরঞ্জাম, গোস, মেডিকেল সাপ্লাই, চবিত্তরা টিন, তার বাবদ  
ব্যক্তিগত কিছু জিনিস, কয়েক বোতল ব্র্যান্ডি, চেয়ার থেকে ছিঁড়ে নেয়া  
চামড়া, বৃট জুতোর অতিরিক্ত ফিতে। বোট দ্বিতীয়বার ফিরে এলে  
তাতে তোলা হলো ভারি জিনিস-পত্র—হিমারিত তিমির নাংস,  
তেলের ড্রাম, কুণ্ডলী পাকানো তার, বাস্তব ভিত্তি ইম্পাতের গজাল,  
ময়দা, কোদাল, করাত, বন্দুক, ব্লক ও ট্যাকল, সাথে ষাট ফাদন ফোর-  
রানার ইত্যাদি।

এতো সব মালপত্র, জাহাজে এখনো লোক রয়েছে সাতজন,  
ব্যাপারটা খুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ালো। তবে একটা জিনিসও ফেলে যেতে  
রাজি নয় রানা, বরফে টিকে থাকতে হলে সবগুলোই দরকার হবে।  
আর কোথায় কি পড়ে আছে দেখে নিয়ে পোর্ট সাইডে চলে এলো  
রানা, তাকালো লিবার্টি-থ্রুর দিকে, শেষবার দেখেছে আধ ঘণ্টা  
আগে। কালো ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে আছে করভেটটা, তবে এখনো  
দেখা যাচ্ছে বো-টা। ব্রিজের বেশিরভাগটাই আগুনে পুড়ছে, আগু-  
নের শিখা ছুঁই ছুঁই করছে চিমনির মাথা। জাহাজের পিছনে ভাসমান  
একটা বড় বরফের ওপর রসদ নামাতে ব্যস্ত দেখা গেল কিছু লোককে।  
জাহাজ থেকে বোটে তোলা হচ্ছে মালপত্র। হঠাৎ ব্রিজের অন্ধত  
অংশে কি যেন একটা নড়ে উঠলো, ভালো করে তাকাত গিয়ে  
বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলো রানা, লোকটা মার্ক। তাড়াতাড়ি চোখে  
বিনোকিউলার তুললো ও। মার্কের মুখে আগের সেই ঠোঁট দাঁড়া  
নীরব হাসিটুকু নেই। চেহারা হয়েছে ঠিক যেন নেশাপোর, কিছুদূর  
করে আপনমনে কি যেন বকছে।

শাটের আঙিনে টান অমুত্তব করলো রানা। পাশে এসে দাঁড়িয়ে  
এরিকা। 'দেখুন, স্যার, কি পেয়েছি।' এরিকার হাতে একটা পোড়ো  
বল রেডিও। 'খবর পাঠাতে না পারলেও, শুনতে তো পাবো। বাকি  
কেবিনে ছিলো।'

লিবার্টি-থ্রু দিকে তাকালো রানা। 'ওরা কি মেসেজ পাঠাতে  
পারবে?'

'বরফে গিরে জানতে পারবে। রেডিও ভালো থাকলে কোকুনকে  
নিশ্চয়ই খবর দিয়েছে। দেখছেন না, ওদের রেডিও-ট্রান্সমিটার  
ত্রিভুজের নিচে? ওখানে এখনো আগুন লাগেনি।'

হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেলো ক্যাচার। রানাকে ধরে ভারসাম্য রক্ষা  
করলো এরিকা। ঝট করে পিছনে তাকালো রানা, ডুবতে আর বেশি  
সময় নেবে না লিবার্টি-ফোর। বরফে জিনিস-পত্র নামিয়ে ফিরে  
আসছে বোটটাও। 'জলদি।' তাগাদা দিলো রানা। 'যা পারো ছুঁড়ে  
কেলো বোটে, তারপর লাফ দাও।'

রানার কথা শেষ হবার সাথে সাথে একপাশে কাত হয়ে গেল  
ক্যাচার। আরেকটা ঝাঁকি খেলো জাহাজ। অলস কিন্তু বিপজ্জনক  
ভঙ্গিতে উঁচু হতে শুরু করলো বো। রেইল টপকে টপাটপ লাফ দিলো  
জুয়া। এক নিমেষে সদ্য উঠে আসা হিম পানিতে ডুবে গেল রানার  
গোড়ালি। রেইলের ওপর উঠে পড়লো এরিকা, কিন্তু লাফ দিতে ইত-  
স্তত করছে। রেডিওটা বোটে দাঁড়ানো একজন লোকের বাড়ানো  
হাতের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে রেইল টপকালো রানা। এরিকাকে মুহূর্ত ধাক্কা  
দিলো ও, কয়েক হাত নিচে বোটে লাফিয়ে পড়লো সে, তার পিছু  
পিছু লাফ দিলো নিজে। 'বৈঠা চালাও, জলদি।'

বলার দরকার ছিলো না, প্রাণের তাগিদে স্বপাকস্বপ পানিতে বৈঠার

কোপ মারলো জুয়া, ভারি বোটটা ধীরে ধীরে জাহাজের গা থেকে সরে আসতে শুরু করলো। সময় পাওয়া গেল না, থরথর করে কঁপে উঠলো লিবার্টি-ফোর, ভিত থেকে ভেঙে গিয়ে টলমলে চিমনিগুলো ঝপাৎ করে পড়লো পানিতে। সবুগে প্রায় খাড়া হয়ে গেল বো-  
 ৭ জাহাজের পিছন দিকটা পানিতে তুমুল আলোড়ন তুলে ডুবে গেল। বো-র কাছে হারপুন গান লক্ষ্যহীনভাবে এদিক-ওদিক ছলছে। প্রায় কোনো শব্দ না করেই ডুবলো ওদের বাহন, সবশেষে অদৃশ্য হলে মাস্তুলের মাথা আর হারপুন গান। কয়েক সেকেন্ড পর হিম পানি স্থি- হয়ে গেল, বোঝার উপায় নেই যে কয়েক সেকেন্ড আগে ওখানে একট জাহাজ ছিলো।

ইঠাৎ বুকটা যেন খালি হয়ে গেল রানার। মনের দিক থেকে তো বটেই, শরীরটাও কেমন দুর্বল লাগলো ওর। আওয়াজ শুনে ঘাড় ফেরালো ও, দেখলো ফুঁপিয়ে কঁাদছে এরিকা। চোখ ভরা অশ্রু নিয়ে শাস্ত্র, ঠাণ্ডা পানির ওপর স্থির চোখে তাকিয়ে আছে সে, এই মাত্র যেখানে জাহাজটা ছিলো। রানা নিরাপদ আশ্রয় হারিয়ে শংকিত- এরিকার জন্যে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। লিবার্টি-ফোর ছিলো এরি- কার বাড়িঘর। সামনের দিকে ঝুঁকলো রানা তার মাথায় হাত রাখার জন্যে, এই সময় দেখলো ছুটে এসে এরিকাকে আলিঙ্গন করলো নিক শেডি, তার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলো। এবার আরো জোরে ফুঁপিয়ে উঠলো এরিকা।

চারদিকে তাকালো রানা। অতিরিক্ত ভার নিয়ে ভাসমান বরফ- টুকরোর মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলেছে বোট। একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করলো ও। অ্যান্টার্কটিকার বৈরী প্রকৃতির সাথে মরণপণ যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হবে ওদেরকে। সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার হবে, সঙ্গী- মাথীদের দুর্জয় মনোবল। সেটারই অবশ্য দুঃখজনক ঘাটতি লক্ষ্য- যাত্রা অশুভ-২

করলো ও। রসদের পাশে জব্ব্বু হয়ে বসে আছে লোকজন, বহু  
 চেহারা। বরফে ঠাই নিয়েছে যারা তাদের দিকে তাকিয়েও  
 বাধ করলো রানা, রসদ আগলে চুপচাপ বসে না দাঁড়িয়ে আছে  
 এক চুল নড়ছে না কেউ। আরো সামনে আরেকটা দল রয়েছে, যা  
 করভেটের কাছাকাছি—তারাও সবাই বিমর্ষ। চারদিকে, আরো  
 তাকালো রানা। বরফ, বরফ আর বরফ। শুধুই সাদা উজ্জলতা। বাতাস  
 সের গতি আগের চেয়ে কমছে, করুণ সুরে বিলাপের মতো আওয়াজ  
 করছে কানে। আর চারদিক থেকে ভেসে আসছে বরফের সাথে  
 কের সংঘর্ষজনিত শব্দ, বিরতিহীন, ভোঁতা, রোমহর্ষক।

বরফের কিনারা স্পর্শ করলো বোট, কাঁচ গুড়ানোর মতো শব্দ  
 হলো। ভাসমান টুকরোটায় নামলো ওরা, খুবখুবে তুষারে গোড়ালি  
 গরম হুবে গেল পা। বরফের মাঠটা বেশ বড়, অন্যান্য মাঠের মাঝে  
 খানে আটকে আছে, যদিও ঢেউয়ের সাথে ছলছে একটু একটু। ওদিকে  
 খানিকটা উত্তরে একটা টুকরোর ওপর আরেকটা চড়ে বসেছে, ফল  
 মফের আকৃতি নিয়ে বাকিগুলোর চেয়ে উঁচু হয়ে আছে সেটা, তার  
 একদিকে খানিকটা ঢালু। তুষারের ওপর সাবধানে পা ফেলে সেদিকে  
 এখোলো রানা। পা একবার পিছলাতেই হাঁটু পানিতে নেমে গেল  
 ও, মুহূর্তের জন্যে ভয় পেলো, হয়তো ভাসমান একজোড়া বরফের মাঝে  
 খানে পড়েছে। আসলে ওটা একটা গর্ত, তরাট হয়ে আছে আধ-গলি  
 বরফ আর তুষারে। উঁচু মফটার পৌঁছুলো ও, পরীক্ষা করে বুঝলো  
 বরফ এখানে অত্যন্ত শক্ত, কোথাও কোনো লুকানো গর্তও নেই।  
 কিরে এসে নির্দেশ দিলো রানা, রসদ ও ইকুইপমেন্ট ওই মফে সরিয়ে  
 নিতে হবে। লোকজনের মনোবল চাঙা করার জন্যে ছোট্ট একটা  
 ভাষণ দিলো ও, সবশেষে বললো, 'কাছে বা কোতুকে আমরা কেউ  
 ২০

যেন এরিকার চেয়ে পিছিয়ে না থাকি, একটা মোয়ের কাছে হেরে গেলে সভ্য সমাজে ফিরে গিয়ে লোকের কাছে মুখ দেখাবো কিভাবে ?' হেসে উঠলো সবাই, এক নিমেষে বিষম ভাবটুকু দূর হয়ে গেল ।

শক্ত বরফের ওপর তারপুলিন বিছানো হলো, সেটার ওপর জড়ো করা হলো মাল-সামান । কয়েকজন লোককে তাঁবু টাঙাবার দায়িত্ব দিয়ে স্টুয়ার্ডকে কাছে ডাকলো; রানা, বললো, 'তোমার ইচ্ছেটা কি, শুনি ? আমাদের সবাইকে শুকিয়ে মারতে চাও ? আর কিছু না পারো খানিকটা করে স্টু বানিয়ে খাওয়াতে অসুবিধে কি ?' বত্রিশ পাটি দাঁড় বের করে ঘাড় কাত করলো লোকটা ।

সব মিলিয়ে ওরা চোদ্দজন, তার মধ্যে দু'জন আহত । মাথা গোঁজার ঠাই তৈরি হওয়া মাত্র এরিকাকে নিয়ে কাছে হাত লাগালো রানা । প্রথমে জেফারসেনের ভাঙা হাতটা মেরামত করলো, তারপর ইলিয়টসেনের চিড় ধরা পাঁজরের হাড় । কাঠের একটা ফলক দিয়ে ভালোভাবেই বাঁধা গেল হাতটা, খানিক পরই ব্যথা কমে যাওয়ায় বুঝতে অসুবিধে হলো না জোড়া লাগানোর কাজটা নিখুঁতভাবেই সারা গেছে । তবে ইলিয়টসেনের পাঁজরটা নিয়ে রানার উদ্বেগ থেকেই গেল । এক্স-রে করলে ধরা পড়তো, ওটার শুধু চিড় ধরেনি, পুরোপুরি ভেঙে গেছে । স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধার কাজ শেষ করছে রানা, নিজের বুকের ব্যথাটা আবার অনুভব করলো ও । লিবার্টি-ফোরের ত্রিজে ছিটকে পড়ার সময় আঘাত পেয়েছে ।

কাজ শেষ হতেই ওয়েজনার চিৎকার করে জানালো, একটা বোর্ড আসছে । ক্যানভাসের আশ্রয় থেকে মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলো ওরা, দেখলো বৃষ্টি কমে আসছে, দীরগতিতে এগিয়ে আসছে লিবার্টি-থ্রির একটা বোর্ড । চারজনের হাতে বৈঠা দেখা গেল, পিছনে হাল যাত্রা অণ্ডভ-২

যে বসে আছে চ্যান্টা নাক আর কুতকুতে চোখ নিয়ে প্রকাণ্ডদেহী  
ক দানব। 'কে ও ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'হেলমুট, হেলমুটসেন,' বললো এরিকা। 'লিবাটি থির ফাস্ট' কে  
ও, স্যাওফিওর্ডের লোক। হোয়েলার হিসেবে ভালো, তবে গুনেতি  
অত্যন্ত বদমেজাজী।'

হাবডাব দেখে রানারও লোকটাকে তাঁদড় মক্কেল বলে মনে হলো।  
ওর পাশে এসে দাঁড়ালো নিক শেডি, বললো, 'ভাবছি, মার্কের  
নানানো গল্পটা কি হবে।' তার গলা একটু কেঁপে গেল।

এই প্রথম ওদের দুর্গতি সম্পর্কে কেউ কোনো মন্তব্য করলো। পরি-  
স্থিতিটাকে মেনে নিয়ে বাঁচার তাগিদে এতো ব্যস্ত ছিলো ওরা, ভাবনা-  
চিন্তা করার অবকাশ জোটেনি। কিন্তু হেলমুটসেনের থমথমে চেহারা  
আর তার হেঁটে আসার দৃঢ় ভঙ্গি দেখে রানার বুঝতে অনুবিধে হলো  
না কেন আসছে সে। সম্ভবত নিক শেডিও ব্যাপারটা আঁচ করতে  
পেরেছে।

'আপনি ক্যাপটেন রানা ?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলো হেলমুট-  
সেন, পূর্ব নরওয়ের বহুল প্রসিদ্ধ কোমল সুর তার গলার সম্পূর্ণ অন্তর্ক-  
পস্থিত। রাগে আড়ষ্ট হয়ে আছে লোকটা।

'ইয়া,' শাস্ত গলায় বললো রানা। 'কি চাই ?'

'আমি শুধু জানতে চাই, আপনিই কি হারপুন গান ছোড়ার অর্ডার  
দিয়েছিলেন ?'

তা দেয়নি রানা, তবু নিক শেডির গা বাঁচানোর জন্যে ছোট্ট করে  
বললো, 'ইয়া।'

মুগ্ধরসদৃশ্য, আধমগ্ন ওজনের হাতটা তুলে রানার মুখ বরাবর ঘুসি  
গালালো দানবটা। কৌশলে হেরে গেল সে, আগেই বুঝতে দিয়েছে

মারবে। তৈরি ছিলো রানা, সর্বশক্তি দিয়ে তার বগলের নিচে প্রচণ্ড ঘুসি মারলো ও।

কিছুই হলো না, একচুল নড়লোও না দানব, যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকলো। ভুরু কঁচকে উঠেছে, হাতটা আগেই হির হয়ে গেছে, বিরতি না নিয়ে বলে চলেছে, 'হারপুনটা আমাদের এঞ্জিন-রুমের বার্ট' করেছে। আগুন লাগার সেটাই কারণ।' ছোটো চোখ দুটো নিক শেডির দিকে ঘুরে গেল। 'তুমি হারপুনটা ফায়ার করেছে।' সামনের দিকে একটু ঝুকলো সে, তারপর নিক শেডির দিকে গরিলার আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এগোলো।

'এক গিনিট,' নিক শেডির জন্যে ভয় পেলো রানা, গায়ের জোরে নিজেও লোকটার সাথে পারবে না ও, নিক শেডি স্রেফ ছাতু হয়ে যাবে। তবে, রানাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিলো এরিকা, সামনা-সামনি হলো হেলমুটসেনের। 'অ্যাঁই, গর্দভ, কি আশা করেছিলে তোমরা?' তার চোখ দুটো ঝলছে। 'তোমরা আমাদেরকে খুন করবে, আর আমরা হাত-পা গুটিয়ে তাই দেখবো? যাও, তোমার মার্ক ইন্সপেক্টরের কাছে ফিরে গিয়ে দ্বিজেস করো, সে আমাদের ধাক্কা দিলো কেন?'

দাঁড়িয়ে পড়েছে লোকটা, ঝুক্কে তাকালো এরিকার দিকে। 'ওটা অ্যান্ড্রিডেট ছিলো,' বললো সে, হাত তুললো এরিকাকে পথ থেকে সরানোর জন্যে।

'হেলমুটসেন,' হিস হিস করে উচ্চারণ করলো এরিকা। 'আমার গায়ে হাত দেয়ার ভূমতি তোমার যেন না হয়। আমি কি বলছি, কান পেতে শোনো। শুনেছি তোমার শরীরের তুলনায় মগজ নাকি খুবই কম। আমার কথাগুলো বার বার আওড়ে মুখস্থ করে নিতে পারো।



ওটা কোনো ছর্ঘটনা ছিলো না। মার্ক আগাদেরকে ডুবিয়ে দিতে চেয়ে  
করেছে। ঠাণ্ডা মাথায় আমাদেরকে খুন করতে চেয়েছে সে। বোনার  
পাইটন হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ থেকে বাঁচার জন্যে লিবাটি-ফোরের  
হু'একজন লোককে তার খুন না করলেই নয়, তা না হলে ইলেকট্রিক  
চেয়ারে বসতে হবে যে। জানো, এর কারণ কি, আগের পজিশনে গির  
ধাকার নির্দেশ পাওয়া সম্ভব কেন সে এদিকে ছুটে এসেছে ?

‘কে বললো, আগের পজিশনে থাকতে বলা হয়েছে আগাদের ?’  
জবাব চাইলো হেলমুটসেন। ‘আর এ-সব কি বলছো—খুন-খারাবির  
কথা ? ওটা তো একটা সুইসাইড কেস।’

‘মার্ডার, মার্ডার কেস।’ চিৎকার করলো এরিকা। ‘আগের পজি-  
শনে স্বয়ং ক্যাপটেন ভেনসম থাকতে বলেছিল তোমাদের। কেন,  
তোমরা রেডিও শোনো না ?’ লোকটা ইতস্তত করেছে দেখে থামলো  
না এরিকা, ‘তাহলে যাও, নিজেদের রেডিও অপারেটরকে জিজ্ঞেস  
করো।’

‘এস. ও. এস. পাঠাবার পর আশুনে আহত হয়েছে সে।’

‘কেউ না কেউ নিশ্চয়ই রেডিও শুনেছে।’

‘কিছুক্ষণ ওটা কাজ করেনি।’

‘তাই বলো। এবার তাহলে চিন্তা করে দেখো। যখন কাজ কর-  
ছিল না, রেডিওর কাছে একা শুধু মার্ক ছিলো, ঠিক কিনা ?’

বিস্মিত দেখালো হেলমুটসেনকে। ‘হ্যাঁ, কিন্তু...।’

‘আবার চালু হলো কখন রেডিও ?’ তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস  
করলো এরিকা। ‘আবার চালু হলো যখন, তখনও মার্ক একা ছিলো  
ওয়ায়েরলেন্স রুমে, তাই না ?’ হঠাৎ করে এক পা এগিয়ে হেলমুটসে-  
নের মুখের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে। ‘আমাদের যখন ধাকা দিলো,

মার্ক কি একা ছিলো ত্রিজে ?

‘হুথটনা ঘটান সময়...।’

‘একা ছিলো কিনা, শুধু এইটুকু শুনতে চাই জানি।’

‘হ্যাঁ।’

‘তাহলে যাও, গিয়ে ত্রিজেস করো, হেলমসম্যানকে নিচে কেন পাঠিয়েছিল সে। ঝাল যদি ঝাড়তেই হয়, ওদিকে ফিরে গিয়ে ঝাড়ো—অনেক কারণ খুঁজে পাবে। আরেকটা কথা, এমন কিছু করো না যাতে লোকজন অসন্তুষ্ট হয়। ওরা টনসবার্গের লোক, ভুলে যেয়ো না। বরফের ওপর মন কষাকষি ভালো নয়। তুমি যদি তদন্তের ব্যবস্থা না করো, ওরা করবে।’

চেহারায় হতভম্ব ভাব নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো বিশাল লোকটা। একটা মেয়ের কাছে তর্কে হেরে গিয়ে অপমান বোধ করছে সে।

পিছন থেকে তাকে ডাকলো রানা, ‘শোনো, হেলমুটসেন। তোমরা কি রেডিওটা বরফে নামিয়েছো?’

মাথা নাড়লো লোকটা। ‘আগুনে সব গেছে। তবে ভাগ্যই বলতে হবে, আমরা এস. ও. এস. পাঠাতে পেরেছি।’

‘আমাদের পজিশন সহ?’

‘হ্যাঁ।’

‘সাদা পেয়েছো?’

‘হ্যাঁ।’ আবার ঘুরে দাঁড়ালো হেলমুটসেন।

‘আর একটা প্রশ্ন,’ বললো রানা। ‘মার্ক কি এখনো লিবার্টি-থ্রিতে রয়েছে?’

‘কি করে থাকবেন, গোটা জাহাজই তো আগুনে পুড়ছে। সবাই আমরা বরফে নেমে এসেছি। ক্যাপটেন রোসেটের মন খুব খারাপ।’

তার ধারণা দুর্ঘটনার জন্যে তিনিই দায়ী ।’

‘আবার বলে দুর্ঘটনা ।’ চেষ্টায়ে উঠলো নিক শেডি । ‘এতোক্ষণ ধরে তাহলে কি শুনলে তুমি ? মার্ক আমাদেরকে খুন করতে চেয়েছিল । তার কাছে নিয়ে চলো আমাকে ।’ যেন নেশার ঘোরে, লম্বা গলা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে হেলমুটসেনের দিকে এগোলো সে । ‘আমি তো বলেইছি, তাকে আমি নিজের হাতে খুন করবো । নিয়ে চলো আমাকে, দেখি কে তাকে বাঁচায় ।’

‘কতি যা করার এরইমধ্যে যথেষ্ট করেছেো তুমি, আমার ধারণা,’ ধমথমে গলায় বললো হেলমুটসেন ।

‘কতি ? আমি করেছি ? এরিকা ঠিকই ধরেছে, তুমি একটা আস্ত গর্দভ । বুঝতে পারছো না, মার্ক রোসেট, বেজন্মা কুত্তাটা আমাদের সর্বনাশ করেছে ? প্রাণ নিয়ে কেউ আমরা ফিরতে পারবো না ! এই বরফ আমাদের কবর হবে । তোমরা কেউ বাঁচবে না, আমরা কেউ বাঁচবো না । সান্তিক বা লিবার্টি-ফাইভের কেউও বাঁচবে না । আমাদের সবাইকে খুন করেছে সে ।’ উন্মাদের মতো চিৎকার করার পর ধামলো নিক শেডি, চোখ জোড়া বিক্ষারিত, নাকের ফুটো ঘন ঘন চওড় হচ্ছে, সবেগে ওঠা-নামা করছে কঠা ।

‘তোমার মাথার ঠিক নেই,’ বললো হেলমুটসেন, নিক শেডির ভাব-ভঙ্গি দেখে ঘাবড়ে গেছে সে ।

‘তোমার সাথে যাচ্ছি আমি ।’ যেন শপথ করলো নিক শেডি । ‘তোমাদের মার্ক কুত্তাটাকে কেউ আজ বাঁচাতে পারবে না ।’ বেজন্মা শকুটা এবার বাদ দিলো সে ।

দুটো হাত এক করে সামনে বাড়ালো হেলমুটসেন, বুকে ধাক্কা খেয়ে বরফের ওপর আছাড় খেলো নিক শেডি । নিজের পথ ধরলো

হেলমুটসেন, কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালো একবার। ‘এ-ব্যাপারে পরে আরো কথা হবে আপনার সাথে।’ বরফে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকলো নিক শেডি, কথা বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু মুখ থেকে আওয়াজ বেরচ্ছে না।

বোটে গিয়ে উঠলো হেলমুটসেন, সবুজাভ পানি কেটে ক্রমশ দূরে সরে গেল সেটা। আরো সামনে আগুনের লেলিহান শিখা নাচানাচি করছে লিবাটি-খিরে ঘিরে। সামনে ছুটে গিয়ে বরফ থেকে নিক শেডিকে তুললো এরিকা। নিক শেডির মাথাটা নিজের বিশাল বুকে চেপে ধরে কপাল থেকে ভিজে চুল সরালো।

এক মাইল দূরে লিবাটি-খির লোকজন এদিকেই মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

## দুই

রাতে বৃষ্টি থেমে গিয়ে তুষারঝড় শুরু হলো। জাহাজের আশ্রয় না থাকায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপতে লাগলো ওরা। কানভাসের তাঁবু ভীষণগতি বাতাসকে ঠেকাতে পারছে না। গরম করা খাবার মুখে তুলে ঢোক গেলার আগেই ঠাণ্ডা হ’য়ে গেল। দুটো তাঁবুতেই লোকজন যাত্রা অন্তত-২

গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পড়ে আছে এক জায়গায়। তাঁবুর ভেতর টেম-পারেচার ফ্রিজিং পয়েন্টের অনেক নিচে। অথচ মাত্র কয়েক শো গজ দূরে লিবার্টি-থ্রুতে যে তেল পুড়ছে, পুরো এক বছর ওদেরকে গরম রাখার জন্যে তা যথেষ্ট ছিলো। রাত আটটার দিকে সবাইকে ঘুমোবার নির্দেশ দিলো রানা, কাল সকালে ওদেরকে তাজা ও কর্মঠ দেখতে চায় ও। বরফে একটা নোঙর গোঁথে কিনারায় আটকে রাখা হয়েছে বোট। দু'ঘণ্টা পরপর পালাবদল, প্রতিবার দু'জন করে পাহারায় থাকছে।

সবার শেষে শুলো রানা, ইতোমধ্যে বাতাসের তীব্রতা কমে গেছে, তবে তুষারপাত বেড়েছে আগের চেয়ে। রানা আর এরিকার মাঝখানে রয়েছে রেডিওটা, একটা সিগারেট ধরিয়ে ফুঁকছে রানা। তাঁবুর ভেতর অন্ধকার, কান পেতে ফ্যাক্টরি শিপ কোকুনের মেসেজ শুনছে ও। অপারেটর প্রথমে লিবার্টি-ফাইভকে ডাকছে, তারপর লিবার্টি-থ্রু, সবশেষে ওদেরকে। পাঁচমিনিট করে বিরতি। বিরতির পর আবার শুরু। এক সময় রেডিওর সুইচ অফ করে দিলো রানা, ব্যাটারী শেষ করার কোনো মানে হয় না। কম্বলের ভেতর মাথায় গুলিয়ে দিয়ে যতোটুকু সম্ভব উত্তাপ পেতে চাইলো ও, কিন্তু ভেজা মেঝে আর বাতাসের সাথে উড়ে আসা তুষারে বেশিক্ষণ শুকনো থাকলো না সেটা। কাছাকাছি ও দূরে বরফের সাথে বরফের সংঘর্ষে অবিরাম শব্দ হচ্ছে, প্রতি মূহুর্তে পিঠের নিচটা কাঁপছে। মাঝে-মধ্যে বড় ধরনের সংঘর্ষ ঘটলে ঝাঁকি খাচ্ছে ওরা।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বলতে পারবে না রানা, তবে ঘুম ভাঙলো একটু পরই, আতঁচিংকার আর সংঘর্ষের জোড়ালো আওয়াজে। তাঁবু থেকে আলো-ছায়ায় ঢাকা অদ্ভুত এক জগতে বেরিয়ে এলো ও, অন্ধ-

কারের ভেতর সাদা তুষার পড়ছে, বাতাসের গায়ে ভর দিয়ে নড়াচড়া  
 করছে ভৌতিক ছায়ার মতো লোকজন। চিংকারটা আবার শুনতে  
 পেলো রানা, হোঁচট খেতে খেতে এগোলো সেদিকে। পায়ের নিচে  
 কাঁপছে বরফ, চারদিক থেকে সংঘর্ষের আওয়াজে কান পাতা দায়।  
 লুকআউট কেন চিংকার করছে, আধো অন্ধকারে কারণটা দেখতে  
 পেলো ও। ঘোলা পানি, যেখানে বোটটা বেঁধে রেখেছিল ওরা, অদৃশ্য  
 হয়ে গেছে। সরু একটা ফাঁক যা-ও বা আছে, অন্য একটা ভাসমান  
 বরফ দ্রুত সেটা গ্রাস করে নিচ্ছে। পকেট থেকে হুইসেল বের করে  
 বাজালো রানা, লোকজন ছুটে না আসা পর্যন্ত থামলো না। ধরাধরি  
 করে বরফের ওপর তোলা হলো বোটটা। পা পিছলে পানিতে পড়লো  
 একজন লোক; তলিয়েই যেতো, সময়মতো থপ করে তার পারকা ধরে  
 ফেললো এরিকা। তারপর ওরই পা পিছলে গেল। দু'জনেই ঝপাৎ  
 করে পড়লো পানিতে, কিন্তু এরিকা তবু লোকটাকে ছাড়লো না।  
 অপর হাত দিয়ে রানার কজি ধরলো সে, দ্বিতীয় হাত দিয়ে এরিকার  
 পাজর পেঁচিয়ে টানলো রানা। এক সেকেওও পানিতে ছিলো না ওরা,  
 এরইমধ্যে রক্ত চলাচল প্রায় থেমে যাবার অবস্থা। লোকজন হুমড়ি  
 খেয়ে পড়লো ওদের ওপর, দ্রুত ম্যাসেজ করার পর ধীরে ধীরে তাপ  
 ফিরে এলো শরীরে।

বোটটাকে টেনে নিয়ে আসা হলো ক্যাম্পের কাছে। বরফের দুটো  
 দ্বীপ জোড়া লাগার মুহূর্তে প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো ওরা, রানা উপলব্ধি  
 করলো বেঁচে থাকতে হলে কতোটা সতর্ক থাকতে হবে ওদেরকে।  
 তুষারপাত বেড়েছে, অলস্ত লিবাটি-থ্রিকে অনেক দূরে গোলাপী  
 আভার মতো লাগলো, এই আছে এই নেই। লুকআউটদের হাতে

হুইসেল দিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলো ও । মাঝ রাত্রে ছুটোছুটি করায় খিদে পেয়ে গেছে । বাকি রাতটুকু ঘুম আসবে না মনে হলোও, ভিজে কন্বলের তলায় এক সময় চোখ জুড়ে ঘুম এলো ।

ঘুমের মধ্যে আতকে উঠলো রানা বজ্রপাতের শব্দে । এক ঝটকায় কন্বল সরিয়ে উঠে বসতেই কানে ঢুকলো তীক্ষ্ণ হুইসেলের শব্দ । তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে দেখলো, তুষারপাত থেমেছে, বাতাসের বেগও কমের দিকে । বজ্রপাতের আওয়াজ নয়, চারদিক থেকে ওগুলো বরফের সাথে বরফের সংঘর্ষজনিত বিস্ফোরণের শব্দ । লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে কাছেই, কোনো বিরতি না দিয়ে পাগলের মতো হুইসেল বাজাচ্ছে । বরফের মেঝে সাদা তুষারের কার্পেটে ঢাকা । এখন অবশ্য তুষার পড়ছে না । তাঁবু থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে আসা লোকগুলোকে পরিকার দেখা গেল, সাদার গায়ে কালো ছায়া । হুইসেল বাজাবার কোনো কারণই রানা দেখতে পেলো না ।

হঠাৎ করে পায়ের তলায় বরফ কাঁপতে শুরু করলো, বিরতিহীন বিস্ফোরণের শব্দ তীরবেগে ছুটে এলো ওদের দিকে । হুইসেল থামিয়ে, একটা হাত ওদের তাঁবুর পিছন দিকে লম্বা করলো লুকআউট । ঝট করে তাকাতেই রানা দেখলো, তুষার ঢাকা বরফের ওপর দিয়ে কালো একটা অতিকায় সরীসৃপ এঁকেবেঁকে একদিক থেকে আরেকদিকে ছুটে যাচ্ছে । বুঝতে এক সেকেন্ড দেরি হলো রানার, ওটা সরীসৃপ নয়, একটা ফাটল । ফাটলটা চওড়া হলো, তারপর চোখের নিম্নেবে জোড়া লেগে গেল বিকট শব্দ করে, যেন একটা হাঙরের চোয়াল বন্ধ হলো । আরো একটা শব্দের সাথে কঁপে উঠলো বরফ, আবার সৃষ্টি হলো ফাটলটা । এবার সেটা রয়েই গেল, বরফের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটলো আরেকদিকে ।

মাতে আর বিশ্রাম হলো না ওদের। সোটটা ফাটলের একদিকে, ওদের ক্যাম্প আরেকদিকে। ফাটলটা আরো চওড়া হবার কয়েক সেকেন্ড আগেই এ-পারে নিয়ে আসা হলো সোট। তারপর ফাটলের ভেতর সাগর দেখা গেল। এক সময় নদীর মতো চওড়া হলো সেটা, কিনারায় সবুজাভ বরফ। কিনারা থেকে তাঁবু আর রসদ সব সরিয়ে মাঝখানে আনা হলো। ভাসমান বরফটা ইতিমধ্যে আকারে ছোটো হয়ে গেছে, চারদিক থেকে হামলা হচ্ছে ওটার ওপর। সদ্য টাঙানো তাঁবুতে বসে ঠাণ্ডায় হি হি করতে লাগলো ওরা, সবাইকে চা বানিয়ে খাওয়ালো এরিকা, চায়ের সাথে ত্র্যাণ্ডি মেশানোর নির্দেশ দিলো রানা।

হঠাৎ করে এরিকা বললো, 'কে জানে লিবার্টি-থ্রুর লোকজন স্নাতটা কেমন কাটাচ্ছে।'

'লিবার্টি-ফাইন্ডকে নিয়ে চিন্তিত আমি,' বললো রানা। মারিকার কথা মুহূর্তের জন্যেও ভোলেনি ও।

রানার কজি ধরে মূঢ় চাপ দিলো এরিকা। 'আমি ব্লি, ক্যাপটেন।' ঊর্ধ্বকটু পর আবার সে বললো, 'লিবার্টি-থ্রুর লোকজন প্রায় সবাই টনসবার্গের, ওদের আমি চিনি। যা ঘটেছে আমি জানি, তাতে ওদের কোনো হাত ছিলো না।'

'জানার বিষয় হলো,' বললো নিক শেভি, 'নতুন কি মতলব ভাঁজছে মার্ক।'

'লিবার্টি-থ্রুর লোকজন এতোক্ষণে আসল কথাটা ছেনে ফেলেছে,' বললো রানা। 'মার্ক আর আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করার সাহস পাবে বলে মনে হয় না। হয় তাকে এখানে প্রকৃতির মার খেয়ে মরতে হবে, নয়তো খুনের অভিযোগে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।'



‘তা মার্কও জানে, সেজন্যেই সে আরো বিপজ্জনক হয়ে উঠবে,’ বললো নিক শেডি। ‘ভেবে দেখুন না, সে যদি একা প্রাণ নিয়ে কিছুতে পারে, আর আমরা সবাই যদি মারা যাই, তার উদ্দেশ্য পূরণ হয় না।’  
‘আংশিক হয়,’ বললো রানা। ‘তারপরেও কোম্পানীর নিরস্ত্র হওয়া হাতে আসবে না।’

‘কিন্তু সে-কথা এখনো মার্ক জানে না,’ অন্ধকারে বিড়বিড় করে বললো নিক শেডি। ‘ভাগ্যিস মারিকার সাথে বিয়েটা হয়ে যায়নি তা যদি হতো, একা ফিরে যেতে পারলে উত্তরাধিকারসূত্রে কোম্পানীর মালিক বনে যেতো কুত্তাটা।’

‘কিন্তু একা তার ফিরে যাবার প্রশ্ন ওঠে না,’ বললো রানা। ‘হার-পুন গান ছুঁড়ে সে-রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে তুমি।’

বরফের গর্জন আর ঝাঁকি ধীরে ধীরে কমে এলো। বোধহয় সকালের দিকেই একেবারে শান্ত হয়ে গেল হিমরাজ্য, ভোর পাঁচটার দিকে তাঁবু থেকে বেরিয়ে কোথাও কিছু নড়তে দেখলো না রানা। স্বচ্ছ বাতাস, নতুন ঝরা সাদা তুষার এতো উজ্জল যে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আকাশের কোথাও কোনো মেঘ নেই। সূর্য বিশাল একটা ব্যাপার, মাঝখানটা সোনালি, সেটাকে ঘিরে আলোর প্রকাণ্ড একটা বৃত্ত তৈরি হয়েছে। বৃত্তের একটা অংশে ঘন তার গাঢ় হয়ে জমাট বেঁধেছে আলো, নকল একটা সূর্যের মতো সোনালি কিরণ রাঙিয়ে তুলেছে গোটা আকাশ। ওদের চারদিকে সব ধরনের বরফে আলাপা রঙ ফুটেছে। দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকে কালো ধোঁয়ার স্তম্ভ দেখা গেল, অসংখ্য পানিপথ থেকে ওঠা বাষ্প ওগুলো। সব মিলিয়ে দৃশ্যটা এতো সুন্দর যে দম বন্ধ হয়ে আসে, কার প্রতি যেন কৃতজ্ঞতায় নত হয়ে আসে মাথা। মুগ্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকলো রানা, প্রকৃতির রূপ

দেখে পাগল হওয়া ওর চিরকালে স্বভাব ।

খানিক পর লিবার্টি-থ্রু ওপর নক্ষর পড়লো ওর । আশুন নিভে গেছে, তবু পাতলা ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী দেখা গেল, এঁকেবঁকে উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে, কলুষিত করছে নির্মল পরিবেশটাকে । জাহাজটার দাস্তল, চিমনি, ত্রিঙ্গ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে, পোড়া দাগ গায়ে নিয়ে রয়ে গেছে শুধু খোলটা । করভেটের জুরা হাঁটাচলা করছে বরফের ওপর, টানা-হাঁচড়া করে রসদ সরাচ্ছে । বরফের রাজ্যে কাল রাতের আলোড়ন ওদেরকেও অস্থির করে রেখেছিল ।

ওদের নিজেদের অবস্থা রাতে আরো খারাপ হতে পারতো । কাটলটা আবার উন্মুক্ত হবার পর বন্ধ হয়ে গেছে । এই মুহূর্তে ওদের দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকে সরু পানিপথ দেখা যাচ্ছে, দুই ক্যাম্পের মাঝখানে একটা বাধা । তবে উত্তর-পূর্ব দিকে চেহারা দেখে মনে হলো বরফ অত্যন্ত কঠিন—উচু-নিচু, ভাঙাচোরা সাদা প্রান্তর, তুষারে ঢাকা, মাঝে মাঝে ছ'একটা পাহাড় মাথা তুলে আছে । কাঁপা কাঁপা দিগন্তরেখা ঝাপসা, প্রতি মুহূর্তে সচল, যেন পানির ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছে স্নানা । বহুদূরে, দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে, বড় আকারের কয়েকটা আইস-বার্গ দেখতে পেলো ও, তবে দৃশ্যপট দ্রুত বদলে যাওয়ায় সেগুলো ঘন ঘন আকৃতি পাঁটোচ্ছে ।

সব মিসিয়ে মোটামুটি নিরাপদই মনে হলো নিজেদের । তবে কঁক-কোকর সবই ভতি করে দিয়েছে তুষার, কোথায় গর্ত চেনার উপায় নেই । আরেকটা উদ্বেগ হলো, পূর্ব দিকের সচল বরফ । ভোঁতা ও অস্পষ্ট একটা আওয়াজও ভেসে আসছে ওদিক থেকে ।

রানার প্রথম দায়িত্ব হলো লিবার্টি-ফাইভের সাথে যোগাযোগ করা । ক্যাচার থেকে নিজের ও বাবার স্কি-গুলো নামাতে ভুল করেনি

এরিকা। ত্রেকফাস্টের পর হোলস্টাডকে নির্বাচন করলো রানা, ত্রু-  
মধ্যে সে-ই ছি-তে সবচেয়ে ভালো। একটা হারপুন ফোররানার দি-  
নিজেদেরকে বাঁধলো ওরা, তারপর রওনা হয়ে গেল বড়সড় এক-  
বরফের পাহাড় লক্ষ্য করে, আধ মাইল দূরে ওদের উত্তরে খাড়া  
রয়েছে সেটা।

নিজেদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে নেয়ার অনেকগুলো বিপদ থেকে  
পেলো ওরা। তুষারে ঢাকা গর্তের ভেতর তিনবার পড়লো রানা  
প্রতিবার হোলস্টাড টেনে তুললো ওকে। রশি না থাকলে সাপ-  
তলিয়ে যেতো ও।

পঁচিশ ফুটের মতো উঁচু পাহাড়টা। ওটার মাথা থেকে লিবার্টি-  
ফাইভকে কালো ফেঁটার মতো দেখতে পেলো ওরা। তুষারের সাপ-  
উজ্জলতার বাঁধানো চোখে বিনো কিউলার তুলেও পরিষ্কার দেখা গে-  
না জাহাজটাকে। বাপসা যে-টুকু দেখা গেল, মনে হলো কাত হয়ে  
আছে সেটা, একদিকে নিরেটদর্শন অতিকায় বরফ, আরেকদিকে অসংখ্য  
আলগা বরফের সমষ্টি, মাঝখানে চ্যাপ্টা হয়ে আছে লিবার্টি ফাইভ।  
খুঁদে মূর্তিগুলোকে বরফের ওপর চলাফেরা করতে দেখা গেল। আইস-  
বার্গের কিনারায় উঁচু একটা কালো ভূপ দেখে রানা ধারণা করলো  
জাহাজ থেকে উদ্ধার করা রসদ ওগুলো। বরফের পাহাড় আর লিবার্টি-  
ফাইভের মাঝখানে পুরো এক মাইল জুড়েই প্রেশার রিড ও কালো  
ফাটল রয়েছে। প্রথমে মনে হলো আলোছায়ার কারসাজি, কিন্তু কিছু-  
ক্ষণ ভাকিয়ে থাকার পর রানা বুঝতে পারলো লিবার্টি-ফাইভের  
সামনে এবড়োখেবড়ো সাদা প্রান্তর অলসভঙ্গিতে মোচড় খাচ্ছে।  
তারপরই অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতে পেলো ও। বরফের প্রকাণ্ড টুকরো,  
একেকটা একতালি বাড়ির চেয়ে ছোটো নয় আকারে, ভাসমান বরফের

সংঘর্ষে লাফ দিয়ে শূন্যে উঠলো, স্থির বাতাসে ভেসে এলো গুরু-  
গভীর আওয়াজ। আরো সামনে, অতিকায় সমতল পিঠ আইসবার্গের  
দিকে, মাথাচাড়া দিলো লম্বা একটা প্রেশার রিজ।

এরিকার কাছ থেকে ধার করা আয়নাটা পকেট থেকে বের করলো  
রানা, সেটায় সূর্যের আলো ধরে জাহাজের গায়ে ফেলার চেষ্টা করলো।  
লিবার্টি-ফাইভের গায়ে আলোটা পড়লো কিনা বোঝা গেল না। বর-  
ফের ওপর যারা হাঁটাচলা করছে তাদের আচরণেও কোনো পরিবর্তন  
লক্ষ্য করা গেল না। হতাশ হয়ে আয়নাটা পকেটে ভরে রাখতে যাচ্ছে  
রানা, এই সময় পাল্টা আলোর ঝলক লাগলো ওর চোখে। আলোটি  
এতোই নিস্তেজ, সংকেতের কোনো অর্থই করা গেল না। ছ'পক্ষ  
থেকেই মেসেজ বিনিময়ের চেষ্টা চললো, কিন্তু সফল হওয়া গেল না।  
হাল ছেড়ে দিয়ে সামনের বরফ প্রান্তরের ওপর নজর বুলালো রানা।  
অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করার পরও ঠিক বুঝতে পারলো না, দূরত্বটুকু  
পেরোনো সম্ভব কিনা। জানতে হলে ওদিকে এগিয়ে দেখতে হবে।

ফিরতি পথে সময় আরো বেশি লাগলো। ক্যাম্পের কাছাকাছি  
আসতেই দেখা হলো এরিকার সাথে, অস্থির দেখালো তাকে। 'সারা  
বরফের চাপ বাড়ছে।' রুদ্ধশ্বাসে বললো সে। 'দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে  
কয়েকটা আইসবার্গ এগিয়ে আসছে। আমার একদম ভালো লাগছে  
না।'

ক্যাম্পের পাশে পৌঁছে দাঁড়ালো রানা, পূর্ব থেকে ভেসে আসা  
বিক্ষোভিত আর সংঘর্ষের আওয়াজ শুনলো কান খাড়া করে। আগের  
চেয়ে জোরালোই লাগলো। পায়ের তলায় বরফ কাঁপছে, কোনো  
বিরতি ছাড়াই। মাঝে মধ্যে কামানের গর্জনকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে  
সিগন্যাল পিস্তলের মতো তীক্ষ্ণ আওয়াজ, সেদিকে তাকালেই দেখ

গেল ন্যাক আইস কেটে ছ'ভাগ হয়ে গেছে। রানার একটা বাতাস  
খামচে ধরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অপর হাতটা তুললো এরিকা। দিগন্ত  
রেখা জুড়ে সাদা বাষ্প মেঘ হয়ে আছে। নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি নেই  
নমকা বাতাস লাগা ধোঁয়ার মতো প্রতি মুহূর্তে এলোমেলো ভাবে  
যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে পানিপথগুলোর ওপর মোটা স্তরের আকৃতি নির্মা-  
ন হয়ে পড়ছে, তারপর বিকশিত হচ্ছে আণবিক বিস্ফোরণের মতো  
একবার ছবছ বরফের তৈরি উল্টো করা দুর্গ বলে মনে হলো। 'আইস-  
বার্গ,' বললো এরিকা। 'আজ সকালেই দেখেছি। এখন অনেক কাছে  
চলে এসেছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার পূর্ব দিকের গর্জন শোনার জন্যে কান  
পাতলো রানা। 'হ্যাঁ, লক্ষণ ভালো নয়।'

'ওদিকে একটা ঝড় বইছে,' বললো এরিকা। 'বরফগুলোকে আমা-  
দের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বাতাস। তবে,' বলে একটা ঢোক গিললো  
সে, 'তবে, পূর্ব দিক থেকেও একটা চাপ আছে।'

'ছোটো যদি এক হয়?'

কীণ, ঠোট কাঁপা হাসি নিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো এরিকা। 'বিপদ হবে।  
বরফের আরো শক্ত আশ্রয় দরকার আমাদের।'

ছোটো পাহাড়টার দিকে তাকালো রানা, ওটার ওপর দাঁড়িয়ে  
লিবার্টি-ফাইভকে সংকেত পাঠানোর চেষ্টা করেছিল ও। ভাসমান  
পাহাড়, যথেষ্ট চওড়া, অত্যন্ত কঠিন বলেও মনে হয়। কিন্তু তারপরই  
রানার মনে পড়ে গেল, বরফের বড় বড় টুকরোগুলো কিভাবে লাফ  
দিরেছিল সমতল আইসবার্গের দিকে। অসহায় বোধ করলো ও; উপ-  
লব্ধি করলো, প্রকৃতির অসীম শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে কোনো  
লাভ নেই। 'কোকুনের কোনো খবর পেলো?'

‘হ্যা। লিবার্টি-থ্রু এস. ও. এস. পেয়ে লিবার্টি-ওয়ানকে পাঠিয়েছে ওয়া। কারসেন, ওটার কাপটেন, লিবার্টি-থ্রু দেয়া পক্ষিশনের কাছ থেকে বিশ মাইল দূরে কয়েকটা আইগবার্গ দেখতে পেয়েছে বলে রিপোর্ট করেছে।’

‘বিশ মাইল!’ দক্ষিণ-পশ্চিমে তাকালো রানা। যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও খোলা সাগর নেই। সরু পানিপথ থাকলেও থাকতে পারে, ওয়া দেখতে পাচ্ছে না। তবে বিধ্বস্ত লিবার্টি-থ্রু চারপাশে ভাসমান বরফের মাঠগুলো পরম্পরের সাথে সঁটে আছে, সেই দিগন্তরেখা পর্যন্ত কোথাও কোনো ছেদ নজরে পড়ে না। বরফের এই কঠিন প্রান্তর ভেঙে এগোনো একটা করভেটের পক্ষে সম্ভব নয়। ‘টোইং ভেসেল পাঠিয়ে কোনো লাভ নেই,’ বললো রানা। ‘রেডিও থাকলে কোকুনকে পরামর্শ দেয়া যেতো।’

‘স্যার,’ আবার কঁধ ঝাঁকিয়ে বললো এরিকা, ‘এর বেশি আমরা কিছু আশাও করতে পারি না। যাই ঘটুক না কেন, কোকুনকে ওয়া বিপদের মধ্যে ফেলবে না।’

‘কেন?’

‘কোকুনের দামটা চিন্তা করুন। চিন্তা করুন তিনটে ক্যাচারের তুলনায় কতো বেশি লোক রয়েছে ওতে। টোইং বোট বা একটা ট্যাংকারেই সমুদ্র থাকতে হবে আমাদের।’

‘করভেট যদি পথ করে নিতে না পারে, ট্যাংকারও পারবে না,’ বললো রানা। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো ও, নিজের চেষ্টায় বাঁচতে হবে ওদেরকে। ‘উঁচু ওই বরফে ক্যাম্প সরিয়ে নেবো আমরা। জিনিসপত্র যা আছে, সমান দু’ভাগে ভাগ করো। আজ আমরা এক ভাগ সরাবো।’

প্যাকিং কেস দিয়ে একজোড়া স্নেজ বানাণো ওরা। দু'জন পাহারাদারের ব্যবস্থা করা হলো—একজন নিশ্চয় নেয়ার সাথে সাথে রাখবে ক্যাম্পের ওপর, অপরজন বরফের পাহাড় অভিযুগে হবে। দ্বিতীয় দায়িত্বটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো রানা, স্নেজের সাহায্যে নিরাপদ পথ তৈরি করলো, রসদ-পত্র নিয়ে ওর পিছু নিলো কিছু লোক। নরম তুলতুলে তুষারে মাঝে মাঝেই ডুবে গেল স্নেজ, লোকগুলো পিছিয়ে পড়ায় টেনে-হিঁচড়ে একার চেষ্ঠায় সেটাকে আবার তুলতে হলো রানারই। বাছ আর পিঠ ব্যথায় টন টন করতে লাগলো, কনকনে ঠাণ্ডায় ঘন ঘন ঝাঁপাচ্ছে ও, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফোটান সাথে সাথে সেগুলো বরফকুচি হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্যে পৌঁছুতে তিন ঘণ্টা লাগলো ওদের। আধ ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে ফিরতি পথে যাত্রা। এবার সময় লাগলো দেড় ঘণ্টা, ক্যাম্প থেকে এগিয়ে এসে প্রথম পাহারাদার এরিকা, মিলিত হলো ওদের সাথে। বিপজ্জনক বরফের ওপর দিয়ে বেপরোয়া ভঙ্গিতে তীরবেগে স্নেজ চালিয়ে এলো সে, চেহারায় উত্তেজনা। ব্রেক কষে ওদের সামনে থামলো এক রাশ তুষার ছড়িয়ে। চিৎকার করে বললো, ‘কোকুন নিজেই আসছে!’ চিৎকার বন্ধা বললো।

‘বরফে ঢুকছে কোকুন?’

মাথা নাড়লো এরিকা। ‘তা বলতে পারি না। আপনি রওনা হবার পরপরই ক্যাপটেন কারসেন রেডিওতে আসে। বরফে আটকা পড়ে সামনে এগোবার কোনো পথ দেখতে পাচ্ছে না। ক্যাপটেন ভেনসম ফ্যাক্টরি শিপ থেকে নির্দেশ দেন, আবার চেষ্ঠা করো। কিন্তু কাজ হয়নি। এরপর কর্নেল ওয়াকার কথা বলেন কারসেনের সাথে। কারসেনকে ধমক দিয়ে তিনি বলেন, পথ একটা তাকে খুঁজে পেতেই হবে। এক

ঘণ্টা পর নিম্নের বার্ষিকতার কথা জানার কারসেন। আইসপ্যাক নিশ্চিত নিরেট। বিভিন্ন পানিপথ দিয়ে এগোবার চেষ্টা করেছে সে, দশ মাইল জায়গা ছুড়ে, কোনো লাভ হয়নি। এরপর কর্নেল বললেন, কোকুনকে নিয়ে তিনি নিজেই আসছেন। কোকুন সম্ভবত বরফ ভেঙে এগোবার চেষ্টা করবে, কি বলেন?’ এরিকার চেহারার অনিশ্চিত ভাব।

‘তুমিই না বলেছিলে ফ্যাটরি শিপ কোনো বিপদের ঝুঁকি নেবে না।’

হু’সেকেও ইতস্তত করলো এরিকা। ‘হ্যাঁ, সাধারণ নিয়ম সেকথাই বলে।’

‘আর কি বলেছেন কর্নেল ওয়াকার?’ রানার চোখে অনুসন্ধানী দৃষ্টি।

দ্রুত মুখ তুলে রানার দিকে তাকালো এরিকা। ‘কর্নেল না, কারসেন। সে বলেছে, এক সারিতে অনেকগুলো আইসবার্গ রয়েছে। পাঁচ কি ছ’টা। কয়েকটা অসম্ভব বড়।’ একটা ঢোক গিললো সে। ‘সবগুলোই নাকি প্যাকে ঢুকছে। প্রকাণ্ড চওড়া একটা লাইন ধরে প্রেশার রিজ তৈরি হচ্ছে। অনেকগুলো আইসবার্গের চাপ খেয়ে প্যাক আইস আরো কঠিন হয়ে উঠছে।’

‘আমরা কি এই আইসবার্গগুলোই আজ সকালে দেখেছিলাম?’

মাথা ঝাঁকালো এরিকা। ‘ক্যাম্পে ফিরে বাস্তবের ওপর দাঁড়ালে দেখতে পাবেন। বরফের আওয়াজ আগের চেয়ে কাছে সরে এসেছে।’

কথা না বলে তাড়াতাড়ি ক্যাম্পে ফিরে এলো রানা। তুল বললেন এরিকা। আইসবার্গগুলো সত্যি আরো কাছে সরে এসেছে। কাঠের বাস্তবের ওপর দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকটা পরিষ্কার দেখতে পেলো ও। দীর্ঘ যাত্রা অন্তত-২



লাইনে সাতটা গুলো—এবার আর বাষ্পের ভেতর আবছা বা শুধু প্রতিফলন নয়, সরাসরি আইসবার্গগুলোকে দেখতে পেলো। এক লাইনে পালতোলা জাহাজের একটা বহরের মতো লাগলো ওগুলোকে।

‘আমার ধারণা, কোথাও খুব বড় একটা ঝড় চলছে,’ বিড়বিড় করে রানার পাশ থেকে বললো এরিকা। ‘বরফের ওপর চাপ বাড়ছে। মাঠ, পাহাড় আর ভেসে থাকা টুকরোগুলো প্রতি মুহূর্তে এক হয়ে জমাট বাঁধছে।’

‘বুঝলাম,’ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো রানা। ‘কিন্তু এ-ব্যাপারে আমাদের করার কিছু নেই।’ মাল-পত্রের দ্বিতীয় চালানটা দিয়ে বরফের পাহাড়ে ডাকে পাঠিয়ে দিলো ও।

ভাবতে কাত হয়ে সিগারেট ফোঁকা আর রেডিও শোনা ছাড়া করার সত্যি কিছু নেই। কুরা সবাই উত্তেজিত, মনে আশার অন্ত নেই। সারাক্ষণ বকবক করছে তারা, গলা ছেড়ে হাসছে। কোকুন লিবার্টি-ওয়ানকে নির্দেশ দিলো নিজের জায়গায় স্থির থাকো, আমরা বরফে ঢুকতে যাচ্ছি। কুরা উল্লাসে ফেটে পড়লো, যেন এরইমধ্যে উদ্ধার পেয়ে গেছে তারা। কোথেকে কে জানে এক বোতল হুইস্কি বেরিয়ে এলো, সবার আগে ক্যাপটেনকে সাধা হলো চুমুক দেয়ার জন্যে। শান্তভঙ্গিতে হাত নেড়ে প্রত্যাখ্যান করলো রানা। তাসও বেরলো, তরু হয়ে গেল ব্রিড। কারো মনে কোনো উদ্বেগ নেই, সবাই যেন ট্রেন আসার অপেক্ষার সমবেত হয়েছে প্ল্যাটফর্মে। একা শুধু রানা উদ্বিগ্ন, ভাবছে কোকুনকে বরফে নিরে আসার ঝুঁকিটা কেন নিলেন কর্নেল ওয়াকার।

আগের দিন ওরা যে-ধরনের বরফের ভেতর দিয়ে এসেছে, সেটা

ভেঙে ভেঙে ঢোকা কোকুনের পক্ষে কঠিন কিছু নয় । 'ওটার বাইশ  
 হাজার টন ওজন আর রিএনফোর্সড নো বারো ফুট পুরু বরফ ভেঙে পথ  
 করে নিতে পারে । পরিস্থিতি যদি আতঙ্ক কালকের মতো হয়, ওদের  
 কাছে অনায়াসে পৌঁছুতে পারবে কোকুন । কিন্তু তাঁর দৃশ্য দেখানো  
 রানা কাত হয়ে আছে সেখান থেকে লিবাটি-থ্রু পোড়া পোল আর  
 'দিগন্তরেখায় আইসবার্গগুলোকে দেখতে পাচ্ছে ও, অগ্রভাগ করছে  
 পাঞ্জরের নিচে বরফের কাঁপন । শিরদাঁড়ায় শিরশিরে একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ  
 পেলো ও । পূর্বদিক থেকে ঝড়ের কবলে পড়া আগল । বরফের আর্ত-  
 নাদও শুনে পাচ্ছে । এ-সব ব্যাপার কিছুই জানা নেই কর্নেলের ।  
 রেডিও থাকলে তাঁকে সতর্ক করা যেতো । তবে, অন্তত আইসবার্গ-  
 গুলো তিনি দেখতে পাচ্ছেন বলে মনে হয় । ওগুলোর পাশ ঘেঁষে  
 অথবা ওগুলোর ভেতর দিয়েই আসতে হবে কোকুনকে । বিপদের  
 মাত্রা হিসেব করার জন্যে ওদের চেয়ে ভালো পজিশনে আছেন তিনি ।  
 চারশো লোক রয়েছে কোকুনে, কেন তিনি এতোগুলো লোককে বিপ-  
 দের মধ্যে ফেলতে যাচ্ছেন ? জাহাজটার কথাও তো ভাবতে হবে  
 তাঁকে । কারণটা কি একমাত্র সন্তান মার্ক রোসেট ? নাকি তাঁর সিদ্ধা-  
 ন্তের পিছনে বোনার পাইটনের মৃত্যুরহস্যেরও কোনো ভূমিকা আছে ?  
 কিংবা, জানেন মারা যাবেন, তাই স্রেফ বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন ?

ছবিটা কল্পনা করার চেষ্টা করলো রানা । বড় কেবিনটায় চেয়ারে  
 বসে দোল খাচ্ছেন, সিদ্ধান্ত নেবেন । ভদ্রলোক হৃদয়হীন পাষণ  
 তো বটেই, দুনিয়ার বাকি সব সফল ব্যবসায়ীর মতোই । তাঁর চিন্তা-  
 চেতনায় আর-সব লোকের জীবনমরণের প্রশ্ন গুরুত্ব পাবার কথা  
 নয় । টাকার মায়া, হ্যাঁ, সেটা তাঁর থাকার কথা—তবে শরীরের যে  
 অবস্থা তাতে টাকা এখন আর তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার  
 যাত্রা অন্তত-২

নয়। টাকা দিয়ে তিনি এখন আর জীবনের অতিরিক্ত একটা মুহূর্ত  
 কিনতে পারবেন না। খই ছড়ানোর মতো করে দু'হাতে টাকা ওড়া-  
 বার সামর্থ্য তাঁর আছে। সংগ্রামী জীবনের শুরু থেকেই সব রকম  
 বাধাকে শত্রু হিসেবে গণ্য করে এসেছেন, প্রকৃতিও তাঁর পুরনো একটা  
 শত্রু। তিনি যদি এখন বরফের সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন,  
 বিনা ছিদায় কোম্পানির বিশ্বস্ত কর্মীবাহিনীকে বিপদের মধ্যে ফেলে  
 দিতে পারেন, ঝুঁকি নিতে পারেন ফ্যাক্টরি শিপ হারাবার। হঠাৎ  
 বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা কথা মনে পড়লো রানার। এমন কি হতে  
 পারে, কর্নেল ওয়াকার জানেন, পোলার হোলিং কোম্পানির মালিক  
 এখন আর তিনি বা তাঁর ছেলে নয়, বেশিরভাগ শেয়ারের মালিক  
 পাইটন পরিবার? সেজন্যেই কি, জেনেও, কোকুনকে এতো বড়  
 একটা ঝুঁকির মধ্যে ফেলছেন?

## তিন

রাত আটটার খানিক পর কোকুনের অপারেটর ওদেরকে ডাকলো, প্রথমে নরওয়ের ভাষায়, তারপর ইংরেজিতে। একটানা আধ ঘণ্টা ডাকার পর কিছুক্ষণ বিরতি। এরপর ফিরে এসে একটা মেসেজ দিলো। 'একুশ ঘণ্টায় ধোঁয়া ছাড়ছি আমরা।' আবার বলছি, একুশ ঘণ্টায় আমরা ধোঁয়া ছাড়বো। ধোঁয়াটা দেখামাত্র যে-কোনো উপায়ে সম্ভব সংকেত পাঠাও তোমরা। কোকুন টু ক্যাচারস, লিবার্টি...।' একই মেসেজ পুনরাবৃত্তি হতে থাকলো। তেলের একটা ড্রামে ট্র্যাপ ফিট করেছে রানা, তা থেকে কাপড়ের একটা বস্তায় তেল পড়ছে। বাজের ওপর বাজ দাঁড় করিয়ে দশ ফুট উচু একটা মঞ্চ তৈরি করা হলো, ন'টার খানিক আগে তার ওপর তুলে দেয়া হলো তরুণ এক লুকআউটকে। সবাই ওরা দারুণ উত্তেজিত হয়ে আছে। তাঁবুর ভেতর একজনও টিকতে পারেনি, রেডিওটা বগলদাবা করে বেরিয়ে এসেছে রানাও।

ন'টার সময় কোকুনের অপারেটর আরেকটা মেসেজ প্রচার করলো। 'আমরা এখন ধোঁয়া তৈরি করছি। আইসবার্গের একটা লাইন থেকে যাত্রা অন্ত-২

তিন মাইল পূবে রয়েছি আমরা, উত্তর থেকে গুলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আইসবার্গের ভেতর দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছি আমরা। যদি পারো সংকেত দাও।’

সবার দৃষ্টি লুকআউটের ওপর স্থির। দক্ষিণ-পশ্চিম দিগন্তরেখার কাছাকাছি থেকে আলো ছড়াচ্ছে সূর্য, চোখ কুঁচকে দূরে কিছু দেখা যায় কিনা লক্ষ্য করছে লুকআউট। চোখ পিটপিট করলো সে, বার কয়েক হাতের উন্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়ালো। তারপর হঠাৎ আড়ষ্ট হলো শরীরটা, লম্বা করলো হাত। ‘ওই!’ আনন্দে নাচানাচি শুরু করলো জুরা। বজ্রপাতের শব্দ তুলে কেঁপে উঠলো পায়ের নিচে বরফ, আশপাশের কোনো একটা বরফের মাঠে ফাটল ধরেছে। সখেদে ভাবলো রানা, লিবার্টি-থির আগুন না নিভলে কি ভালোই না হতো।

তেলে ভেজা কাপড়ে আগুন ধরাবার নির্দেশ দিলো রানা। লোকটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি ছালাবার আগেই হাত নেড়ে নিষেধ করলো তাকে—ঘন ঘন মাথা নাড়ার সাথে চোখ রগড়াচ্ছে লুকআউট। নাচ বন্ধ হয়ে গেল জুদের। লুকআউটের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সবাই, চোখ কুঁচকে বিহ্বলদৃষ্টিতে সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে সে। আবার সে হাত তুলে একটা দিক দেখালো, এবার আরো দক্ষিণে। তার পাশে উঠে পড়লো রানা, হু’জনের ভারে হুলতে লাগলো কাঠের বাস্তুগুলো। দক্ষিণে ধোঁয়া আছে সত্যি, তবে সেটা অত্যন্ত কাছাকাছি, ভুল বা অন্য দিকেও বটে। রানার তাকিয়ে থাকার সময়ই কালো মোটা আকারীকা দাগটা চওড়া হয়ে গেল। সূর্যকিরণে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় সেদিকে কোনো আইসবার্গ দেখা গেল না। ‘ওগুলো বোধহয় ফ্রস্ট-স্মোক,’ বললো রানা। জুরা সবাই হতভম্ব হয়ে গেল, তাকিয়ে আছে পশ্চিম দিকে। হঠাৎ করে যেন ওদের আত্মাকে স্পর্শ করেছে মৃত্যুর

হিমশীতল হাত । চোখ কুঁচকে কোকুনের সম্ভাব্য অবস্থানের দিকে তাকালো রানা । কিন্তু পরিষ্কার কিছু দেখতে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার । গোটা পরিবেশ আর আবহাওয়া বিরতিহীনভাবে প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে ।

বরফের ভেঁতা গর্জন আর চাপা গোঙানি আগের চেয়ে আরো কাছে সরে এসেছে, বাজ থেকে নামার পর পায়ের নিচে বরফের কাঁপন অনুভব করলো রানা । কেউ একজন চিৎকার করে উঠলো, দেখা গেল এক মাইল দূরেও নয়, লিবার্টি-থ্রু কে ছাড়িয়ে খানিক সামনে, ভাসমান বরফের একটা মাঠ কিনারায় ভর দিয়ে খাড়া হলো, স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো এক মুহূর্ত, তারপর ঢলে পড়লো সাগরে । বড় একটা ফাটল তৈরি হচ্ছে । পানির ছোট্ট একটা বিস্তৃতি দেখতে পেলো ওরা । চারদিকের সাদা বরফের মাঝখানে কালো মোটা একটা রেখার মতো লাগলো । বাতাস ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন নিরেট আর কালচে হয়ে উঠলো । ফ্রস্ট-স্মোক ছড়িয়ে পড়লো কুয়াশার মতো, সব কিছু ঢেকে দিচ্ছে, আড়াল করছে সূর্যকে । চারদিক থেকে অদৃশ্য হলো আলো আর তার আভা, বরফ থেকে গায়েব হলো সমস্ত রঙ । জুদের সাঙ্খ্যনা দেয়ার ছলে রানা বোঝাবার চেষ্টা করলো, আগুন ছেলে সংকেত দেয়ার তুলনায় ফ্রস্ট-স্মোক মার্কার হিসেবে অনেক ভালো, যদিও হঠাৎ করে জনিয়াটা সাদা আর অসহ্য ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ায় ভয়ের একটা শিরশিরে অনুভূতি ওর নিজেরই শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে এলো । জুরা অনভিজ্ঞ নয়, ফলে কেউই স্বস্তিবোধ করলো না । উদ্ধারের সম্ভাবনা আর তাদের মাঝখানে ঝুলে আছে কালো ওই পর্দাটা । স্টুয়ার্ডকে ডেকে কফি বানাবার নির্দেশ দিলো রানা । ব্রিজ খেলায় ফিরে গেল চারজন জু । দু'জন লোককে পাহারায় রেখে রেডিওটা নিয়ে নিজের যাত্রা অন্ত-২

তাঁবুতে ফিরে এলো রানা ।

বরফের কাঁপনটা উদ্ভিগ্ন করে তুললো ওকে, পূর্ব থেকে এভাবে যদি ধাক্কা খেতে থাকে, বরফের মাঠটা আর বেশিক্ষণ অটুট থাকবে বলে মনে হয় না । ফাঁদে পড়া অসহায় প্রাণীর মতো লাগলো নিজেকে । এমনকি তরল আগুনের মতো গরম কফি খেয়েও তলপেট মোচড়ানো ভয়ের অনুভূতি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল না ।

‘আমরা ফ্রস্ট-শ্মোক দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কোনো সংকেত পাচ্ছি না । যেভাবে পারো সংকেত দাও । বরফ এদিকে অত্যন্ত পুরু আর কঠিন হয়ে উঠছে । আর কতক্ষণ আমরা এগোতে পারবো বলতে পারছি না ।’ একটানা আধ ঘণ্টা ধরে ওদেরকে সংকেত দেয়ার জন্যে তাগাদা দিলো কোকুন । অপারেটরের বদলে ডাফ পিটারসেন নিজে এলো ইথারে, সরাসরি সে তার মেয়ে এরিকাকে উদ্দেশ্য করে কথা বললো, চেষ্টা করলো ওদের সবাইকে সাহস আর উৎসাহ যোগাতে । তবে, কর্নেল ওয়াকার রোসেট তাঁর ছেলের সাথে যোগাযোগ করার কোনো চেষ্টা করলেন না । এরপর মেসেজগুলো আগের চেয়েও জরুরী ভঙ্গিতে প্রচার করা হলো । অবশেষে কোকুনের রেডিও অপারেটর জানালো, ‘আমরা অত্যন্ত ধীরগতিতে এগোতে পারছি । আমাদের পিছনে আইসবার্গগুলো বরফ পিষে এগিয়ে আসছে । শিগগির সংকেত না পেলে তোমাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা বাদ দিতে হতে পারে ।’ এর আগের মেসেজগুলো নরওয়ে ও ইংরেজি ভাষায় প্রচার করা হয়েছিল, এটা প্রচার করা হলো শুধু ইংরেজিতে । সম্ভবত ক্রুদের হতাশ করতে না চাওয়ার ইচ্ছে থেকে । যদিও, যারা ইংরেজি জানে না তারাও মেসেজটার সারমর্ম উপলব্ধি করতে পারলো, যারা বোঝে তাদের মুখ-ভাব লক্ষ্য করে ।

হঠাৎ একজন লুকআউট চিৎকার করে উঠলো। লাফ দিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো রানা। ‘স্বি নিয়ে কে যেন আসছে!’ হাঁপাতে হাঁপাতে বললো লোকটা।

‘ম্যানেজার পিটারসেন?’ বুকভরা আশা নিয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘না। লিবার্টি-থ্রু থেকে।’ কালো ফ্রন্ট-স্মোকের দিকে হাত তুললো লুকআউট।

সেদিকে তাকিয়ে বরফের সাদা, ঠাণ্ডা আকৃতি ছাড়া কিছুই দেখলো না রানা। তারপর কালো একটা রেখার কাঁপন ধরা পড়লো চোখে, পরমুহূর্তে অদৃশ্য হলো সেটা। কয়েক সেকেন্ড পর আবার দেখা গেল, একশো গজ দূরেও নয়। ওটা যে একটা মনুষ্যমূর্তি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বরফ আর তুষারে ঢাকা পড়ে আছে লোকটা। একটা স্মিটিক নেড়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সে, চিৎকার করে কি যেন বলতে চাইলো। বরফে ঘন ঘন স্টিক ঠেকিয়ে দ্রুত কাছে চলে আসছে।

কাকে আশা করবে বুকতে পারলো না রানা—লোকটা হেলমুটসেনও হতে পারে, মার্ক হওয়াও বিচিত্র নয়। তাঁবুতে ফিরে গিয়ে রাইফেলটা আনবে কিনা একবার ভাবলো ও। খোলা বরফের মাঠে নিজে-কে অসহায় আর নগ্ন লাগলো। তবু, ভয় পেয়েছে স্বীকার করতে রাজি হলো না ওর মন। কাজেই স্থির দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকলো ও, জানে না একজন উন্মাদ নাকি শুধু একজন বদরাগী লোকের সাথে দেখা হতে যাচ্ছে ওর। লোকটা কাছে চলে আসতে রানা লক্ষ্য করলো, হেলমুটসেনের তুলনায় বেশ খানিকটা বেঁটে সে। তারপর তাকে চিনতে পারলো ওরা।

‘স্যালুট, ক্যাপটেন!’ রানার সামনে স্মি থামিয়ে করমর্দনের জন্যে যাত্রা অশুভ-২



হাতটা বাড়িয়ে দিলো। আপানী ফটোগ্রাফার কাইশু ওকোমো। তার  
সদাহাস্যময় চওড়া মুখে রাজ্যের বিরক্তি, নাকি সুরে বললো, ‘আপনার  
আপনাকে দেখতে পেয়ে কি যে আনন্দ লাগছে। নরক সম্পর্কে আপ-  
নার কোনো ধারণা নেই, মিঃ রানা।’

‘কেন? অসুবিধেটা কি?’

‘অসুবিধে?’ ঠিক ধরা হাতটা এতো দ্রুত আর ঘন ঘন নাড়ায়  
কাইশু ওকোমো যে আহত হবার ভয়ে এক পা পিছিয়ে আসতে হলে  
রানাকে। ‘আপনি জিজ্ঞেস করছেন অসুবিধেটা কি?’ বিষয় এবং উদ্দেশ্য  
জনায় কিছুক্ষণ বাকবন্ধ হয়ে থাকলো লোকটা। ‘আরে, ওখানে শৃংখলা  
বলতে কিছু আছে? মার্ক রোসেটের কোনো কথাই কেউ শুনছে না,  
মেট হেলমুটসেন বা ডানকানকেও মানতে রাজি নয় তারা। প্রথমে  
মার্ক রোসেট ভয়ানক রাগ দেখায়, চড়ও মারে একজনকে। বাস, তার-  
পর থেকে সবাই বেকে বসেছে, সরে গিয়ে আলাদা ক্যাম্প করেছে  
তারা। বুঝে দেখলাম, বিপদ গুরুতর, তাই কেটে পড়লাম—কি বলেন,  
ভালো করিনি?’

‘ওদের সাথে রসদ ইত্যাদি আছে?’

‘তা আছে। উফ্, বরফের ওপর দিয়ে কিভাবে যে এসেছি। উঠুন,  
বাক্সের ওপর উঠুন, দেখাই আপনাকে...’ রানার হাত ধরে টান  
দিলো সে।

‘থাক, এখন ওসব...’

রানার কথা শুনলো না কাইশু ওকোমো, বাক্সের ওপর দাঁড় করালো  
ওকে। ‘দেখুন। ক্যাম্পটা ওই যে, কেমন? প্রথমে সব ঠিকই ছিলো,  
তারপর হঠাৎ করে দেখি বরফ নেই, দাঁড়িয়ে আছি কোমর সমান  
পানিতে। দেখতেই পাচ্ছেন, সাংঘাতিক ভিজে গেছি আমি। তারপর

যা-ও যা আবার বরফ পেলাম, ও মা, খানিক পরপর একটা করে গর্ত  
—একবার ডুবি, একবার জাগি, একবার ডুবি, একবার...।’

তাকে খামিয়ে দিলো রানা। বাধা পেয়ে ভারি ক্ষুব্ধ হলো কাইশু ওকোমো। মুখ হাঁড়ি করে ফেললো সে। রানা বললো, ‘আপনি  
‘বোকার মতো বুঁকি নিয়েছেন। একা আসা উচিত হয়নি আপনার।’

‘তারমানে কি আপনি বলতে চান, আমি একটা অসাধ্যসাধন  
করেছি?’ নিজের কৃতিত্বে স্তম্ভিত হয়ে পড়লো লোকটা।

‘প্রায় তাই,’ বললো রানা। ‘শুধু অভিজ্ঞ পোলার এক্সপ্লোরার-রা  
এ-ধরনের বরফের ওপর দিয়ে আসা-যাওয়া করেছেন, অস্তিত্ব রক্ষার  
জন্যে—আপনার মতো ঝামেলা এড়াবার জন্যে নয়।’

‘আর সব খবর কি বলুন,’ জানতে চাইলো জাপানী ফটোগ্রাফার।  
‘আপনাদের রেডিও আছে তো? ওদের,’ হাত তুলে লিবার্টি-থ্রু  
দিকটা দেখালো সে, ‘নেই।’

‘পোর্টেবল একটা আছে,’ বললো রানা, ‘শুনতে পারি, পাঠাতে  
পারি না।’

‘তাহলে কি ঘটছে আপনারা জানেন, তাই না?’

‘কোকুন নিজেই বরফে ঢুকে আমাদেরকে সংকেত দিতে বলছে।’

‘বাহ! চমৎকার!’ আনন্দে এক পাক নেচে নিলো কাইশু ওকোমো।  
‘তাহলে আর চিন্তা কি? এখন তাহলে গোসল করে শুকনো কাপড়  
পর। যেতে পারে, কি বলেন? ঘণ্টাখানেক ঘুমানো দরকার।’ ফ্রস্ট-  
শ্মোক থাকায় কিভাবে সংকেত দেয়া সম্ভব সে-চিন্তাটা তার মাথায়  
এলো না। লোকটার নিরুদ্ভিগ্ন থাকতে পারার ক্ষমতা দেখে একটু ঈর্ষাই  
বোধ করলো রানা।

এরিকা আর তার দল সম্পর্কে চিন্তা হচ্ছে ওর। পাঁচ ঘণ্টা হলো

গেছে ওরা। আরো আশ ঘন্টা অপেক্ষা করার পর নিজের স্কি-টা  
করলো ও। স্নেহ-চিহ্নিত পথ ধরে রওনা হবার পর একশো  
এগারনি, লুকআউট চিৎকার করে জানালো, ওরা আসছে। তখন  
একটা সাদা পাহাড়ে চড়লো রানা, সূর্যহীন সাদা ও ঠাণ্ডা  
কালো একটা রেখাকে সাপের মতো একেবেঁকে এগিয়ে  
দেখলো। খানিক পর রানাকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়লো এরিক।

খবর শুনে গম্ভীর হলো সে, বললো, 'বরফের মতিগতি খুবই খারাপ  
স্মার। লিবার্টি-ফাইভের কাছে অবস্থা ভয়ংকর। সমতল মাথা নিচে  
আইসবার্গটা ওদের আরো কাছে চলে এসেছে। কোন্টার কথা বলছি  
বুঝতে পারছেন তো? চাপ খেয়ে যেটার বরফ লাফ দিয়ে শূন্যে উঠতে  
দেখেছেন। ফেরার পথে জানিটা কি রকম ছিলো, এখন চিন্তা করতে  
ভয় করছে। আগাদের চারদিকে মোচড় খেতে শুরু করেছে বরফ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ফাটল তৈরি হওয়ার ঘটনাটা বর্ণনা করলো রানা।  
বেটা থেকে ফ্রস্ট-স্নোক বেরচ্ছে।

'তবে, আগের চেয়ে ঠাণ্ডা বেড়েছে,' বললো এরিকা। 'ফাটলের  
ভেতর সাগর সম্ভবত জমাট বেঁধে যাবে। তখন হয়তো কোকুনকে  
আমরা দেখতে পাবো, সংকেত পাঠানোও সম্ভব হবে।'

ক্যাম্প ফিরে তাঁবুতে ঢোকান আগে ছুপ করা মালপত্রের দিকে  
একবার তাকালো রানা। সারাদিন ধরে স্থানান্তর করার পরও আকারে  
সেটা তেমন ছোটো হয়নি। সম্ভবত চারভাগের এক ভাগ সরানো  
গেছে। নতুন শ্রোতা হিসেবে এরিকাকে পেয়ে আফ্রিক অর্থেই তাকে  
প্রায় সারাক্ষণ দখল করে রাখলো। কাইসু ওকোমো, ছপরের পুরোটা  
খাবার সময় তার পলায়ন কাহিনী শুনতে হলো সবাইকে, এরিকা  
বাদে বাকি সবাইকে চতুর্থবারের মতো। খাওয়া শেষ করে সিগারেট

ধরিয়েছে রানা, তীক্ষ্ণ চিংকার ভেসে এলো লুকআউটের।

ফ্রস্ট-স্মোক বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে স্বচ্ছ হালকা পর্দা ছাড়া দেখার মতো কিছু পেলো না ওরা। একটু পর তা-ও থাকলো না। সীমাহীন সাদা জগৎটা রঙ ফিরে পেলো আবার। দক্ষিণে সূর্যটা একবারে নিচের দিকে রয়েছে, আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে সোনালি কিরণ। গোটা দৃশ্য এতো কোমল আর চকচকে যে বিশ্বাসই করা যায় না হাত বাড়ালে স্পর্শ করা যাবে না। সবার চোখ অবশ্য স্থির হয়ে আছে লুকআউটের ওপর, বাজ্রগুলোর মাথায় দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে তাকিয়ে আছে সে। খানিক পর মাথা নাড়লো লোকটা। 'কোথায় কোকুন।' নিচে দাঁড়ানো রানার দিকে তাকালো সে। 'তবে আইসবার্গগুলো আরো কাছে সরে এসেছে, ক্যাপটেন।'

তার পাশে উঠলো রানা। চোখ কুঁচকে দু'জনেই তাকালো পশ্চিম দিকে। কিন্তু কিছুই দেখলো না, এমন কি এক বিন্দু ফ্রস্ট-স্মোকও নেই যে ফ্যাক্টরি শিপ বলে সন্দেহ করবে। এই সময় তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে রানাকে নেমে আসতে বললো স্টুয়ার্ট, চেহারা থমথম করছে। 'ক্যাপটেন, রেডিও শুনে যান। মেসেজ।'

তাঁবুতে ঢুকে রেডিওর সামনে ঝুঁকলো রানা।

'...মেসেজটা ইংরেজিতে পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। ধোঁয়া তৈরি বন্ধ করে দিয়েছি আমরা। তোমরা যদি সংকেত দেয়ার ব্যবস্থা করে থাকো, আয়োজনটা বাদ দাও। নিজেকে জিনিস-পত্র নষ্ট করো না আমরা এখানে সাময়িকভাবে আটকা পড়েছি, বরফ এদিকে অসম্ভব পুরু। ২২'৩০ ঘটায় আবার মেসেজ দেবো।'

রানার মুখে তরঙ্গমা শোনার পর স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। কয়েক সেকেন্ড একচুল নড়লো না কেউ। তারপর এক লোক বললো, 'কোকুন যাত্রা শুভ-২'

আটকা পড়া মানে পরিস্থিতি সাংঘাতিক খারাপ। মাথা একদিকে কাত করে কান পাতলো সে, প্রেশার রিজের গর্জন শুনছে। বাকি সবাইও কান পাতলো। ভাবটা যেন, হঠাৎ করে ওরা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে শমসই ওদেরকে মৃত্যুর আগাম বার্তা পৌঁছে দেবে।

এরপর কাইন্স ওকোমো নিস্তরতা ভাঙলো। ‘ঠিক বুঝলাম না। কোকুন কিভাবে আটকা পড়ে। প্রকাণ্ড একটা জাহাজ, বরফও তেমন কঠিন নয়। কালই তো আমরা ভেতর দিয়ে এসেছি। যতদূর জানি, বরফ পুরু হয় শুধু আইসবার্গের ক্ষেত্রে। ওগুলোকে এড়িয়ে, ওগুলোর ভেতর দিয়ে পথ করে নিলেই তো পারে। আপনি কি বলেন, ক্যাপটেন রানা? অস্ববিধেটা কি?’

‘আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন?’ চিন্তায় বাধা পড়ায় প্রায় খেঁকিয়ে উঠলো রানা। প্রাণ রক্ষার কোনো আশা দেখতে না পেয়ে মজাজ তিরিকি হয়ে আছে ওর।

সাড়ে দশটার কোকুনের অপারেটর ঘোষণা করলো, এখনো তারা আটকা পড়ে আছে, এখন থেকে আধ ঘণ্টা পরপর পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করবে। দু’জন লোককে পাহারায় রেখে বাকি সবাইকে শুয়ে পড়তে বললো রানা, তবে জানে ঘুম আজ রাতে কারো চোখেই আসবে না। রিপোর্ট প্রচারের সময় রেডিওর আওয়াজ বাড়িয়ে দিলো ও, বরফের শব্দ সত্ত্বেও যাতে দ্বিতীয় তাঁবুর লোকজন শুনতে পায়। প্রতিবার একই মেসেজ পুনরাবৃত্তি করা হলো—রিপোর্ট করার কিছু নই। তাঁবুর ভেতর অস্থিরতা টের পেলো রানা। শুধু রেডিওর দুঃসংবাদ নয়, পূর্ব থেকে ভেসে আসা বরফ নড়াচড়ার বজ্রপাততুল্য গর্জন বাড়ছে তো বাড়ছেই। পিঠের নিচে কাঁপছে বরফ, মাঝে-মাঝে এতো জারে যে ঠাণ্ডা মেঝেতে ঝাঁকি খেলো শরীর। ওরা যেন ভূমিকম্পের

মধ্যে বিশ্রাম নেয়ার চেষ্টা করছে। ক্রান্ত, তাই খানিক পরপরই চোখ ভেঙে ঘুম আসছে রানার, তারপর ঝাঁকি খেয়ে আতকে উঠে ছুটে যাচ্ছে তল্লা। শীত আতংক ছড়িয়ে দিলো শরীরে। ভোঁতা হয়ে আসছে অসুস্থতি, হাত-পায়ে অবশ ভাব। কখনো এক ঘণ্টা পর, কখনো আধ ঘণ্টা পর রেডিও অন করলো রানা। অপারেটরের গলাটা শুনতে পাওয়াও আশ্চর্য স্বস্তিকর। বাইরের দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ মিথ্যে একটা নিরাপত্তাবোধ এনে দিলো রানার মনে। লোকটার গলা অদ্ভুত রকম শান্ত আর স্বাভাবিক। বারবার মারিকার কথা মনে পড়লো রানার। ওর ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা থেকে অনেক আগেই উপলব্ধি করেছে ও, অত্যাচার বলো, শোষণ বলো আর দুর্ভাগ্য বলো, সরল ভালো মানুষরাই এ-সবের সহজ শিকার। রানার ব্যক্তিগত একটি দর্শন—যে-কোনো রকম দুর্বলতা অক্ষমণীয় অপরাধ। এমন কি দুর্বল নই, এই ভান করতে পারাটাও দুর্বোধ্য এই বিশ্ব-সংসারে এক ধরনের রক্ষাকবচ হিসেবে অবদান রাখতে পারে। মুশকিল হলো, মারিকার মতো মেয়েরা ভান করতেও জানে না। এদের প্রতি এমনকি প্রকৃতিও শ্রদয় নয়। সেজন্যেই মেয়েটার জন্যে চিন্তিত ও। আর কোনো দিন দেখা হবে কিনা কে জানে। কে বাঁচে, কে মরে, এখন আর জোর করে কিছু বলার উপায় নেই।

কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল ও, ঘুম ভাঙলো এরিকার ধাক্কায়। ‘রেডিওর কিছু একটা হয়েছে,’ ফিসফিস করে, রানার কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে বললো সে। ‘তিনটের বেশি বাজে, কিন্তু কিছু শুনছি না।’

উঠে এসে টিউনিং নব ঘোরালো রানা। অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা গেল, কিন্তু ওদের আর/টি ওয়েভলেংথ থেকে কিছুই বেরলো না, সুইচ বদলে পরবর্তী ওয়েভল্যাংথে ধরলো রানা, তীরবর্তী একটা স্টেশন থেকে যাত্রা অন্ত-২

মিউজিক ভেসে এলো। 'রেডিও ঠিকই আছে,' বললো ও। 'কি  
টিউনিং সব ষোয়াওনি তো?'

'না। তিনটের খানিক আগে আমি শুধু অন করেছি। কোনো  
পাইনি। আমার ধারণা,' এরিকার গলা সামান্য কঁপে গেল, 'ও  
আমি ব্রডকাস্ট করছে না।'

'তা হতে পারে না,' বললো রানা। 'ওরা জানে, ওদের ব্রডকাস্ট  
ব্যাকুল হয়ে শুনবো আমরা। দেখি সাড়ে তিনটের সময় কি হয়।'

হাতঘড়ি দেখলো রানা। তিনটে বেজে দশ। সিগারেট ধরিয়ে বসে  
থাকলো। প্রতিটি মিনিট যেন এক যুগ সময় নিয়ে পেরুচ্ছে। দূর থেকে  
ভেসে আসছে প্রেশার রিজের বিকট শব্দ, কাছ থেকে শোনা গেল  
পায়চারিরত টহলদারদের জুতোর আওয়াজ। রানার মনে নান  
অশুভ চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। অপারেটর এতো ব্যস্ত যে ব্রডকাস্ট  
করার সময় পায়নি? উহু, অসম্ভব! যদি বেঁচে থাকে, যদি রেডিও  
ভালো থাকে, মেসেজ পাঠাতে অবশ্যই তারা ভুল করবে না। তার-  
মানে কিছু একটা ঘটেছে। আবার হাতঘড়ি দেখলো রানা। তিনটে  
বেজে চোদ্দ মিনিট। এরিকার দিকে তাকালো ও। পাশ ফিরে শুয়ে  
আছে, নিঃশ্বাস ফেলছে নিয়মিত।

হঠাৎ রানার মনে পড়লো। প্রতি ঘন্টায় দু'বার, রেডিও সাইকেল-  
এর নির্দিষ্ট একটা মেয়াদ আছে, তিন মিনিট করে। প্রতি ঘন্টার  
পনেরো থেকে আঠারো মিনিট আর পঁয়তাল্লিশ থেকে আটচল্লিশ  
মিনিট, দুনিয়ার প্রতিটি জাহাজের প্রতিটি অপারেটর পাঁচশো কিলো-  
সাইকেল-এ 'ওয়াচ' ওয়েভ ধরবে ইমার্জেন্সি কল শোনার জন্যে।  
অধৈর্য হবার কোনো কারণ নেই, নিঃশব্দে বোঝাতে চেষ্টা করলো  
রানা। তাড়াতাড়ি সামনে বুকে সুইচ অন করলো রেডিওর, টিউন

করলো ওয়াচ ওয়েতে । সেকেন্ডের কাঁটা ঘোরা শেষ করলো । যান্ত্রিক শব্দ শুধু ভেসে এলো স্পীকার থেকে । বাস, আর কিছু না । পরম স্বস্তির একটা পরশ অনুভব করলো ও । শুধু শুধু ভয় পাচ্ছিলো বলে তিরস্কার করলো নিজেকে । ঠিক তখনই, এতো অস্পষ্ট যে শব্দগুলো আলাদাভাবে বোঝা যায় না, সেটা থেকে ঘড় ঘড় করে বেরিয়ে এলো অপারেটরের গলা ।

প্রায় শুয়ে পড়লো রানা, কান ঠেকালো রেডিওতে । কোকুনের নাম ছ'বার পুনরাবৃত্তি করা হলো । ছ'আঙুলে টিউনিং নব ধরে ঘোরালো ও । ওয়েভলেংথ পেতেই তাঁবুর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো অপারেটরের জোরালো গলা । '৬৬'২১ দক্ষিণ, ৩৪'০৬ পশ্চিমে রয়েছি আমরা । ফ্যাক্টরি শিপ কোকুন সমস্ত জাহাজকে ডাকছি । এস. ও. এস. ! এস. ও. এস. ! তোমরা কেউ আমাদের ডাক শুনতে পাচ্ছে ? বরফে অচল হয়ে পড়েছি আমরা, বরফ আমাদের গাঁথে ফেলেছে । আমাদের পজিশন—৬৬'২১ দক্ষিণ, ৩৪'০৬ পশ্চিম । ফ্যাক্টরি শিপ কোকুন সমস্ত জাহাজকে ডাকছি । এস. ও. এস. ! এস. ও. এস. ...'

এভাবে চললো, বিরতিহীন । অপারেটরের গলা সব সময় একই রকম, কোনো উত্থান-পতন নেই, নেই আবেগ বা অস্থিরতা । একঘেয়ে হলেও, রানার মগজে যেন হাতুড়ির বাড়ি মারতে লাগলো শব্দ-গুলো । কিছুই দেখছে না ও, বসে আছে পাথরের একটা মূর্তি, এমন-কি প্রচণ্ড শীতও ওকে স্পর্শ করতে পারছে না । অপারেটরের গলা ছাড়া আর কিছু শুনতেও পাচ্ছে না ।

তাঁবুর ভেতর ওর চারপাশে নড়াচড়া করছে লোকজন । আশ্বে করে ওর কাঁধে মাথা নামিয়ে অফুটে ফুঁপিয়ে উঠলো এরিকা । সে তার বাবার কথা ভাবছে । কেউ কথা বলছে না, না তাকিয়েও রানা জানে



ঘুম ভেঙে গেছে সবার। এরিকার পিঠে একটা হাত রাখলো ও, সাশুনা দেয়ার আর কোনো ভাষা ওর জানা নেই। কখনো নরওয়ের ভাষার কখনো ইংরেজিতে এস. ও. এস. প্রচার করলো অপারেটর। প্রতিবার একই মেসেজ। তারপর নতুন একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো ওরা। 'সাদার্ন উইণ্ড কোকুনকে ডাকছি। সাদার্ন উইণ্ড কোকুনকে ডাকছি। আমরা তোমাদের সাহায্যে রওনা হয়েছি। এই মুহূর্তে আমাদের পজিশন—৬৬° দক্ষিণ, ৪৪° পশ্চিম। ২০:০০ ঘটায় তোমাদের কাছে আমাদের পৌঁছানোর কথা। তোমাদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাও।' এরপর অপারেটর একটা আর/টি ওয়েভ-লেন্থ দিলো।

রেডিও টিউনিং করার পর ক্যাপটেন জোনাথ ভেনসমের গলা শুনতে পেলো রানা। সাদার্ন উইণ্ডকে বিস্তারিত রিপোর্ট দিলো সে। 'কাল ১৭:০০ ঘটায় এক জোড়া আইসবার্গের ভেতর দিয়ে চওড়া একটা পানিপথে ঢুকে পড়ি আমরা, যাচ্ছিলাম বরফে আটকা পড়া আমাদের তিনটে ক্যাচারের সাহায্যে। প্রায় ১৯:০০ ঘটায় পানিপথের শেষ সীমায় পৌঁছাই, তারপর বরফে ঢুকি—বরফ তখন আলগা প্যাক-এর আকারে ছিলো, তেমন পুরুও ছিলো না। ২১:৪৫ ঘটায় অত্যন্ত কঠিন আর পুরু প্যাকে আটকা পড়ি আমরা। এরপর চেষ্টা করি পিছানোর, কিন্তু যে-হুটো আইসবার্গকে ছাড়িয়ে এসেছিলাম সেগুলো প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে ইতিমধ্যে নিরেট করে তুলেছে প্যাক আইস, বন্ধ করে দিয়েছে আমাদের পিছু হটার পথ। দেখেওনে বুঝতে পারছি, এদিকে পূর্বঘেঁষা একটা শক্তিশালী স্রোত আছে, ফলে বরফের ওপর চড়াও হচ্ছে বরফ, স্রোতের সাথে সরে আসছে আইসবার্গগুলোও। তবে আরো পূর্বদিকে একটা ঝড় বরফগুলোকে পশ্চিম

দিকে ঠেলছে। আমরা এই দুই শক্তির মাঝখানে ধরা পড়েছি। প্যাক আইসে পৌঁছে তোমরা এক লাইনে অনেকগুলো আইসবার্গ দেখতে পাবে। এই লাইন ছাড়িয়ে এগোবার চেষ্টা করো না। আনি আবার বলছি, আইসবার্গের লাইন ছাড়িয়ে সামনে এগোবার কোনো চেষ্টা তোমরা করো না। কি ঘটে সব তোমাদের জানানো।’

‘সাদার্ন উইণ্ড কোকুনকে বলছি। সতর্ক করার জন্যে ধন্যবাদ। যতোটুকু সম্ভব সব আমরা করবো।’

‘এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য।’ ফিসফিস করলো এরিকা।

কি বলবে, চূপ করে থাকলো রানা। দুর্বল আর অসহায় লাগছে বিশেষ করে এই কারণে যে, একা নয় এ। একার বিপদ হলে বেপরোয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে লড়তো, ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে বিবেকের কামড় খাবার ভয় থাকতো না। সমস্যা হলো, ক্যাপটেন হিসেবে সবাই ওর কাছ থেকে নির্ভুল সিদ্ধান্ত আশা করছে, মুখে কিছু না বললেও। ওর নিছেরও একটা দায়িত্ববোধ অস্থির করে রেখেছে ওকে, লোকগুলোকে বাঁচার রাস্তা দেখাতে হলে।

হঠাৎ ওর চিন্তায় বাধা পড়লো কাইসু ওকোমো কথা বলে ওঠায়, ‘ক্যাপটেন।’ তাঁবুর অন্ধকার কোণ থেকে তার গলা কাঁপছে। ‘আপনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন, ঠিক কিনা? আমরা জানি, আগেও অ্যান্টার্কটিকায় আসার অভিজ্ঞতা আছে আপনার। বরফে আটকা পড়লে কিভাবে উদ্ধার পেতে হয় আপনার জানা আছে, ঠিক কিনা?’

জুয়া সবাই ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকালো, চোখে নগ্ন প্রত্যাশা।

মুহূ হাসলো রানা, অভয় দিয়ে বললো, ‘আমার অভিজ্ঞতা যদি যাত্রা অন্ত-২

কাছে লাগে, চিন্তার কিছু নেই—বহাল ভবিষ্যতে ফিরে যেতে পারবেন সবাই।’ কিন্তু মনে মনে জানে, ওর অভিজ্ঞতা খুব একটা বেশি কিছু নয়, সেটা কাছে লাগানোর সম্ভাবনা আরো কন। তবু মিথ্যা আশ্বাস দিতে পারায় নিজের ওপর খুশিই হলো ও। লক্ষ্য করলো, পেন্সী শিথিল হয়ে পড়ায় নড়েচড়ে বসলো জুরা, চোখে আশার আলো।

কিন্তু উদ্ধার পাবার সম্ভাবনা নিয়ে ভাবতে গিয়ে মুষড়ে পড়লো রানা। সম্মল বলতে ওদের একটা বোট আছে। উঁচু-নিচু বরফ প্রান্তরের ওপর দিয়ে বিশ কি তিরিশ মাইল ওটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া কিভাবে সম্ভব, খানিক পরপর যেখানে লুকানো গর্ত আছে ?

কাইসু ওকোমো সন্তুষ্টচিত্তে হাসলো। ‘বড় ভরসা পেলাম, ক্যাপ্টেন রানা। ভালো কিছু ফটো তুলেছি, ওগুলোর একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে তো। তাছাড়া, মেক্সিকোর যেতে হবে একটা ধনির ছবি তোলায় জন্যে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেরা দরকার আমার। সাধারণ একজন ফটোগ্রাফারের মতো কোথাও বেশিদিন অটকা থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি নামকরা ফটোগ্রাফার, অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, সবাই আমাকে দিয়ে ছবি তোলাতে চায়। তো ফেরার আয়োজন একটু তাড়াতাড়ি করলে হয় না, মিঃ রানা ? কোকুন যে আমাদের সাহায্য করতে আসছে না, তা তো জানাই গেছে। কি করা দরকার নির্দেশ দিন না জুদের...’

‘আপনি চুপ করুন তো।’ ধমক দিলো রানা।

রানার হাত ধরে মুহূ চাপ দিলো এরিকা। ওর মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছে সে।

রেফ্রিজারেটর শিপ ডলফিন আর ট্যাংকার পালাভিন ইথারে এলো। জাহাজ দুটোকে কোকুনের দিকে আসার নির্দেশ দেয়া হলো, তবে

দূরে অপেক্ষা করতে হবে, বরফে ঢোকা নিষেধ।

সারারাত ধরে রিপোর্ট প্রচার করলো কোকুন, নিজের জাহাজ বহর আর সাদার্ন উইণ্ডের উদ্দেশ্যে। নতুন কোনো খবর নেই। তারপর সকাল ছ'টার দিকে জানানো হলো, ফ্যান্টরি শিপকে ঘুরিয়ে নেয়ার জন্যে যথেষ্ট চওড়া একটা ফাঁক ডিনায়াইট ফাঁটিয়ে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। তাঁবুর ভেতর আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। সবাই আবার আশার আলো দেখতে পেলো, উদ্ধার পাবার উপায় একটা হতে পারে। সাগরের দিকে মুখ করতে পারলে, বরফ ভেঙে বেরিয়ে আসা কোকুনের পক্ষে সম্ভব। ব্রেকফাস্টের সময় হাসিখুশি দেখালো সবাইকে। কিন্তু সাড়ে আটটার খানিক পর নতুন খবর শুনে ওদের শেষ আশাটাও ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। এতোক্ষণে প্যাক আইসের ওপর হামলা শুরু করেছে আইসবার্গগুলো, প্যাক আইসে বিশাল সব প্রেশার রিক তৈরি হচ্ছে। বেকুবির রাস্তা বন্ধ। চোখ-ধাঁধানো সাদা উজ্জল-তার কোকুনকে ওরা দেখতে না পেলোও, আইসবার্গগুলো দেখা গেল। বাজের ওপর দাঁড়ানোরও দরকার হলো না। অনেক কাছে সরে এসেছে গুলো, তাঁবুর ভেতর থেকেই দেখা যাচ্ছে।

ন'টার খানিক পর রেডিওতে স্বয়ং কর্নেল ওয়াকার রোসেট এলেন। ডলফিনকে নির্দেশ দিলেন তিনি। ফুয়েল নিয়ে সব ক'টা ক্যাচার আর টোইং ভেসেলকে সাউথ জর্জিয়ায় ফিরে যেতে হবে, নেতৃত্ব দেবে ডলফিন। পরিস্থিতির গুরুত্ব এবার হাড়ে হাড়ে টের পেলো ওরা। এ-ধরনের নির্দেশ থেকে পরিকার হয়ে যায়, ফ্যান্টরি শিপ কোকুনের অফিসাররা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, চলতি মৌসুমে তিমি শিকারের কোনো সুযোগ নেই।

এরপর একের পর এক শুধু দুঃসংবাদ আসতে লাগলো। দশটার যাত্রা অন্তত-২

দিকে কোকুন রিপোর্ট করলো, বরফের চাপে ছাত্তাভের ক্ষতি হয়েছে, তবে পাম্পগুলো এখনো সঠিকভাবে রাখতে পারছে পানিকে। কিন্তু এক ঘণ্টা পর ফ্যাক্টরি শিপের গোটা স্টারবোর্ড সাইড বরফের অনিবার্য আঘাতে ভুবে গেল। সাড়ে এগারোটার সময় ছাত্তাভের কয়েক আরগায় ফাটল দেখা দিলো, রসদ আর ইকুইপমেন্ট নামাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো ক্রু। পাম্পের সাহায্যে বরফে তেল ফেলা শুরু হয়েছে, পরে আগুন ধরিয়ে পোড়ানো হবে, গাইডিং বীকন হিসেবে।

এতোক্ষণে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো রানা। এরিকাকে একপাশে ডেকে নিলো ও, বললো, 'আর দেরি করা যায় না। বরফের পাহাড়ে বাকি মালপত্র সরানো দরকার। আইসবার্গ আর প্যাক আইনের মাঝখানে পড়লে সব হারাতে হতে পারে।'

রানার সাথে একমত হলো এরিকা। রানার নির্দেশ শুনে মুখে কেউ কিছু না বললেও, ক্রুদের চোখেমুখে অনিচ্ছা আর আপত্তি লক্ষ্য করলো ওরা। কোকুনের হুঃসংবাদ শুনে শুনে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে লোকগুলো।

একটা দল গঠন করা হলো, নেতৃত্ব দেবে রানা। স্নেজে মালপত্র তোলার সময় পূর্ব দিকের আকাশ বদলে গেল। ঝাপসা আলোর বদলে ফুটে উঠলো সাদা উজ্জ্বলতা। সূর্যের চারদিকে ঘুরপাক খেতে শুরু করলো কালো মেঘ, দ্রুত ঘন হতে থাকলো। ওদের চারপাশে জগৎটা কালো, সাদা আর ঠাণ্ডা। তারপর মুহূর্তে শুরু হলো তুষারপাত। তুষারের সাথে এলো বাতাস। প্রথমদিকে ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসের মতো লাগলো গায়ে। খানিক পরই দমকা বাতালে ছিটকে পড়ার অবস্থা দাঁড়ালো। তিন মিনিট পর স্থির হয়ে গেল বাতাস। তুষারপাত বাড়লো, সাদা পর্দার মতো, ভেতর দিয়ে দৃষ্টি চলে না। তারপর

শুরু হলো ঝড়। জিনিস-পত্র কোনো রকমে সামলে হামাগুড়ি দিয়ে  
তীব্রতায় ঢুকতে বাধ্য হলো ওরা।

রোদ ঝলমলে সকালটা ঘনঘোর কালো আর সগর্জন কেয়ামতের  
রূপ নিলো। তারপুলিনের প্রান্তগুলোয় নতুন করে গজাল গেঁথে রশি  
বাঁধতে হলো। তাঁবুর বাইরে বাতাসের কাতর গোঙানি স্নায়ুর ওপর  
নিখাতন হয়ে দাঁড়ালো। বরফের ছগৎটাকে ঢেকে ফেলেছে কালো  
হায়া আর সাদা তুষার। কক্ষলের নিচে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকা  
ছাড়া কারো কিছু করার থাকলো না। চূপচাপ বসে সিগারেট ফুঁকে  
সময় কাটছে। ভুলেও কেউ মুখ খুলছে না। একমাত্র গলা পাওয়া  
যাচ্ছে কোকুন থেকে অপারেটরের। ঝড় শুরু হওয়ায় তারা তাদের  
রসদ নামাতে পারছে না, আন্ডাজ করতে পারছে না বিপদের মাত্রা।

বুঝতে অসুবিধে হয় না, উপস্থিত সবাই অবধারিত একমাত্র পরিণতি  
উপলব্ধি করতে পারছে। তাঁবুর ভেতর অন্ধকার যেন মৃত্যুরই প্রতি-  
নিধিষ্ণু করছে; বন্ধ চোখ খুললেই হুঁয়ৎ করে ওঠে বুক। এতোকিছুর  
পরও বিস্ময়ের বড় আঘাতটা বাকি ছিলো। দুটো বেজে সতেরো  
মিনিট তখন। সাদার্ন উইণ্ডের সাথে কথা বলছে ক্যাপটেন জোনাস  
ভেনসম। সাদার্ন উইণ্ড ইতোমধ্যে পালাডিন ও বাকি ক্যাচারগুলোকে  
চাক্ষুস করেছে। কথা বলার সময় কেঁপে গেল ভেনসমের গলা,  
'ক্যাক্টরি শিপ কয়েক জায়গায় ভেঙে গেছে। পাম্পের সাহায্যে পানি  
ফেলে কুলানো যাচ্ছে না। কোকুন ডুবছে। জাহাজ ত্যাগ করার নির্দেশ  
দিয়েছি আমি সবাইকে।'

১৫.৫৩ ঘটায় কোকুনের অপারেটর ঘোষণা করলো, 'ক্রুরা সবাই  
নিরাপদে বরফে নেমেছে। সাথে পরিমাণ মতো রসদ। অত্যন্ত নিচু  
হয়ে গেছে ক্যাক্টরি শিপ। ঝড়ের কারণে আমাদের ক্যাম্প মোটেও  
যাত্রা অন্তত-২

নিরাপদ নয়, বরফের নাড়চড়া হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সরাসরি আইস-বার্গগুলোর পথে রয়েছে আমরা, ঝড়ের পশ্চিম ঘেঁষা দাক্ষিণ্যে যদি শিগ-গির নিস্তেজ না হয় আমাদের পজিশন বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। ক্যাপ-টেন ভেনসম জাহাজ ত্যাগ করছেন, আমিও রেডিও ইকুইপমেন্ট বরফে নামাবার প্রস্তুতি নিচ্ছি। বরফে ইকুইপমেন্ট অ্যাডজাস্ট করার সাথে সাথে আবার মেসেজ পাঠাবো।’

ক্যাপ্টারি শিপ কোকুন থেকে পাওয়া ওটাই সর্বশেষ মেসেজ। তাঁবুর ভেতর আধো-অন্ধকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকলো ওরা, রেডিওর যান্ত্রিক গুঞ্জন ঝড়ের শব্দকে ছাপিয়ে অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে। কিছু কোকুনের বেঁচে যাওয়া জু না অফিসারদের কাছ থেকে আর কোনো মেসেজ এলো না।

সন্ধ্যা ছ’টার দিকে সাদা উইণ্ড কোকুনকে ডাকতে শুরু করলো। অপারেটরের একঘেয়ে সুর পীড়াদায়ক হয়ে উঠলো স্নায়ুর ওপর। পাঁচ মিনিট ধরে ডাকলো, এক মিনিট বিরতি দিয়ে আবার শুরু করলো। কোকুনের কোনো সাড়া নেই। যেন মৃত একটা আত্মাকে অকারণে ডাকা হচ্ছে। তাঁবুর ভেতর কেউ কারো দিকে তাকাতেও ভয় পাচ্ছে, পাছে মনের ভাব অন্য টের পেয়ে যায়। কি ঘটতে পারে, কল্পনা করার চেষ্টা করছে সবাই। তারপর ঝড়ের গতিবেগ আর গর্জন বেড়ে যাওয়ায় চিন্তাতেও বাধা পড়লো। তাঁবুর ভেতর এতোগুলো লোক, তবু সবাই আতংকজনকভাবে একা, উদ্ধার পাবার কোনো আশা নেই কারো, সবাই নিজেদের ক্ষুদ্র ও অসহায় উপলব্ধি করতে পারছে।

## চার

ঝড়ের কবলে পড়া একটা ভাসমান বরফে ঘুম ভাঙা, তারপর উপলব্ধি করা যে চোদ্দজন লোক আর একটা মেয়ের জীবনরক্ষার দায়িত্ব রয়েছে তোমার কাঁধে, মোটেও সুখকর কোনো অভিজ্ঞতা নয়। রানা শুধু জানে, লোকগুলোকে বাঁচাতে হবে ওর, কিন্তু আচ্ছন্ন একটা ভাব এমনভাবে গ্রাস করে রেখেছে ওকে যে ঘটে-যাওয়া সর্বনাশটার প্রকৃত তাৎপর্য এই মুহূর্তে উপলব্ধি করতে পারলো না ও। তাঁবুর কালো তুষার ভেতর নিঃসাড় পড়ে থাকলো, কান পেতে ঝড়ের দাতম তনছে, পিঠের নিচে কাঁপন অনুভব করে হিসেব পাবার চেষ্টা করছে মূল চাপ-কেন্দ্র থেকে কতোটা দূরে রয়েছে ওরা। এই সময় ধীরে ধীরে বিপদ সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করলো মন। কোকুন নেই। বাইরে থেকে সাহায্য পাবার নেই কোনো আশা। প্যাক আইস ভেঙে এগিয়ে আসছে এক লাইনে অনেকগুলো আইসবার্গ, ওদেরই দিকে। ভাগ্য ভালো যে রাতে ওদের ভাসমান বরফের মাঠটা ভেঙে যায়নি। হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে ঝড় আর তুষারঝঞ্ঝার ভেতর দাঁড়ালো রানা। কালো ঝড়ের গায়ে পাহারাদার দু'জনকে সাদা যাত্রা অন্ত-২



ভূতের মতো দেখালো ।

ওদের একজনের সাহায্য নিয়ে গরম চা বানালো রানা, জুদের পরিবেশন করলো নিজের হাতে । তাদের মধ্যে থেকে কথা বললো মাত্র একজন, ওয়েজনার । ‘এই হোটেলে চা-ও পাওয়া যায় আমার জানা ছিলো না । দাম নিশ্চয়ই খুব বেশি ?’

‘চা ফ্রি,’ বললো রানা । ‘সেই সাথে ঝড়-তুফান ।’

‘চায়ের জন্যে ধন্যবাদ, ক্যাপটেন । শুধু চায়ের জন্যে ।’

কম্বলের ভেতর নড়ে উঠলো ডঃ নিক শেডি । ‘আবহাওয়ার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবে না ?’

‘না, ভাই, তিনি পরম করুণাময়, তাকে ব্যঙ্গ করতে পারি না । বরং হাঁটু গেড়ে আসুন আমরা সবাই তাঁর কাছে পথনির্দেশ ভিক্ষা চাই ।’

‘আমি তার ইয়ে করি ।’ খেঁকিয়ে উঠলো নিক শেডি, দুর্ভাগার জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করে মাথা নিচু করলো রানা ।

একা শুধু নিক শেডির নয়, মেজাজ সবারই তিরিঙ্কি হয়ে আছে, আর সময়ও কাটছে গা-ঝালানো টিমে তালে । ব্রিজ খেলার উপযুক্ত আলো নেই তাঁবুর ভেতর । নোটবুকটা পকেট থেকে বের করে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে আগুন জ্বাললো রানা, একটা পাতায় লিখতে শুরু করলো ।

‘১২-ই ফেব্রুয়ারী । কোকুনকে কাল পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে । বেঁচে যাওয়া জুদের কাছ থেকে এখনো কোনো মেসেজ আসেনি । বাইরে ঝড় বইছে, তবে তাঁবুর ভেতর আমরা সবাই নিরাপদেই আছি । উদ্ধার পাবার কোনো আশা দেখছি না । জুরা সাহস আর উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে । বরফের নড়াচড়া ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে । ঝড় থামার সাথে সাথে কাছাকাছি একটা উঁচু বরফে সরে যাবার ইচ্ছে আছে ।’

তারপর রানা ক্রুদের নাম লিখলো, কাইসু ওকোমোর নামটাও বাদ পড়লো না। সংঘর্ষে নিহত লোক দু'জনও তালিকায় থাকলো।

আধবোজা চোখে বসে আছে রানা, ভাবছে তার লেখা এই লগ শেষ পর্যন্ত কারো পড়ার স্বেযোগ হবে কিনা। তারপর ভাবলো, সংঘর্ষের কারণটাও উল্লেখ করা দরকার। এই সময় ওর নিচে প্রচণ্ড জোরে কঁপে উঠলো বরফ। বাইরে থেকে একটা চিৎকার ভেসে এলো, সেই সাথে পিস্তল বিফোরশের মতো শব্দ। তাঁবু ছলতে শুরু করলো। কিছু ধরার জন্যে হাত লম্বা করলো রানা, কাত হয়ে পড়ে গেল। তাঁবুর ভেতর মেঝের কোনো অস্তিত্ব নেই। আধো অন্ধকারে গভীর একটা ফাটল ওদের নিচে ফাঁক হতে শুরু করেছে। তাঁবুর ক্যানভাস ছিঁড়ছে ফড়ফড় শব্দে। তাঁবুর খোলা দিকে লাফ দিলো রানা, এরিকার একটা রাইফেল আঁকড়ে ধরে আছে। আতঁচিৎকার বেরিয়ে এলো কাইসু ওকোমোর গলা চিরে। অঘোরে ঘুমাচ্ছে নিক শেডি, তবে কেউ একজন তার পা আঁকড়ে ধরেছে। মুলার, ডেকবয়, ফাটলের ভেতর; কিনারা খামচে ধরে চিৎকার করছে, গোটা শরীর কন্ডলে জড়ানো। ইঁচকা ফল দিয়ে তাকে তুলে নিলো ওয়েজনার। নিজেদের পায়ে ইতোমধ্যে সবাই দাঁড়াতে পারলেও, আসল কাজটা এখনো বাকি—তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাওয়া। বাইরে থেকে লোকেরা ক্যানভাস টেনে ওদেরকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে।

ক্যানভাস মুক্ত হয়ে তাকাতেই যা দেখলো রানা, আত্মা খাঁচাছাড়া হবার দশা। বরফের মাঠ ঠিক মাঝখানে দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যই বলতে হবে, ফাটলটা দ্বিতীয় তাঁবু আর রসদগুলোর নাগাল পায়নি। তবে ওদের ঘুমোবার আশ্রয়টাকে নিখুঁতভাবে দু'ভাগ করে দিয়েছে। ওদের প্রত্যেকের গায়ের তাপ বরফের গায়ে ছাঁচ তৈরি করেছে, ফাট-

লের অপর পাড়ে ওদের মাথা আর কাঁধের আকৃতি পরিকার চেনা  
 গেল, এ-পাড়ে রয়েছে নিতম্ব আর পায়ের দাগ। যদি রাতে ঘুমের  
 মধ্যে ফাটলটা তৈরি হতো, বাঁচতো না একজনও। রানা তাকিয়ে  
 আছে, কুৎসিত চড় মারার শব্দ নিয়ে জোড়া লেগে গেল সেটা। বেশ  
 কয়েকবার একই ঘটনা ঘটলো—কাঁকটা বড় হয়, চার কি পাঁচ ফুট  
 চওড়া, তারপর আবার সশব্দে জোড়া লাগে। অবশেষে জোড়া লম্বা  
 অবস্থায় থাকলো, ভাঙাচোরা কিনারা থেকে কাঁচ ওঁড়োনোর শব্দ  
 হচ্ছে।

সব্রে যাওয়া দরকার, কিন্তু আবহাওয়ার কারণে তা সম্ভব নয়। বুঁকি  
 নিয়ে রওনা হয়তো হওয়া যায়, কিন্তু কোথাও পৌঁছানোর কোনো  
 নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া স্নেহ চিহ্নিত পথে কি ঘটছে তাও জানা  
 নেই ওদের। প্রচণ্ড ঝড় মাথায় করে তাঁবুটা কোনো রকমে আবার  
 খাড়া করা হলো, হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকলো ওরা। এতদক্ষণে  
 খেরাল করলো রানা, রেডিওটা নেই। বাইরে এসে চারদিকে খুঁজলো  
 ও, অনেকেই ওর পিছু পিছু বেরিয়ে এলো। তুবারের ভেতর, যে-সব  
 জায়গা উচু হয়ে আছে, নেড়েচেড়ে দেখা হলো। এই সময় মূল্য  
 জানালো, রেডিওটাকে ফাটলের মধ্যে পড়তে দেখেছে সে।

মুখ কালো করে তাঁবুতে ফিরে এলো রানা। এই পরিস্থিতিতে  
 রেডিও হারানোর তাৎপর্য ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, শুধু উপলব্ধি  
 করা যায়। বাইরের ছনিয়ার সাথে সর্বশেষ যোগাযোগ হারিয়ে  
 ফেলেছে ওরা। শুধু জুঁতা নয়, এই প্রথম যেন পরিস্থিতির বাস্তবতা  
 রানাও টের পেলো। উদ্ধার করার কি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে এই খবর  
 এতদক্ষণ নির্ভর প্রাণে শক্তি আর প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে।  
 এখন থেকে ওরা জানবে না উদ্ধারকারী জাহাজগুলো কি করছে,

ওদের দিকে আসছে নাকি ওদের উল্টোদিকে যাচ্ছে। তবে একটা ব্যাপার জানে ওরা। উদ্ধার পাবার ওদের আবেদন, স্ট্রিক্টলি শিপ কোকুন ছুঁটনা ঘটিয়ে বসায়, গুরুত্ব হারিয়েছে। খোলা বরফে এদিকে কোথাও চারশো লোক মৃত্যুর সাথে যুঝছে, প্রথমে তাদেরকে উদ্ধার করার কথা ভাবা হবে।

বারো তারিখ সারাটা দিন তুষার ঝড় বইলো। ঠাণ্ডার অবশ্য হয়ে গেল শরীরগুলো, টিনে ভরা মুড়ির মতো গা ঘেঁষাঘেঁষি করে কম্বলের ভেতর বসে ঠকঠক করে কাঁপলো ওরা, হৃদয় জুড়ে আতঙ্ক নিয়ে অপেক্ষা করলো আবার না-জানি কখন ফাটল ধরে বরফে। কেউ তেমন কথা বললো না, ভুলে যাওয়া তাসগুলো পড়ে থাকলো এক কোণে, যদিও ইতোমধ্যে দেখতে পাবার মতো আলো ফিরে এসেছে। পাহারার মেয়াদ আধ ঘণ্টায় কমিয়ে আনলো রানা। শীত যেন জ্যাস্ত হিংস্র প্রাণী, বাইরে আধ ঘণ্টা টেকাও প্রায় অসম্ভব। একবার এক লোক একটা শব্দ শুনে দেখতে গেল বরফে ফাটল ধরছে কিনা। তাকে ফিরতে না দেখে সবাই ওরা গলা ছেড়ে ডাকাডাকি শুরু করলো, হুঁসেল বাজালো একটানা। পোনে এক ঘণ্টা পর ফিরে এলো লোকটা আধমরা হয়ে। মাত্র কয়েক গজ এগোলে তুষারের আড়ালে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায় তাঁবু, নেহাতই ভাগ্যের জোরে লোকটা ফিরে আসতে পেরেছে। এরপর রানা নির্দেশ দিলো, পাহারাদাররা পরস্পরের দৃষ্টি-সীমার ভেতর থাকবে, তাঁবুর কাছাকাছি।

পরদিন সকাল পাঁচটায় তুষারপাত বন্ধ হলো। তবে বাতাস আগের মতোই বইছে। দৃষ্টি মুক্ত হওয়ায় দৃশ্যটা সত্যি আতঙ্ককর লাগলো রানার। আইসবার্গগুলো এখন আর ছ'মাইল দূরেও নয়, ওদের ওপর চড়াও হবার জন্যে সরাসরি এদিকেই এগিয়ে আসছে, সামনে ভেসে যাত্রা অন্ত-২

থাকা নিরেট বরকের মাঠগুলোকে এক সার বুলডোজারের সঙ্গে  
 ভাঙতে ভাঙতে। সেখানে মালপত্তর তোলায় নির্দেশ দিলো রানা  
 বিকিটের টিন ভেঙে, টিনগুলো বোটের নো-তে পেরেক গেঁথে রাখা  
 হলো, বরকের চোখা কিনারা লেগে বোটের কাঠ যাতে ভেঙে না যায়  
 আগের সিন্ধিতে এখনো অটল রানা, নোটটা ওরা সাথে রাখলেই  
 ওটাই তাদের বাঁচার একমাত্র আশা।

প্রকৃতি চলছে, এরিকাকে নিয়ে স্বেচ্ছ-চিহ্নিত পথটা পদাঙ্ক করে  
 জনো বেরিয়ে পড়লো রানা। তুমার এরই মধ্যে শত্রু হয়ে গেছে, হি  
 চালাতে কোনো অসুবিধে হলো না। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে  
 বরকের উচ্চ পাহাড়ে পৌঁছে গেল ওরা, অথচ আগের দিন রানা আর  
 হোলস্টাডের সময় লেগেছিল এক ঘণ্টারও বেশি। তবে স্থির ভরসা  
 বরকের পথটা আদর্শ হলেও, পায়ে হেঁটে আসার সময় লোকজনের  
 কি অবস্থা হবে বলা কঠিন। তুমারে ঢাকা পড়েছে সমস্ত ফাটল আর  
 গর্ত, বোটের ভারে গর্তের ওপরকার তুমার যদি ধসে পড়ে তাহলেই  
 সর্বনাশ।

কিরে এসে ওরা দেখলো স্টুয়ার্ড ব্রেকফাস্ট নিয়ে অপেক্ষা করছে।  
 দশটার খানিক পর রওনা হবার জন্যে তৈরি হলো ওরা। হঠাৎ বাত  
 হয়ে উঠলো কাইসু ওকোমো। 'ছবি আমাকে তুলতেই হবে! দিল্লি  
 ক্যাম্প, ফাটল, আইসবার্গ, কোনোটাই বাদ দেয়ার নয়। ফেরার পর  
 লোকে এ-সব ছবি দেখে বিখ্যাত ফটোগ্রাফার কাইসু ওকোমোর প্রশংসা  
 সারি পক্ষমুখ হবে। বলবে, কাইসু ওকোমো আবার বাজ্রিয়াত করেছে।'  
 এরপর ওদের ফেলে যাওয়া রসদের পাশে সবাইকে দাঁড় করিয়ে এ.প.  
 ফটো তুললো সে। 'আপনারা সবাই প্রকৃতির অকুতোভয় সন্তান!  
 সাহসী মানুষ চিরকাল আপনাদের প্রশংসা করবে।' ছবি তোলা শেষ

হাতেই রানার একটা বাছ খামচে ধরে লিবার্টি-থ্রু দিকে অপর হাতটা তুললো নিক শেডি। ভাঙাচোরা বরফের ওপর দিয়ে সচল সাপের মতো আকাবাঁকা একটা রেখা তৈরি করেছে তারা, সামনের একজন চেষ্টা করে উঠতেই এদিক থেকে সবাই একযোগে হৈ-চৈ ছুড়ে দিলো, মাথার ওপর তুলে হাত নাড়লো ঘন ঘন। গুললো রানা—সতেরোটা কালো বিন্দু। বোকা জুরা ধরে নিয়েছে কোকন থেকে উদ্ধারকারী দল আসছে। তাদের দিকে ফিরে চূপ করার নির্দেশ দিলো রানা। ‘লিবার্টি থ্রু জু ওরা।’ সাথে সাথে হৈ-চৈ আর হাত নাড়া থেমে গেল। তাদের চোখের জমি থেকে আশার আলো মরে যেতে দেখলো রানা। ডেকবয় মুলার কাদতে শুরু করলো। তার ফোঁপানোর শুকনো আওয়াজ শুনে কান্না চাপার জন্যে অনেককেই মুখ ঘুরিয়ে নিতে দেখা গেল। এগিয়ে গিয়ে তাকে বুকে টেনে নিলো এরিকা। দলে এই একটাই বাচ্চা ছেলে, যদিও আর সবার মনের অবস্থারও প্রতিনিধিত্ব করছে তার এই কান্না। ঠাণ্ডায় যেন জমাট বেঁধে গেছে গোটা দল, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সচল রেখাটার দিকে।

ঠেকার কাজ চালানোর জন্যে কয়েকটা স্নেজ তৈরি করেছে তারা, সবগুলোয় রসদ ইত্যাদি ভূপ হয়ে আছে। চোখে বিনো কিউলার তুলে দলটাকে খুঁটিয়ে দেখলো রানা। গরিলাসদৃশ্য আকৃতি চোখ এড়াতে পারে না, নেতৃত্ব দিয়েছে হেলমুটসেন। মাত্র একজন লোকের সাহায্য নিয়ে একাই একটা স্নেজ টেনে আনছে সে। লিবার্টি-থ্রুতে অল্প সময় ছিলো রানা, তবু প্রায় সবাইকেই চিনতে পারলো। ওদের সাথে কোনো বোট নেই দেখে মনে মনে হতাশ হলো ও। একটা মুখ খুঁজেও পেলো না। একটা টোইং ভেসেলে লোক থাকে যোলোজন জু আর দু'জন ডেকবয়। সব মিলিয়ে রয়েছে মাত্র সতেরো জন, নবাগতদের যাত্রা অন্তত-২

মধ্যে মার্ক রোসেট নেই।

ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়লো দলটা, সামনে এগিয়ে এলো একা হেলমুটসেন। তার চোখ রানার দৃষ্টিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলো। 'লোকজন চাইছে,' কৰ্কশ সুরে বললো সে, 'আপনি তাদেরকে নেতৃত্ব দেন, ক্যাপটেন মাসুদ রানা।'

স্টোভ খেলে স্টুয়ার্ডকে ওদের জন্যে গরম খাবার তৈরি করার নির্দেশ দিলো রানা। তারপর হেলমুটসেনের দিকে ফিরলো। 'মার্ক কোথায়?'

'রসদের সাথে রয়ে গেছেন তিনি,' জবাব দিলো লোকটা, চেহারায় অবস্থি নিয়ে ঘন ঘন এক পা থেকে আরেক পায়ে ভর দিচ্ছে।

'কেন?' হেলমুটসেন উত্তর না দেয়ায় আবার জিজ্ঞেস করলো রানা, 'কেন তাকে ফেলে এলে তোমরা?'

'লোকজন তাই চেয়েছে,' অবশেষে বললো হেলমুটসেন, রাগের সাথে।

'লোকজন চাইলো তাদের ক্যাপটেনকে ত্যাগ করতে?'

'হ্যাঁ। তিনিও ওদের সাথে আসতে রাজি হননি। ডানকান আর আমাদেরও তিনি থাকতে বলেছিলেন।'

'থাকোনি কেন?'

'কারণ জুরা কেউ তাঁর সাথে থাকতে রাজি হয়নি।'

'আর লোকেদের কথা শুনে তুমি তাকে একা বরফে মরার জন্যে ফেলে এলে?'

থমথমে চেহারা নিয়ে হেলমুটসেন বললো, 'তিনি আসতে না চাইলে আমরা কি করবো।'

'তুমি ফাস্ট'মেট, তাই না?'

‘হ্যাঁ ।’

‘জুদের নেতৃত্ব এখন তুমি দিচ্ছে ?’

মাথা ঝাকালো হেলগুটসেন ।

‘কেন ?’

‘কারণ ক্যাপটেন মার্ক রোসেটের কোনো আদেশ জুঁরা মানতে চায়নি । তারা বলছে, ক্যাপটেনের উদ্দেশ্য খারাপ ছিলো, ওটা কোনো ছর্ঘটনা ছিলো না । জুঁরা তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে । ওরা সবাই টনসবার্গের লোক ।’

‘তুমিও কি মনে করো, মার্ক জেনেশুনে আমার বোটকে ধাক্কা দিয়েছিল ?’

‘না । তা! তিনি করবেন না । এই বিশৃঙ্খলক বরফের জগতে... উহু, না । কোনো হোয়েলারের পক্ষে এ-কাজ সম্ভব নয় । এরিকা পিটারসেন যা বলেছে তা অবশ্য সত্যি, ক্যাপটেন হেলমসম্যানকে নিচে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু পাঠিয়েছিলেন আসলে কোক। আনার জন্যে । এ-ও সত্যি যে আমাদের রেডিওর নষ্ট থাকটা রহস্যময় । এ-সব ব্যাপার কোকুনে ফেরার পর তদন্ত করা হবে । তবে আমি মনে করি না... ।’

‘কোকুন নেই,’ তাকে বাধা দিলো রানা ।

‘নেই ? বুঝলাম না ।’

‘এদিকে আসতে গিয়ে বরফে আটকা পড়ে, তারপর ডুবে যায় ।’ ইতোমধ্যে নবাগতরা এগিয়ে এসে ওদের দু’জনকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, হাঁ করে শুনছে রানার কথা । ভয়ে সবার মুখ বুলে পড়লো । ‘এরিকা,’ বললো রানা । ‘সবাইকে কাজে লাগিয়ে দাও । আমি চাই সবগুলো স্লেজ একসাথে বাঁধা হোক, একটার পিছনে আরেকটা ।’ আবার হেল-  
যাত্রা অশুভ-২



মুটসেনের দিকে ফিরলো ও। ‘কখন তুমি নেতৃত্ব হাতে নাও?’

‘যখন বুঝি যে ক্যাপটেন মার্কের কথা জুরা সত্যে না।’

‘তাহলে মার্ককে একা ফেলে আসার সিদ্ধান্তটা তোমার?’

‘না, আমার সিদ্ধান্ত কেন হবে? লোকেরা তাই চেয়েছে, ক্যাপটেনও আসতে চাননি।’

‘কিন্তু তুমি না বললে নেতৃত্ব তোমার হাতে ছিলো।’

ইতস্তত করে হেলমুটসেন বললো, ‘ছিলো...।’ অন্য দিকে তাকালো সে।

‘তোমার সেকেন্ড মেট কে?’ জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘ডানকান।’ ইঙ্গিতে খাটো, শক্ত-সমর্থ এক লোককে দেখালো দানবাকৃতি হেলমুটসেন।

তাকে কাছে ডেকে রানা জিজ্ঞেস করলো, ‘ইংরেজি বলতে পারো?’

‘ইয়েস, স্যার, মিঃ রানা, ক্যাপটেন।’

‘মার্ককে তোমরা একা ফেলে এলে কেন?’

‘জুরা দাবি করলো যে...।’

‘গুলি মারো জুদের!’ গলা চড়িয়ে ধমক দিলো রানা। ‘নেতৃত্বে ছিলে তোমরা অথচ কাজ করেছো জুদের মজি মতো। তোমাদের হুঁজুনকেই কমাও থেকে সরিয়ে দেয়া হলো, এখন থেকে তোমরা সাধারণ নাসিক হিসেবে গণ্য হবে।’

রানার দিকে এক পা এগোলো হেলমুটসেন, যেন সচল একটা পাহাড়। ‘এ আপনি করতে পারেন না।’

‘পারি এবং করছি,’ বললো রানা। ‘তোমরা কেউই কমাও করার যোগ্য নও।’

হেলমুটসেনের চোখ দুটো ছলছে। ‘আপনি জানেন না কাকে কি

বলছেন। আপনার স্পর্ধা দেখে আমার মাথায় রক্ত চড়ে যাচ্ছে। আট-  
বার অ্যান্টার্কটিকায় এসেছে,' নিজের বুকে আঙুল ঠুকলো সে, 'এই  
হেলমুটসেন। কোন্ পরিস্থিতিতে কি করতে হয় আপনার চেয়ে  
অনেক ভালো জানা আছে আমার।'

'জানা আছে বলছো?' তীব্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো রানা।  
'তাহলে বোটটা ফেলে এসেছো কি মনে করে? বোট ছাড়া কিভাবে  
বাঁচতে চাও, বলেন?'

'কোকুন ডুবে গেছে আমি জানতাম না।' নিচের দিকে তাকিয়ে  
বুটের ডগা দিয়ে বরফ খুঁটছে হেলমুটসেন।

'এ-কথা একবারও তোমার মাথায় খেলেনি যে কোকুন আমাদের  
কাছে পৌঁছুতে ব্যর্থ হতে পারে? একজন কমান্ডার হিসেবে তোমার  
কাজ কি শুধু গা ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষায় থাকা, ধরে নেয়া উদ্ধার করার  
জন্যে কেউ না কেউ আসবেই। তুমি নিজে বিশ্বাস করো তোমার  
ক্যাপটেন নির্দোষ, তারপরও তাকে একা ফেলে এলে, জানো এর  
জন্যে তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অভিযোগ আনা যেতে পারে?  
বোট না এনে তোমরা দু'জনেই প্রমাণ করেছো, এই পরিস্থিতিতে  
নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা তোমাদের নেই। তোমাদেরকে দায়িত্ব থেকে  
অব্যাহতি দেয়া হলো। কিছু যদি বলার থাকে, ফেরার পর তদন্ত  
কমিটিকে বলো।' ঘুরলো রানা, দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এসে এরিকার  
সামনে এসে দাঁড়ালো। 'সব লোককে এক জায়গায় জড়ো করো।  
ওদের সাথে আমি কথা বলবো।'

'কিন্তু, স্যার, এই ঠাণ্ডার মধ্যে...'।

'ঠাণ্ডায় একটু কষ্ট পাবার বদলে মৃত্যুকে যদি ঠেকানো যায়, সেটাই  
কি ভালো নয়? শুরুতেই ভুলটা কোথায় হয়েছে সবার জন্য দরকার,  
যাত্রা অন্তত-২

তা না হলে একই ধরনের সংকট আবার দেখা দেবে। আরেকজন মেট দরকার আমার, লিবার্টি-ফোর থেকে। কার কথা বলবে তুমি ?

‘হোলস্টাড।’

‘ওড।’

লোকগুলোকে এক লাইনে দাঁড় করালো এরিকা, প্রথমে লিবার্টি-থ্রির ক্রুদের উদ্দেশ্যে কথা বললো রানা। ওরা যা করেছে তা বিদ্রোহ করার সমতুল্য। এরপরও যদি তারা তাদের অফিসারদের নির্দেশ বিনা দ্বিধায় পালন না করে, এই বরফের নিষ্ঠুর জগত থেকে প্রাণ নিরে ফিরতে পারবে না। কোকুনের ভাগ্যে কি ঘটেছে বর্ণনা করার পর বললো, ওরা এখন একা। এরপর হোলস্টাডকে মেট হিসেবে বহাল করলো রানা, লিবার্টি-থ্রির লোকজনকে নেতৃত্ব দেবে। তারপর আলিষ্টা-নিকভাবে ঘোষণা করলো, হেলমুটসেন আর ডানকানের পদাবনতি ঘটানো হয়েছে।

এক লোক রানাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলো। লিবার্টি-থ্রির কক্সন সে, মার্কের বিরুদ্ধে তার নানা অভিযোগ, ভাষাটাও আপত্তিকর।

‘এ-সব অভিযোগ তাকে একা ফেলে আসার পক্ষে যুক্তি হতে পারবে না,’ বললো রানা। ‘তার কোনো অপরাধ হলে তদন্ত কমিটির সামনে বলার জন্যে অপেক্ষা করা দরকার। আইন হাতে তুলে নেয়ার অধিকার তোমাদের কারো নেই, অথচ তাকে ফেলে এসে ঠিক তাই করেছে তোমরা।’ এরপর রানা বোট আর মার্ককে নিয়ে আসার জন্যে লিবার্টি-ফোর থেকে কেউ স্বেচ্ছাসেবক হতে চায় কিনা জানতে চাইলো।

রানাকে গবিত ও বিস্মিত করে হাত তুললো সবাই, এমনকি আহত দু’জন লোক ও ডেকবর মুলারও। এ-থেকে প্রমাণ হয় ওর নেতৃত্বের

প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা রয়েছে সবার। লিবার্টি-থ্রির ককুসন চেহারায়  
লক্ষ্য আর কুঠা নিয়ে রানার সামনে দাঁড়ালো, সবিনয়ে জানতে  
চাইলো, তার লোকেরা স্বচ্ছাসেবক হতে পারে কিনা।

মাথা নাড়লো রানা। ‘নরক পেরিয়ে একবার তোমরা এনেছো  
আজ। আমার লোকেরা ক্রান্ত নয়।’ লিবার্টি-থ্রির লোকজনের থাওয়া-  
খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র স্নেহ নিয়ে রওনা হবার জন্যে তাগাদা দিলো  
রানা এরিকাকে। নতুন ক্যাম্প তৈরি করার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবে  
তার। তারপর বারোজন স্বচ্ছাসেবক ফিরে আনবে বোটগুলো নিয়ে  
খাওয়ার জন্যে। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালো এরিকা। আস্তিনে  
ঠান পড়ায় ঘাড় ফেরালো রানা।

‘বোট নিয়ে আসুন, মিঃ রানা,’ থমথমে গলায় বললো ডঃ নিক  
শেডি। ‘কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, মার্ককে ওখানেই থাকতে দিন।’

‘তা সম্ভব নয়। কেন?’

‘সে একজন খুনী,’ বললো নিক শেডি। ‘আপনি তা জানেন।  
ফিরিয়ে আনা মানে তাকে দ্বিতীয়বার সুযোগ দেয়া। সে তার নিজের  
পথ খুঁজে নিক, বোট ছাড়া যদি পারে।’

মাথা নাড়লো রানা। ‘আমি তা করতে পারি না।’

‘মাই গড!’ বললো নিক শেডি। ‘বুঝতে পারছেন না, তাকে  
আপনি ফিরিয়ে আনলে প্রতিজ্ঞাটা রক্ষা না করে উপায় থাকবে না  
আমার!’

‘তোমার প্রতিজ্ঞা?’

‘কুস্তাটাকে খুন করা। যীশুর কিরে, আমার হাত থেকে কেউ ওকে  
রক্ষা করতে পারবে না। আমার বাবার খুনের बदলা আমাকে নিতেই  
হবে। কিন্তু কাজটা আমি ঠিক এখনি করতে চাইছি না। দেখতেই

পাচ্ছেন...’ আড়ষ্টভঙ্গিতে ইতস্তত করলো নিক শেডি, তারপর বললো, ‘এরিকা রয়েছে। কাজটা আপনি বরফের ওপর ছেড়ে দিচ্ছেন না কেন? প্রকৃতির ওপর? প্লিজ, মিঃ রানা, প্লিজ। তাকে ফিরিয়ে আনলে পরিবেশটা শ্রেয় নারকীয় হয়ে উঠবে। বাপের কথা ভেবে কাহিল হয়ে আছে এরিকা, তার ওপর আমি যদি মার্ককে খুন করি...।’

‘খুন করবো বললেই করা যায় না, শেডি,’ কঠিন সুরে বললো রানা। ‘বিশেষ করে আমি যখন উপস্থিত রয়েছি। তাকে ফিরিয়ে আনা হবে, তারপর যদি আইসবার্গগুলো আমাদেরকে মেরে না ফেলে, এই বরফের ওপরই একটা সামারি কোট বসবে, কোট যদি সাব্যস্ত করে যে মার্ক জেনেগুনে আমাদেরকে ধাক্কা দিয়েছিল, কতৃক কেড়ে নিয়ে সাধারণ নাবিক করা হবে তাকে, কেপটাউনে ফেরার পর তুলে দেয়া হবে পুলিশের হাতে।’

‘আপনি একটা যন্ত্রণা।’ চিৎকার করে বললো নিক শেডি। ‘এটা অ্যার্টার্কটিকা, এখানে সভ্য সমাজের আইন অচল। কুত্তাটা আমার বাপকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে। তার দোষে তিনটে জাহাজ হারিয়েছি আমরা, বিপদে পড়েছে চার শো লোক। এতো কিছু পরও আপনি বুঝতে পারছেন না, তার মরে যাওয়াই সবার জন্যে ভালো? তাকে ফিরিয়ে আনলে সে আমাদের সবাইকে খুন করে একা পালাবার চেষ্টা করবে। হেলমুটসেন কি বললো শুনলেন না? সে আসতে চায়নি। কেউ যদি আসতে না চায়...।’

‘আসতে না চাইলে তাকে জোর করা হবে না। তাতে তুমি খুশি তো?’

কিছু বলতে গেল নিক শেডি, এরিকাকে আসতে দেখে বললো

না। 'সব রেডি, আমরা রওনা হতে পারি,' বললো এরিকা।

'কাইন,' মাথা ঝাঁকালো রানা। 'দেখো, আমাদের কথা ভুলে  
যেয়ো না। দুটো বোট টেনে নিয়ে যাওয়া সহজ কাজ হবে না।'

'ভুলবো না, স্যার।'

'ওডলাক, এরিকা।'

'ধন্যবাদ, স্যার।' বিশাল দেহ নিয়ে রানার গায়ে সঁটে এলো  
এরিকা। 'সাবধানে যাবেন, ক্যাপটেন।' রানার কাঁধে কপালটা এক-  
বার ঠেকালো সে। 'আপনাকে হারানো আমাদের পোষাবে না।'  
এরপর রানাকে হতভম্ব করে দিয়ে ওর কপালে চুমো খেলো সে।

খানিক পর স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে লিবাটি-থ্রি অভিমুখে রওনা হয়ে  
গেল রানা। এরিকার কথা মন থেকে সরাতে পারলো না। সপ্রতিভ  
ভঙ্গিতে রানাকে চুমো খাওয়াটা তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।  
অ্যাটার্কটিকায় মেয়েলি স্বভাব পরিহার করা অস্তিত্ব রক্ষার জন্যেই  
দরকার, এটা এরিকার জানা আছে। একদল কঠিন চরিত্র পুরুষমানুষকে  
নেতৃত্ব দিতে হয় তার। যদিও তারমানে এই নয় যে সে তার নারী-  
মূলত বৈশিষ্ট্য গোপন রাখার চেষ্টা করে। লোকজনকে পরিচালনা  
করার নিজস্ব পদ্ধতি আছে তার, পুরুষের প্রচলিত পদ্ধতির সাথে তার  
কোনো মিল নেই। নিজের পেশায় এরিকার মতো সাহায্যের হাত  
পেলে ভারি খুশি হতো রানা।

রওনা হবার সময় হেলমুটসেন কঠিন চোখে তাকিয়ে থাকলো রানার  
দিকে। লোকটাকে শত্রুতে পরিণত করেছে কিনা চিন্তা করে একটু  
অস্বস্তি বোধ করলো রানা। ওর ধারণা, বিপদের সময় লোকটা ওদের  
সবার জন্যে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিতে পারতো।

তিনটে হারপুন ফোররানার, বোট অ্যাংকর আর ব্লক ও ট্যাকল-টা  
যাত্রা অন্তত-২

সাথে নিলো ওরা। লিবার্টি-থ্রু র প্লেজ পথটাকে সমতল করে রেখেছে, একই পথ ধরে যাওয়ায় তেমন কোনো বাধার সামনে পড়তে হলো না। পিঠে জোরালো বাতাস থাকায় আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেল ওরা।

পোড়া লিবার্টি-থ্রু কে নিয়ে বরফের কাজ এখনো শেষ হয়নি। হাজারটার পিছনে প্যাক আইস বিরতিহীন মোচড় খেয়ে চলেছে, শব্দ শুনে বোঝা গেল স্টীল প্লেটগুলো ভাঙছে।

বরফের একটা ছোটো পাহাড়ে চড়ে লিবার্টি-থ্রু র সামনে, আইস-বার্গগুলোর দিকে তাকালো রানা। কাছেরটা তিন মাইল দূরেও নয়—গোজ-এর আকৃতি নিয়ে বরফের প্রকাণ্ড পাঁচিল প্যাক আইসে গেঁথে আছে, হঠাৎ তাকালে মনে হবে স্থির। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর রানা দেখলো, সারাক্ষণ সচল রয়েছে ওটা, পাঁচিলের নিচের দিকে কঠিন প্যাক আইস ভেঙে ওঁড়িয়ে যাচ্ছে। প্রথমেই কোকুনের বেঁচে যাওয়া ক্রুদের কথা মনে পড়লো রানার। ফ্যান্টরি শিপ যেখানে অচল হয়ে পড়েছে, সম্ভবত সেই জায়গা দিয়েই পথ করে নিয়ে এগিয়ে এসেছে আইসবার্গগুলো।

তলপেটে ভয়ের শিরশিরে স্পর্শ নিয়ে পাহাড়টা থেকে নেমে এলো রানা। বুঝতে পারছে, ওদের বাঁচার কোনো আশা নেই। কোকুনের দুর্ভাগা ক্রুদের পরিণতি ওদেরকেও মেনে নিতে হবে। আইসবার্গগুলো আসছে মস্তুরগতিতে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে এগোচ্ছে। লোকজনদের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসার চেষ্টা করলো রানা, কিন্তু অনুভব করলো ওর ঠোঁট আড়ষ্ট হয়ে আছে। বরফকে নিয়ে রসিকতা করারও চেষ্টা করলো একবার, বলার পর মনে হলো, কাঁপা। লোকগুলো একযোগে হেসে উঠলে ভাবলো, মাই গড, ওদের বুকে সাহস আছে। এই সময়

মনে মনে প্রার্থনা করলো রানা, অস্ত্রাশ্রা প্রভৃ, শক্তি দাও আমাকে, জোর দাও মনে। ঝগড়াবিক্ষুব্ধ বরফের জগতে দাঁড়িয়ে মানুষের ক্ষুদ্রতা আর অসহায়তা উপলব্ধি করতে পারলো ও, মনে হলো মহাশক্তির নৈকট্য এর আগে কখনো এমনভাবে অনুভব করেনি।

ক্যাম্পের সামনে চলে এলো রানা। তাঁর থেকে বেরিয়ে এলো মার্ক রোসেট। 'তুমি, রানা, না?' ভারি গলা, শরীরটা একটু টলছে। 'কি চাও?'

দলের লোকেরা যথেষ্ট পিছনে, এই মুহূর্তে ওরা একা। 'তোমাকে নিতে এসেছি, মার্ক,' বললো রানা। 'আমার ধারণা, কারণটা তুমি জানো।'

'আন্দাজ করছি, তুমি ধরে নিয়েছো ধাক্কাটা ইচ্ছে করেই মেরেছি আমি, তাই না?' না কামানো দাঁড়িতে ঢাকা মার্কের চেহারা সুরু হয়ে গেছে, চোখে চকচকে দৃষ্টি, চুর হয়ে আছে মদ খেয়ে। 'বেশ, যদি মেরেই থাকি, তো কি হয়েছে? প্রমাণ করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। বেজন্মা শেডিটা যদি হারপুন না ছুঁড়তো...'

❦ 'এতোকণে বরফ থেকে বেরিয়ে যেতে পারতে তুমি, রিপোর্ট করতে ভেতরে ঢোকার কোনো পথ খোলা নেই, তাই তো?'

'নিজেকে খুব চালাক মনে করো তুমি, তাই না, মাসুদ রানা?' আহত পশুর মতো খেঁকিয়ে উঠলো মার্ক। 'তুনে রাখো, জিত আমরাই হবে—তোমাদের সবাইকে আমি টেকা দেবো।'

'বরং নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নাও, মার্ক,' বললো রানা। 'আমার সাথে যাচ্ছে তুমি।'

'তোমাকে আবার একটা তদন্ত কমিটি গঠনের সুযোগ দেয়ার জন্যে?' কর্কশ শব্দে হেসে উঠলো মার্ক। 'ভুলে যাও, মাসুদ রানা।



আমি এখানেই থাকছি ।’

‘তু তদন্ত কমিটি নয়, মার্ক, অ্যান্টার্কটিকা থেকে আমরা কিভাবে পারলে তোমাকে কাঠগড়াতেও দাঁড়াতে হবে । অনেকগুলো অভিযোগ রয়েছে তোমার বিরুদ্ধে । মরে গিয়ে পার পেয়ে যাবে, হত্যা হচ্ছে না ।’

‘বরফ যা করেছে তার জন্যে আমি দায়ী নই,’ টলতে টলতে বললো মার্ক । ‘কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারবে না । ওটা দুর্ভাগ্য ছিলো । আর ভেবো না একা থাকার সিদ্ধান্ত মরে যাবার জন্যে নিয়েছি আমি ...’ হঠাৎ থামলো সে, লিবার্টি-ফোরের স্বেচ্ছাসেবকদের এতোকণে দেখতে পেয়েছে । তার চোখ সরু হলো । ‘আমাকে তুমি এতো ভয় করো যে সঙ্গে করে বারো জন লোককে আনতে হলো ?’

‘তোমার জন্যে নয়, মার্ক,’ শাস্ত সুরে বললো রানা, ‘হেলমুটসেন একটা ভুল করেছে, সেটা সংশোধন করার জন্যে ওদেরকে সাথে আনতে হয়েছে । বোটগুলো নিয়ে যাবো আমরা ।’

‘বোট ! নিয়ে যাবে ? হাত দিয়ে একবার দেখোই না, খুন করে ফেলবো ।’ কথা শেষ করে ঝট করে ঘুরে তাঁবুর ভেতর ঢুকলো মার্ক । কোথায় বোকা মনি হয়েছে বুঝতে পারলো রানা পরমুহুর্তে মার্ককে রাই-ফেল হাতে বেরিয়ে আসতে দেখে । বেরিয়ে এসেই চিংকার জুড়ে দিলো সে, ‘দেখি কার বাপের সাখা বোটে হাত দেয় । ওগুলো আমার দরকার । বোট থাকলে বেঁচে থাকার আশা আছে । নিতে এসেছো বললেই ভেবেছো দিয়ে দেবো ?’ বোল্ট-টা টানাটানি করছে, জমার-বরফের সাথে আটকে গেছে সেটা ।

‘ঠিক আছে, গুলি করার দরকার নেই,’ অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাকালো রানা, ‘যেই কি টিক দুটো জোরে শক্ত বরফে গেঁথে ঝাপিয়ে

পড়লো মার্কের ওপর, মাথা দিয়ে ওঁতে দিলো তার পেটে। বেচপ  
বস্তার মতো বরফের ওপর আছাড় খেলো দু'জন, কিন্তু রানার আগে  
নিজের পায়ে দাঁড়ালো মার্ক, স্বি-তে পা বেধে গেছে রানার। তবে  
রাইফেলটা ওর হাতে চলে এসেছে, বোল্টটাও ফ্রি। মার্কের ওপর  
কড়া নজর রেখে ধীরে ধীরে দাঁড়ালো ও। এখানে মার্কের থেকে  
যাওয়ার সিদ্ধান্তের পিছনে উদ্দেশ্যটা বুঝতে ভুল হয়েছিল ওর।  
এতোকণে নজরে পড়লো একটা বোটের এরইমধ্যে জিনিস-পত্র ঠাসা  
কাঠের কয়েকটা বাস্তু তোলা হয়েছে। তাহলে নিক শেডির ধারণাই  
ঠিক। বরফের জগৎ থেকে ফেরা একমাত্র জীবিত লোক হতে চায় মার্ক  
রোসেট। তবে একা হওয়ার পর নার্ভাস হয়ে পড়েছিল, মদ খাওয়ার  
সেটাই কারণ। 'কু ছাড়া কিভাবে তুমি বোট নিয়ে যেতে চাও?'

'একা কিভাবে বোট চালাতে হয়, ছোটোবেলা থেকে শিখেছি  
আমি,' ধমধমে চেহারা নিয়ে বললো মার্ক। 'ওই আইসবার্গটা যদি  
ক্যাম্প এড়িয়ে যায়, যেভাবে হোক কোকুনে আমাকে পৌঁছুতে হবে।'

'গর্দভ! কি করেছো এখনো টের পাওনি। আমাদের পিছু নিয়ে  
বরফ ঢুকেছিল কোকুন। আটকা পড়েছিল, তারপর ডুবে গেছে।'

চেহারাটা মার্কের দেখার মতো হলো, ধীরে ধীরে খুলে গেল মুখ,  
ঝুলে পড়লো, তারপর চিংকার করে বললো, 'মিথো কথা বলছো  
তুমি!' রানা কিছু বলছে না দেখে প্রশ্ন করলো, 'তুমি জানলে  
কিভাবে? জাহাজের সাথে তোমাদের রেডিওটা গেছে।'

'পোটাবেল একটা ছিলো।'

ইতোমধ্যে লোকজন পৌঁছে গেছে। তাদেরকে প্রথম বোটের দড়ি-  
দড়া খুলতে বললো রানা। বোল্ট খুলে নিয়ে রাইফেলটা তাঁবুর ভেতর  
ছুঁড়ে ফেললো ও। 'কাছে হাত দাও, মার্ক। বোটগুলো আমাদের

ক্যাম্প নিরে যেতে হলে তোমার সাহায্য লাগবে।’

কিছু বললো না মার্ক, নড়লোও না। রানা যা বলেছে তার তাৎপর্য এখনো যেন উপলব্ধি করতে পারেনি সে। লোকজনকে তাদের কাছে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এলো রানা। খানিক পর আশ্তিনে টান অনুভব করলো ও, ঘাড় ফেরাতে দেখলো মার্ক। ‘সত্যি ভূবে গেছে কোকুন?’ কৰ্কশ সুরে জিজ্ঞেস করলো সে, ঠাণ্ডা বাতানে তার নিঃশ্বাস বরফকুচিতে পরিণত হবার আগে ছইক্ষির গন্ধ ছড়ালো।

‘হ্যাঁ।’

‘কেউ বাঁচেনি?’

‘এখনো জানি না। জাহাজ ত্যাগ করার পর ওদের কোনো মেসেজ পাইনি।’

হঠাৎ, রানাকে বিস্মিত করে দিয়ে, হেসে উঠলো মার্ক। শব্দটা কুৎসিত, খানিকটা মাতলামি, খানিকটা উদ্ভ্রান্ততা। ‘এখন আর উদ্ধার করার জন্যে বরফে ঢুকতে সাহস হবে না কারো। একা, আমরা একা। কি মজা!’

‘ফ্যাক্টরি শিপ হারিয়ে তোমার খারাপ লাগছে না?’ রাগ চেপে জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘খারাপ লাগবে কেন? বীমা কোম্পানী ক্ষতিপূরণ দেবে।’ উল্লাসে চকচক করছে মার্কের চোখ।

লোকটাকে মেরে তক্তা বানাবার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করলো রানা। কয়েক শো লোককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে সে, অথচ কোনো অনুশোচনা নেই। ‘তোমার বাবা ছিলেন জাহাজটার,’ মনে করিয়ে দিলো রানা।

‘বাবার কথা ভেবে কেন আমি উদ্বিগ্ন হবো? তাকে আমি কোনো

রকম চিন্তায় ।’ লোকগুলোর দিকে তাকালো সে, দড়ি দিয়ে একটা বোটকে বাঁধছে । হঠাৎ ছুটে গিয়ে রশিটা ধরলো সে । ‘মারো টান, হেঁইয়ো ! জোরে, গাধার দল ! জোরে !’ যেন তার ওপর ভূত সওয়ার হয়েছে । ‘কি হলো, রানা, হাত লাগাও—এসো, এসো । ইঁ করে ওখানে দাঁড়িয়ে থেকো না তো !’

জমাট বরফ থেকে বোটগুলোকে ছাড়িয়ে আনতে দশ মিনিট লাগলো । কাজটা শেষ হতেই আবার থমথমে আর রগচটা ভাবটা ফিরে এলো মার্কের চেহারায়, পরিশ্রমে নেশা ছুটে গেছে । বোট দুটো নিয়ে কিরতি পথে রওনা হয়ে গেল ওরা । পথে মার্ক কোনো কথা বললো না ।

রাত দশটার কিছু আগে ক্যাম্পে পৌঁছলো ওরা । সবাই খুব ক্লান্ত । বগলের নিচে পাঁজরের ব্যাথাটা রানাকে যেন ছুরির খোঁচা মারছে । ভাগ্যিস ওদের জন্যে একটা তাঁবু খাড়া রেখে গেছে এরিকা । খাওয়া শেষ করেই শুয়ে পড়লো সবাই । কেউ পাহারায় থাকলো না । রানা জানে, ঝড়ো বাতাসের মধ্যে দশ মিনিট দাঁড়াবার শক্তিও ওদের কারো নেই ।

তিন ঘণ্টা পর ধাকা খেয়ে ঘুম ভাঙতেই এরিকার গলা পেঁচলো রানা । ‘শিগগির আসুন, ক্যাপটেন !’ তার গলা কাঁপছে । ‘আইস-বার্গ দু’মাইলের মধ্যে এসে পড়েছে, ভাঙতে শুরু করেছে প্যাক ।’

এতোই ক্লান্ত রানা, মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়লেও যেন কিছু আসে-যায় না ওর । মিথ্যে আশা নিয়ে কষ্টকর জীবন ধারণের চেয়ে মরে যাওয়া যেন অনেক সহজ সমাধান । সাংঘাতিক দুর্বল লাগছে নিজেকে ওর, ব্যথা আর শীতে সারা শরীর টনটন করছে । পিঠের নিচে বরফ কাঁপছে বুকে পারলেও চোখ মেলতে ইচ্ছে হলো না

ওর। বারবার ওকে ধাক্কা দিয়ে চলেছে এরিকা। 'স্যার, ক্যাপটেন।'  
ভাষণর রানার গাশে চড় কবালো সে।

চোখ মেললো রানা। দেখলো, টেনে-হিঁচড়ে ওকে তাঁবুর বাইরে  
বের করে নিয়ে যাচ্ছে এরিকা। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সিঁদে হতে  
দাঁড়ালো ও, বিড়বিড় করে কমাপ্রার্থনা করলো, ছ'বার—দ্বিতীয়বার  
মারিকার কাছে, 'কমা করো, তোমার মতো লক্ষ্মী একটা মেয়েকে  
উদ্ধার করার ভাগ্য আমার হলো না... আমার নিজেরও কোন  
উদ্ধার নেই।'

বাইরে বেরিয়ে এসে টলতে লাগলো রানা, বরফ ঢাকা শুভ্র হিম-  
রাজ্যের দিকে অবিশ্বাস ভরা চোখে তাকিয়ে থাকলো। লিবাটি-খি  
অদৃশ্য হয়েছে। করভেটটার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। যে পথে বোট-  
গুলো টেনে নিয়ে এসেছে ওরা, দীর্ঘ পথটা, পথের ছ'পাশে যতোদূর  
দৃষ্টি যায়, বিশাল আকারের ঢেউ মাথাচাড়া দিচ্ছে, প্যাক আইস যেন  
তরল সাগর। কিন্তু তকিমাকার চূড়া নিয়ে, মিনার-এর আকৃতির সাথে  
অনেকটা মেলে, অতিকায় একটা আইসবার্গ এগিয়ে আসছে ওদের  
দিকে, ওটার সামনে টগবগ করে ফুটছে বরফ।

বাকি সবাইকেও টেনে-হিঁচড়ে বের করা হলো তাঁবু থেকে। 'জলদি  
জলদি।' লোকজনকে ধাক্কা মারছে এরিকা, তার সাথে দশ-বারোজন  
লোক। ক্যাম্প ফেলে পালাতে শুরু করলো ওরা, সদ্য ঘুম ভাঙা  
লোকগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এরিকা আর তার দল।

'দাঁড়াও।' পিছু ডাকলো রানা। 'বোটগুলো নিতে হবে।'

'না।' বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠলো এরিকার গলা। 'দেঁরি  
করলে মারা পড়বো।'

আইসবার্গের দিকে চট করে একবার তাকালো রানা। এখানে

খাফা হোক বা বরফের ছোট্ট পাহাড়ে, বাঁচার আশা অত্যন্ত কীণ । গা  
ঝাড়া দিয়ে নিজেকে যেন ফিরে পাবার চেষ্টা করলো রানা । 'যা বলছি  
শোনো, এরিকা,' দৃঢ়তার সাথে নির্দেশ দিলো ও, 'লোকগুলোকে  
এদিকে পাঠাও । বোট ছাড়া আমরা কোথাও যেতে পারি না ।'

'ঠিক আছে, একটা বোট... ।'

মাথা নাড়লো রানা । 'ছোটো জাহাজের জু মিলিয়ে লোক আমরা  
ত্রিশজন । তিনটে বোটই লাগবে । রানার নির্ভর হাবভাব লক্ষ্য করে  
জুরাও যেন নতুন করে বাঁচার আশা দেখতে পেলো । কাউকে কিছু  
বলতে হলো না, ফিরে এসে বোটের রশি ধরলো তারা । বিশজন  
লোক রশি টেনে একটা বোটকে একশো গজ পর্যন্ত আনতে পারলো ।  
ফিরে এসে দ্বিতীয় বোটটা টানতে শুরু করলো তারা । ওদের চার-  
পাশে বিক্ষোভিত হতে শুরু করেছে ভাসমান বরফ । ফাটল সৃষ্টি হচ্ছে  
মেশিন-গান ফায়ারের শব্দ তুলে । অকস্মাৎ বিনা নোটিসে সদ্য তৈরি  
ফাটলের কিনারা থেকে ছ'বার পড়ে গেল কয়েকজন লোক, রক্ষা পেলো  
হাতের রশি না ছাড়ায় । একবার দ্বিতীয় বোটটাকে বিরাট একটা ফাট-  
লের ওপারে টেনে নিতে হলো, চওড়ায় সেটা বোটের প্রায় অর্ধেক ।

ভাবে কাজটা ওরা শেষ করতে পারলো । দ্বিতীয় বোটটা বরফের  
পাহাড়ের গায়ে ঠেকতেই বাকি সব লোকজন ছড়মুড় করে নেমে এসে  
হাত লাগালো ঢাল বেয়ে ওটাকে ওপরে তোলার জন্যে । অস্পষ্টভাবে  
কয়েকটা নতুন মুখ লক্ষ্য করলো রানা, নরম একটা হাতের স্পর্শ কেন  
কে জানে ওকে যেন স্বর্গস্থ পাইয়ে দিলো । নরওয়ের ভাষায় কে যেন  
কি বলছে, কতৃৎস্বের সুরে । তারপর আর কিছু মনে নেই ওর । জ্ঞান  
হারিয়ে ফেললো ।

## পাঁচ

জান ফিরলো, যেন নদীর তলা থেকে ধীরে ধীরে পানির ওপর তোলা হলো রানাকে। চূপচাপ পড়ে থাকলো, ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে। অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা চারপাশ থেকে ঘিরে আছে ওকে। সারা শরীর আড়ষ্ট আর অবশ। ওর প্রতিটি লোমকূপ যেন বরফ হয়ে গেছে। হঠাৎ একটা ভোঁতা আওয়াজ শোনা গেল, ধীরে ধীরে বাড়ছে, সমস্ত দিক ভরে গেল সেই বিচিত্র শব্দ, তারপর সংঘর্ষ ও বিক্ষোভে কেঁপে উঠলো ছনিয়াটা। এ কি মৃত্যু? এই মৃত্যুর কথাই কি মিল্টন তাঁর কবিতায় বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন? শব্দটা বজ্রপাতের মতো নয়, কোনো প্রতিধ্বনি নেই। যখন থামে, হঠাৎ নিঃশেষ হয়ে যায়। নিস্তব্ধতায় কান দুটো ভরাট হয়ে গেল। তবে একা নয় রানা। ক্ষীণ নড়াচড়া টের পাচ্ছে ও, নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছে। ঘামের গন্ধও ঢুকছে নাকে।

হঠাৎ হেসে উঠতে ইচ্ছে করলো রানার। ওর চারপাশে ওরা মৃত নয়। জ্যান্ত, ঘুমাচ্ছে। ধীরে ধীরে উঠে বসলো ও। যতো দুর্বলই হোক, কোথায় রয়েছে বা আশপাশে কি ঘটছে জানতে হবে ওকে। কিন্তু দাঁড়াবার সাথে সাথে হেসে ওঠার ইচ্ছেটা মরে গেল। আবার

নেতিয়ে পড়তে চাইলো ও, চোখ বুজে ঘুমাতে ইচ্ছে করলো, ইচ্ছে হলো অসুস্থ বোধ করার। না শুলেও, বসে পড়লো রানা। তারপর তিরস্কার করলো নিজেকে। জ্ঞানবে না কোথায় রয়েছে? কি ঘটছে বাইরে? হামাগুড়ি দিতে শুরু করলো, বেরিয়ে এলো তাঁবুর বাইরে। টলতে টলতে দাঁড়ালো আবার। শুকনো বমি করলো বার কয়েক।

বাতাস থেমে গেছে। সাদা বরফ থেকে ওঠা ধোঁয়াটে বাষ্প সূর্যের নাগাল পেয়ে গেছে। বরফের রাজ্য স্থির নয়, সারাক্ষণ মোচড় খাচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে নিস্তর্রতা চুরমার করে দিয়ে আবার শুরু হলো আগুয়াজটা। পরবর্তী বিক্ষোভগণ্টা ঠিক যেন অ্যাটম বোমা ফাটার মতো। মেরুদণ্ড সোজা করে শব্দের উৎস খুঁজলো রানা। বিশাল প্রাসাদের আকৃতি নিয়ে বরফের একটা অংশকে লাফ দিয়ে শূন্যে উঠতে দেখলো রানা, অবিশ্বাসে বিস্ময়িত হলো চোখ। বরফটা খুলে গেল ঠিক একটা ফুলের মতো, তারপর বিধ্বস্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে—লক্ষ-কোটি টুকরো, প্রতিটি মুক্তোর মতো চকচকে, চোখ-ধাঁধানো দ্যুতি নিয়ে যেন একদিকের গোটা আকাশ ঢেকে দিলো। পতনের শব্দটা যেন ছনিয়ার সমাপ্তিসূচক, তবে কোনো প্রতিধ্বনি নেই। তারপর অসহ্য নিস্তর্রতা। রানার কজিতে হাত পড়লো কারো। ‘এখন ভালো লাগছে?’

গলা শুনে তাকালো রানা। রানার কজি ধরা হাতটা কাঁপছে, নিক শেডির। ভয়ে সাদা হয়ে আছে তার চেহারা। অপর হাতে ধরা ক্রাস্টটা বাড়িয়ে দিলো রানার দিকে। ‘এটায় চুমুক দিন। ত্র্যাণ্ডি। কাল ফেরার পর আপনি খুব ক্লান্ত ছিলেন।’

কি ঘটেছে মনে করার চেষ্টা করলো রানা। বরফের পাহাড়ে বোট-গুলো এনেছে ওরা। জমাট বরফের ওপর কালো আকৃতি নিয়ে এক-যাত্রা অশুভ-২



পাশে পড়ে রয়েছে সেগুলো। চারটে বোট, রসদের জুপ, তাঁবু, মেজ। একটা তাঁবুর বাইরে কে যেন নরওয়ের একটা পতাকা উড়িয়েছে। আবার কেঁপে উঠলো বাতাস, গুরু-গম্ভীর কামান দাগার শব্দ ভেসে এলো। পাহাড়টার সামনে পশ্চিম দিকে বরফ প্রান্তর, ভাঁজবহুল, এবড়োখেবড়ো। আরো সামনে সেই অতিকায় আইসবার্গ, আকাশ ছুঁয়ে আছে। ৪ চূড়ার একটা শাখা স্ট্যাচু অভ লিবার্টি-র টর্চের মতো খাড়া হয়ে আছে, ঢুকে গেছে আকাশের গায়ে আঁকা রঙধনুর ভেতর। আইসবার্গের গোড়ায় বরফ নড়ছে, মোচড় খাচ্ছে, ভাঁজ হচ্ছে, টগবগ করে কুটছে। উত্তর দিকে আরেকটা আইসবার্গ। দক্ষিণেও রয়েছে...একাধিক।

শিউরে উঠলো রানা, ক্রাস্কাটা ফিরিয়ে দিলো নিক শেডিকে। ‘ধন্যবাদ। ভবিষ্যৎ বলে কিছু বোধহয় নেই, কি বলো?’

‘ওদিকের ওটা, আমি হিসেব করে বের করেছি, বর্তমান গতি যদি না বদলায়, কাল দুপুরে আমাদের ক্যাম্পের ওপর চলে আসবে,’ একজন বিজ্ঞানী কথা বলছে, আবেগশূন্য কণ্ঠ।

‘ক্যাম্প সরানোর কোনো মানে হয় না, কি বলো?’

কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিক শেডি বললো, ‘একটা হলে কথা ছিলো...। ২ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর তিক্ত সুরে আবার বললো, ‘ওকে আপনি ওখানে রেখে এলেন না কেন? সমস্যাটা তাহলে থাকতোই না।’

‘মার্কের কথা বলছো? হ্যাঁ, ওখানে থাকলে মারা যেতো সে। তোমাকে তো বলেছিলাম, ও আসতে না চাইলে আনবো না। বোটগুলো নিতে গেছি শুনে আমাদের সাথে চলে এলো।’

‘আচ্ছা, মিঃ রানা, আমাকে বলবেন, ওর প্রতি আপনার এতো দয়া কেন?’

‘দয়া কোথায় দেখলে ? যা করা উচিত বলে জানি তাই করেছি।  
কোথায় সে ?’

‘ওদিকে,’ ইঙ্গিতে একটা তাঁবু দেখালো নিক শেডি। ‘হেলমুটসেন  
আর ডানকানের সাথে পরামর্শ করছে।’ হঠাৎ আবার রানার হাতটা  
শক্ত করে ধরলো সে। ‘কি করেছেন, বুঝতে পারছেন না ? লোকটা  
খুনী ! একা শুধু বোনার পাইটনকে নয়, আরো অনেককে খুন করেছে  
সে। এখনো আমরা যারা বেঁচে আছি, সবাই মারা যাবো—ওর  
কারণে। আপনি, আমি, এরিকা, মারিকা—আমাদের সবার মৃত্যুর  
জন্যে দায়ী ঐ লোকটা। ও যদি থাকটা না দিতো, লিবার্টি কাইভের  
ক্রুদের আমরা তখনই উদ্ধার করতে পারতাম। তার বদলে সবাই  
আমরা বরফে আটকা পড়েছি। কোকুনের কুরাও। প্রায় পাঁচশো  
লোককে যে খুন করেছে, তাঁকে আপনি বাঁচার সুযোগ দিলেন—  
কেন ?’

‘মার্ককে বাঁচানোর জন্যে নয়, বোটগুলো আনতে গিয়েছিলাম,’  
বললো রানা।

‘কি হবে বোট দিয়ে ? বোট থাক বা না থাক, কেউ আমরা বাঁচবো  
না। অথচ আপনি আমাকে মরার আগে খুনী হতে বাধ্য করেছেন।  
যে-কাজ বরফ করতে পারতো, সেটা এখন আমাকে করতে হবে।  
অবৈধ হতে পারি, কিন্তু বোনার পাইটনের সন্তান আমি—তার খুনের  
বদলা আমাকে নিতেই হবে। এবং খুব তাড়াতাড়ি নিতে হবে, কারণ  
কুস্তাটা তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলে আবার কি ষড়যন্ত্র করে কে  
জানে। যাই, ক্যাপটেন সান্তিকের সাথে কথা বলি।’

‘সান্তিক ! ক্যাপটেন সান্তিক ?’ ঝট করে ঘুরে বোটগুলোর দিকে  
তাকালো রানা। এতক্ষণে খেয়াল হলো ওর, যেখানে থাকার কথা

তিনটে বোট, সেখানে রয়েছে চারটে । নিক শেড়িকে ধরে ঝাঁকালো  
ও । ‘সাত্তিক এখানে ? লিবার্টি-ফাইভের জুরা আমাদের সাথে ?  
মারিকা, মারিকা কোথায় ?’

অবাক চোখে রানার দিকে তাকালো নিক শেডি । ‘গুড গড !  
আপনার মনে নেই ? আপনি তো মারিকার বাড়ানো হাতেই ঢলে  
পড়লেন ।’

স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো রানা । বরফকে অভিশাপ দিল, অভিশাপ  
দিল নিজেকে, মার্ককে ফিরিয়ে আনার জন্যে । ‘কোথায় সে ?’  
কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করলো ও ।

‘ওদিকে, সাত্তিকের তাবুতে ।’

কয়েক সেকেণ্ড অনড় দাঁড়িয়ে থাকলো রানা । জীবনের শেষ কয়েক-  
টা ঘণ্টা বাকি থাকতে তবু যে ছ’জনের আবার দেখা হচ্ছে, এ-ও তো  
কম ভাগ্যের কথা নয় । ঝুঁকলো রানা, এক মুঠো তুষার নিয়ে সারা  
মুখে ঘষলো । এখন আর নিজেকে ওর দুর্বল লাগছে না । কোথেকে  
যেন একটা শক্তি পেয়ে গেছে ও— মৃত্যুকে ঠাকি দেয়ার শক্তি, অভি-  
শপ্ত বরফের নরক থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে লড়ার শক্তি । ধীরে, ধীরে  
পায়ে তাবুটার দিকে এগোলো ও, নরওয়ের পতাকা যেখানে পতপত  
করে উড়ছে । বাইরে থেকে মারিকার নাম ধরে ডাকলো ও ।

রঙধনুর সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে আছে রোদ, আবেগে ব্যাকুল রাজ-  
কন্যার মতো আলুথালু বেশে তাবু থেকে মারিকা বেরিয়ে আসতেই  
অগ্নীয় একটা আনন্দে ভরে উঠলো রানার মন । ওর হাত ধরে, ওর  
মুখে ব্যাকুল দৃষ্টি রেখে, হেসে উঠলো মারিকা, মৃত্যুর মতো চকচক  
করছে চোখ দুটো । পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো ওরা,  
এতো খুশি যে ওরা হাসছে আর হাসছে, কথা বলার অবকাশ পেলো

না। হাত ধরাধরি করে নরম তুখার মাড়িয়ে পাহাড়ের দূর কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালো ওরা, তাকালো আইসবার্গগুলো যেখানে জমাট বরফ তছনছ করে দিচ্ছে। পরস্পরের হাতে চাপ দিলো ওরা, কিন্তু এখন আর ওগুলোর আগমন মনে কোনো রকম ভীতির সঞ্চার করলো না।  
 ৫ জীবন যেন নতুন অর্থ আর মহিমা লাভ করেছে, মৃত্যুভয় সেখানে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। পরস্পরের প্রতি ওদের আকর্ষণ বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করার শক্তি এনে দিয়েছে। রানা আর মারিকার সম্পর্কের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক। ভালোবাসি, এই কথাটা কেউ ওরা পরস্পরকে একবারও বলেনি। তবু কিছু একটা ঘটেছে ওদের মধ্যে। মানুষ যেটাকে ভালোবাসা বলে, ওদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তা না-ও হতে পারে। মারিকার প্রতি দুর্বল রানা, অসম্ভব ভালো লাগে তাকে ওর, প্রয়োজনে তার জীবন, সুখ আর নিরাপত্তার জন্যে নিজের জীবন বাজি রাখতেও দ্বিধা করবে না ও। আর মারিকা? মারিকার কাছে রানা হচ্ছে ত্রাণকর্তার প্রতীক, অভয়দাতা, সম্ভবত স্বপ্নপুরুষ। ওদের সম্পর্কটাকে সং, নিকলুস দুটি মনের মিলন বলা যেতে পারে; সূরুচি আর পরিমিতিবোধ এ-সম্পর্কের নিয়ন্ত্রক।

বেশিক্ষণ ওদের একা থাকা হলো না। এগিয়ে আসতে দেখা গেল হোলস্টাডকে, গম্ভীর চেহারা। 'কি ব্যাপার, হোলস্টাড, কি হয়েছে?' লোকটা খুক করে কাশতে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'সমস্যা,' বললো হোলস্টাড। 'হেলমুটসেন আর ডানকানকে নিয়ে। লোকজন ওদেরকে তাবুতে জায়গা দিতে চাইছে না। দু'জনেই ওরা স্যাণ্ডেফিওর্ডের লোক।'

'কী বলছে। এটা কি দলাদলি করার সময়?'

'তাছাড়া, ওরা আমার নির্দেশ মানতে চাইছে না।'

‘বাধা করো !’

‘চেষ্টা করেছি, কিন্তু...’ কাঁধ ঝাঁকালো হোলস্টাড, তারপর বললো, ‘...হেলমুটসেন একটা গরিলা, ওর সাথে যারামারি করা সম্ভব নয়। মেটের পদ কেড়ে নেয়ায় সাংঘাতিক রেগে আছে সে।’

‘আর ডানকান ?’

‘ডানকান হেলমুটসেনের কথায় ওঠ-বস করে।’

‘ঠিক আছে, হেলমুটসেনকে এখানে নিয়ে এসো।’

কুৎসিত চেহারা দেখেই বোঝা গেল, ভয়ানক খেপে আছে হেলমুটসেন। মারমুখো ভঙ্গি নিয়ে প্রায় ছুটে এলো রানার দিকে। থামলো একহাত দূরে। রানার চেয়ে আধ হাত লম্বা, ‘আড়াই গুণ চওড়া। ‘তুমি নাকি হোলস্টাডের নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেছো ?’ কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘হ্যাঁ। সে আমাকে অর্ডার করার কে ?’

‘তুমি শোনোনি কাল তাকে আমি মেট বানিয়েছি ?’

‘শুনেছি।’

‘আর বোর্ট ফেলে আসার অপরাধে মেট-এর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে তোমাকে, জানোই তো।’

‘ক্যাপটেন মার্ক বলছেন, সে অধিকার আপনার নেই...।’

‘জাহান্নামে যাক মার্ক !’ চাবুকের মতো সপাং করে উঠলো রানার গলা। ‘মার্ক একটা...।’ নিজেকে সামলে নিলো ও। রাগে কাঁপছে। ‘এসো, ক্যাপটেন সাভিকের সাথে কথা বলো।’

‘না,’ রানার বাহু ধরলো মারিকা। ‘এ-সব ব্যাপারে ক্যাপটেন সাভিককে জড়িয়ে না, রানা।’

‘তার দায়িত্ব, তাকে জড়াবে না কেন ?’ জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘সে-ই তো এখন নেতৃত্ব দেবে।’

মাথা নাড়লো মারিকা। ‘না। কমাও তোমার হাতে, রানা। সাভিক আহত হয়েছেন, তাঁর অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। পা আর পাঁজর ভেঙে গেছে তাঁর। বরফ আর লিবার্টি-কাইভের মাঝখানে পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছিলেন, অনেক কষ্টে টেনে তোলা হয়েছে তাঁকে। আমার ধারণা, আজ রাতটুকুও বোধহয়...।’ গলা ধরে আসায় কথাটা শেষ করতে পারলো না সে। তারপর বললো, ‘তাঁর আশা ছেড়ে দাও, রানা। নেতৃত্ব তোমাকেই দিতে হবে। কথাটা তোমাকে পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর মেজর শেয়ার হোল্ডার বলছে। কাজেই এ-ব্যাপারে কোনো সংশয় দ্বিমত বা তর্কের অবকাশ নেই। তোমাকে কমাও করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।’

হঠাৎ করে ভীষণ ক্লান্তি অনুভব করলো রানা। তারমানে দায়িত্বের বোঝা এখনো ওর কাঁধে চেপে আছে। হেলমুটসেনের দিকে তাকালো ও। বললো, ‘সবাই আমরা মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আছি। এখন গোলমাল পাকানোর সময় নয়।’

‘গোলমাল আমি কেন পাকাবো। শুরু করেছে টনসবার্গের লৌকেয়া। আমি আর ডানকান স্যাণ্ডেফিওর্ডের লোক বলে ওরা আমাদের সহ্য করতে পারছে না।’

‘ঠিক আছে, ওদের সাথে আমি পরে কথা বলবো,’ বললো রানা। ‘তার আগে একটু বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে যা করতে বলা হয় করো। এরপর আমি যেন না শুনি তোমরা নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেছো।’

কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করলো হেলমুটসেন, তারপর ধমথমে চেহারা নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো।

‘খোরো,’ রানার গলা থেকে বজ্রপাত হলো যেন ।

ধীরে ধীরে ঘুরলো হেলমুটসেন ।

‘বলো— ইয়েস, স্যার ।’

রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে থাকলো হেলমুটসেন । ‘ঠিক আছে, স্যার ।’  
তুবারের ওপর থপথপ শব্দে পা ফেলে নিজেদের তাঁবুর দিকে  
এগোলো সে, তাঁবুর সামনে ডানকানের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো । নিচু<sup>৩</sup>  
গলায় আলাপ শুরু করলো, দু’জনেই মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে  
তাকালো রানার দিকে, দ্রীতিমতো হিংস্র দৃষ্টি ।

মারিকার হাত ধরে টান দিলো রানা, দু’জনে মাথা নিচু করে  
সাবিকের তাঁবুতে ঢুকলো, তাঁবুর মুখে পর্দাটা তোলাই ছিলো । কম্বল  
মোড়া শরীরটার ওপর বুকে পড়লো মারিকা । কম্বলে বরফ আর  
রক্ত জমাট বেঁধে আছে, মারিকার কাঁধের ওপর দিয়ে রোদ পোড়া  
বিশ্বস্ত চেহারাটা সাভিকের বলে চিনতেই পারলো না রানা । ফিস-  
ফিস করে জিজ্ঞেস করলো ও, ‘জ্ঞান আছে ?’

‘আছে । তোমাকে বোধহয় কিছু বলতে চান,’ একপাশে সরে গেল  
মারিকা । ‘বেশি কথা বলো না, উনি অত্যন্ত দুর্বল ।’ তাঁবু থেকে  
বেরিয়ে গেল সে ।

তাঁবুর খোলা মুখের কাছে হাঁটু গেড়ে বসলো রানা, মুখ নামালো  
ক্যাপটেন সাভিকের কানের কাছে । ‘আপনিকিছু বলবেন আমাকে ?’

‘রানা ?’ চোখ না খুলেই বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করলো ক্যাপটেন  
সাভিক ।

‘হ্যাঁ ।’ লোকটাকে হাঁপাতে দেখে ভয় পেয়ে গেল রানা, সারা মুখে  
চিটচিটে ঘাম ফুটে আছে । মারিকার ধারণা মিথ্যে নয়, রাতটা কাটে  
কিনা সন্দেহ ।

‘গরুটা পাচ্ছেন, আমার পা থেকে ? পচন ধরেছে, গ্যাংগ্রিনা ! আর বেশি দেগি নেই ।’ এই ক’টা কথা বলতেই জান যেন বেরিয়ে গেল সান্তিকের, হাপরের মতো হাঁপাতে শুরু করলো সে । খানিক বিরতি নিয়ে দুর্বল একটা হাত তুলে রানার কাঁধে রাখলো সে । ‘আপনার ওপর কঠিন বোঝা চেপেছে । বরফ থেকে সবাইকে বের করে নিয়ে যেতে হবে । আমি জানি, খুব একটা আশা নেই, তবে...’ ঠোট কামড়ে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করলো সে, ‘...তার আগে শুনি, কি করবেন বলে ভাবছেন আপনি ?’

‘আমরা পিছু হটেতে পারি,’ বললো রানা । ‘বাতাস কমে যাওয়ায় পশ্চিম থেকে আসা বরফের চাপ কমবে বলে মনে হয় । এখনই যদি রওনা দিই আমরা, আইসবার্গগুলোর আগে আগে থাকতে পারবো— হয়তো ।’

ধীরে ধীরে, ক্লান্তভাবে মাথা নাড়লো সান্তিক । ‘কোনো লাভ হবে না । এই জায়গা ছেড়ে গেলে, আপনারা বাঁচবেন কিভাবে ? বোট ছাড়া ১ কাল আপনি কি করেছেন, এরিকার মুখে শুনেছি আমি । বোট থাকলে বাঁচার আশা আছে, আপনার সাথে আমি একমত । একটা আইসবার্গ হলে পালিয়ে যাবার জন্যে পিছু হটার যুক্তি ছিলো, কিন্তু এক লাইনে অনেকগুলো ওরা । তাছাড়া, পিছু হটা ব্যাপারটা নেতিবাচক, ক্রুদের মনোবল বলে কিছু থাকে না ।’

‘আপনি অভিজ্ঞ ক্যাপটেন,’ সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা, ‘আপনি কি পরামর্শ দেন ?’

ক্যাপটেনের চোখে উত্তেজনা ফুটে উঠতে দেখলো রানা । সে বললো, ‘আমার ধারণা, আপনাদের উচিত সামনে এগোনো ।’

হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো রানা । বলে কি লোকটা ! এক যাত্রা অশুভ-২



লাইনে ছ'য়-সাতটা আইসবার্গ এগিয়ে আসছে, এই পরিস্থিতিতে সামনে এগোনো মানে খেঁচায়, সময়ের আগে, যত্নকে আশির্ষন কর হবে না ?

রানার কাছে হাতটার চাপ আরো বাড়লো । 'সাদাটা সকাল এখানে শুয়ে আইসবার্গগুলোকে দেখেছি আমি,' বললো সাভিক । 'দেখুন, তাকান ।' তাঁবুর খোলা মুখের দিকে ইঙ্গিত করলো সে । 'দক্ষিণের বার্গটায় কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি ? চওড়া একটা কানিস আছে । নিচ থেকে ঢাল বেয়ে ওঠা যাবে । চোখে গ্রাস নিয়ে দেখেছি আমি । আপনাদের ক্যাম্পটা যদি ওই কানিসে তুলে নিয়ে যেতে পারেন—'

'কিন্তু এ যে অসম্ভব ।'

'অসম্ভব বলে কিছু নেই,' বিপদগ্রস্ত দিশেহারা লোককে রানা যা বলে, ক্যাপটেন সাভিক ঠিক সেই সুরে একই কথা বললো । 'কঠিন, তবে অসম্ভব নয় । আপনি যেমন বললেন, ওদের এগিয়ে আসার গতি কমে গেছে । ফলে আগের চেয়ে অনেক শাস্তভাবে প্যাক আইস ভাঙছে ওরা । আপনাদের ক্যাম্পটা ছোটো একটা আইসবার্গ, তাই না ? এটার চারপাশের সমস্ত বরফ ভেঙে যাবে, তবে এটা সম্পূর্ণ ভাঙবে বলে মনে হয় না । ভাগ্য ভালো হলে, অল্প কিছু সময়ের জন্য কানিসের কাছাকাছি থাকার সুযোগ হবে আপনাদের ।'

'ইয়া, কিন্তু—'

'আপনি বুদ্ধিমান মানুষ, সাথে করে ফোররানার আর ট্যাকল-টা নিয়ে এসেছেন । আমিও কিছু ফোররানার এনেছি । আমার ধারণা, সুযোগ একটা আছে । ছোট্ট, তবে একমাত্র ।' ঢলুঢলু চোখে রানার দিকে তাকালো ক্যাপটেন । 'আপনি আমার সাথে একমত ?'

সাথে সাথে কিছু বললো না রানা । তাকালো আইসবার্গের গোড়া

যেখানে ভাঙচুর করছে ভাসমান বরফের মাঠগুলোকে। এখন এক মাইল দূরেও নয়, ঘণ্টায় সম্ভবত দুশো গজ গতিতে সরাসরি ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। এক মাইল কি আরো বেশি দূরে, আইসবার্গটার ছ'দিকে, ডানে ও বাঁয়ে, ঝড়ের কবলে পড়া উথালপাতাল সাগরের মতো আলোড়িত হচ্ছে বরফ, মাঠগুলো টুকরো টুকরো হচ্ছে, বিক্ষোভিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সমান হয়ে যাচ্ছে। আলোড়নের শেষ সীমায় ভাঙচুর আর বিক্ষোভের আধিক্য লক্ষ্য করলো রানা, কারণ-টাও বুঝতে পারলো—এক আইসবার্গের আলোড়ন আরেক আইসবার্গের আলোড়নের সাথে মিলিত হচ্ছে ওখানে। তিন-চার তলা বাড়ির সমান এক-একটা বরফের টুকরো সবুগে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে আকাশে। চারপাশে তাকিয়ে ওদের মতো আরেকটা নির্রেটদর্শন বরফের পাহাড় রানার চোখে পড়লো না। আইসবার্গটার ছ'পাশের চেয়ে সামনের দিকটায় আলোড়ন কম। ই্যা, ক্ষীণ একটু সম্ভাবনা আছে হয়তো, যেহেতু সরাসরি ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে ওটা। অস্তুত, ধ্বংস-শক্তির উৎসমুখে চড়ে বসার ধারণাটা রানার মনে আবেদন সৃষ্টি করলো। এ-ধরনের বেপরোয়া প্রচেষ্টা মৃত্যুপথযাত্রী অভিযাত্রীদেরই মানায়। 'এটুকু বলা যায়, চেষ্টা করে দেখার মতো একটা কিছু পেলান আমরা।'

সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে ক্যাপটেন সান্তিকের। কথা বলার জন্যে বারবার দম নিতে হলো তাকে। 'একবার নিঠে চড়ে বসার পর, আপনার ঘোড়া হবে ও। কে জানে, বরফ ভেঙে আপনার দেয় অন্য একটা পথ তৈরি করে দিতে পারে।' চোখ বুজে হাঁপাতে লাগলো সে। বেশ কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল, লোকটা নড়ছে না দেখে ধীরে ধীরে সরে আসার চেষ্টা করলো রানা। তার বিশ্বাস দরকার।

কিন্তু একটা হাত নড়ে উঠলো। 'মার্ক কি... ?'

'হ্যাঁ,' বললো রানা। 'আপনি কি তার সাথে কথা বলতে চান ?'

এক মুহূর্ত পর ক্যাপটেন বললো, 'না। সে শক্তি আমার নেই।' থক থক করে কাশলো সে। 'বুড়ো রোসেট সম্পর্কে আমার ধারণা যাই হোক, সে একটা পুরুষ বটে। তার এই ছোঁড়াটা একেবারেই নষ্ট। মার্ক, একটা বিপদ, মিঃ রানা। মারিকার দিকে একটু খেয়াল রাখবেন, প্লিজ। বোনার পাইটন যে উইল করে গেছেন, আমি তার একজন সাক্ষী, সব তিনি তাঁর মেয়েকে দিয়ে গেছেন—শুধু নগদ টাকার অর্ধেক পারে নিক শেডি। আপনি আমাকে কথা দিন, মিঃ রানা, মার্ক রোসেট যেন জীবিত ফিরতে না পারে।' তার কথা জড়িয়ে এলো, শেষের দিকে বোকা গেল না।

ক্যাপটেন সান্ত্বিত কি চাইছে বুঝতে পারলো রানা। কিন্তু ওর পক্ষে কথা দেয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কাজেই নিঃশব্দে তাঁর থেকে বেরিয়ে এলো ও, ভেতরে পাঠালো মারিকাকে। 'উনি খুব দুর্বল, পাশে একজন থাকা দরকারি।'

অতিকার আইসবার্গটার দিকে তাকিয়ে কানিসটা খুঁজলো রানা। গোড়া থেকেই শুরু হয়েছে সেটা, সামান্য ঢাল হয়ে উঠে গেছে বরফের পাঁচিল বেয়ে, ঘিরে থাকা চারপাশের প্যাক থেকে পঞ্চাশ ফুট উচুতে উঠে সমতল হয়েছে। ক্ষীণ সুর্যোগ সত্যিই আছে, উপলব্ধি করলো রানা। মনে মনে প্রার্থনা করলো, চোখে আঙুল দিয়ে সুর্যোগটা যে দেখিয়ে দিয়েছে সে যেন ওই কানিসে পৌঁছনো পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

লোকজনকে এক আয়গায় জড়ো করে প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করলো রানা। উৎসাহিত হয়ে উঠলো তারা। বাঁচার আশা এখনো আছে, এই বাণী

যেন মস্তের মতো কাজ করলো, বিনা ভাগাদায় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লো সবাই। ফোররানারগুলো পরস্পরের সাথে বাঁধা হলো। লুপ তৈরি করে পরানো হলো বোটগুলোর। কাপড়ের তৈরি বস্তায় ভরা হলো রসদ। তবে সবাই কাজে ব্যস্ত থাকলেও, রানা লক্ষ্য করলো, দিন যতোই শেষ হয়ে আসছে, ঘাড় ফিরিয়ে আইসবার্গটার দিকে চোরাচোখে একবার করে তাকাচ্ছে জুনা, চেহারায় আতংকের ছাপ গোপন থাকলো না।

সকলো নাগাদ শেষ হলো কাজ। খাওয়া শেষ করার পর কারো কিছু করার থাকলো না। ঘুমাতে যাবার ইচ্ছে নেই কারো, বরফের ওপর ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো সবাই, চোখে সংশয় আর ভয় নিয়ে তাকিয়ে আছে আকাশ-ছোয়া বরফ-স্তূপের দিকে। দৃশ্যমান যত্নের মতো ওদের ক্যাম্পের ওপর ঝুঁকে আছে যেন সেটা। বিক্ষোভ আর ভাঙচুরের শব্দে কোনো বিরতি নেই। দক্ষিণ দিগন্ত-রেখার কাছ থেকে সূর্যের সোনালি আভা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, আকাশের আরো খানিক ওপরে নকল আরেকটা সূর্য দেখতে পেলো জুনা—বাম্প আর মেঘের গায়ে প্রথম সূর্যের প্রতিফলন। আইসবার্গের গায়ে রোদ লাগায় পাঁচিলের একটা অংশ কাঁচের মতো স্বচ্ছ আর চক-চকে লাগলো। ছায়ার ভেতর বরফ কোথাও সবুজাভ, কোথাও নীলচে। তবে সরাসরি যেখানে রোদ পড়েছে, বরফ সেখানে মসৃণ ইস্পাতের রঙ পেয়েছে।

বেশিরভাগ সময় নিজের ভাবতেই থাকলো মার্ক। হেলমুটসেন আর ডানকানের সাহায্য নিয়ে ভাবুটা নিজেই বানিয়েছে সে। ওদের তিনজনকে একসাথে থাকতে দেয়া ঠিক হচ্ছে না, রানা জানে, তবু নতুন কোনো সংকট সৃষ্টি করতে চায়নি বলে বাধা দেয়নি। যে-ক'বার ভাবু যাত্রা অন্তত-২

থেকে বেরিয়েছে মার্ক, একা। তাকে দেখে বিষন্ন আর নিলিপ্ত মনে হয়েছে, যেন আশপাশে কে আছে বা কি ঘটছে সে-সম্পর্কে সচেতন নয়। রানার ঠিক জানা নেই, জুরা তার অপরাধ সম্পর্কে কতোটুকু জানে। লিবার্টি-ফোরের জুরা নিশ্চয়ই সন্দেহ করেছে যে ধাক্কাটা জেনে-ওনে মেরেছিল সে। পরিস্থিতি অন্য রকম হলে, এতোক্ষণে ওদের হাতের খুন হয়ে যেতো মার্ক। কিন্তু মৃত্যু তথা আইসবার্গের আগমন সব কিছু ওপর প্রভাব ফেলেছে। একবারই মাত্র একটা ঘটনা ঘটলো।

ক্যাপটেন সাত্তিক ঘুমাচ্ছে দেখে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছে মারিকা। তার সাথে একটা বোটের কিনারায় বসে আছে রানা। বরফ-পাহাড়ের ধারে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এরিকা আর নিক শেডি, তাকিয়ে আছে সূর্যের দিকে। ক্যাম্পের দিকে ফেরার জন্যে ঘুরেছে জুরা, এই সময় তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো মার্ক। তাকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়লো নিক শেডি, একনিমেষে তার কুংসিত চেহারা রাগে বীভৎস হয়ে উঠলো। এরিকার হাত ছেড়ে দিয়ে মার্কের দিকে এগোলো সে। অশ্রাব্য ভাষার গাল পাড়ছে।

তাকে আসতে দেখলো মার্ক, সে-ও দাঁড়িয়ে পড়লো। চোখ কান্নাকাতি উঠলো তার, শরীর আড়ষ্ট। রানার বাহু আরো জোরে চেপে ধরলো মারিকা। মার্কের সামনে দাঁড়ানো নিক শেডিকে সরু, ভদ্রুর কাঠির মতো লাগলো। দাঁড়িয়ে পড়লো রানা। নিক শেডির সাথে গিস্তল থাকতে পারে, সমস্ত মনোবল এক করে খুন করার শক্তি পেয়ে গিয়ে থাকতে পারে সে। তা যদি না হয়, কল্পনার চোখে রানা দেখতে পেলো, মেরে তাকে ছাত্ত বানিয়ে ফেলেছে মার্ক। শুকনো সরু ডালের মতো নিক শেডিকে মট করে ভেঙে ফেলার শক্তি রাখে সে।

রানা দাঁড়াতেই, ওর সামনে দিয়ে ছুটে গেল এরিকা। নিক শেডির

হাত ধরে মার্কের কাছ থেকে তাকে সরিয়ে আনলো সে। নিক শেডি  
মুখ অসংখ্য কেঁচোর সমষ্টি খেন, কিলবিল করছে। রানার একটা হাত  
ধরলো মারিকা, বিড়বিড় করে বললো, 'নিজের ওপর নির্ধাতন করছে  
নিক। ওহু ঈশ্বর, ওরা বেঁচে গেলে কি খুশিই না হই আমি।'

মারিকার দিকে তাকালো রানা। 'তোমার মনে হয়, সুখী হবে  
ওরা?'

'হ্যাঁ, হবে,' দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বললো মারিকা। 'বেচারী এরিকা  
—ওর মধ্যে জননীমূলভ প্রবৃত্তি কাজ করছে। নিকের ব্যাপারটা  
আলাদা। সে প্রেমে পড়েছে। আমার ধারণা, জীবনে এই প্রথম সুখ  
খুঁজে পেয়েছে নিক। একদিকে সুখ, আরেক দিকে প্রতিশোধের  
আগুন, নির্ধাতন ভোগ করার সেটাই কারণ। বেঁচে থাকতে চায়, কিন্তু  
দায়িত্ব ভুলে গিয়ে নয়।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো মারিকা।

'মার্ককে খুন করা তার দায়িত্ব, এ কথা না ভাবলেই তো পারে।  
এখনো বেঁচে আছে, সাথে এরিকা—সময়টা উপভোগ করুক।'

কিছুক্ষণ পর মারিকা বললো, 'কাজটা তুমি ভালো করোনি, রানা।'

'কি কাজ?'

মারিকা চুপ করে থাকলো। খানিক পর আবার বললো সে, 'রানা,  
কানিসে সত্যি যদি আমরা পৌঁছতে পারি, দেরি না করে তদন্তের  
ব্যবস্থা করতে হবে তোমাকে। ক্রুদের সব কথা জানার অধিকার  
আছে।'

রানা কিছু বললো না।

একটু পর রানার হাত ধরে মুহূ চাপ দিলো মারিকা। 'তবে এ-সব  
কথার এখন আর কোনো অর্থ নেই। আবার আমাদের দেখা হয়েছে,  
তোমার পাশে থাকতে পারছি আমি, এটুকুরই শুধু গুরুত্ব আছে।

সময় খুবই কম পাবো, জানি, তবু তোমার সান্নিধ্য যতটুকু পাই ততটুকুই লাভ। বলতে পারবো না কেন, ইচ্ছে হচ্ছে, যদি মারা যাই, তুমি যেন আমার পাশে থাকো—আমি যেন তোমার বুকে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ফেলি। একেই কি ভালোবাসা বলে, রানা? ধারণা ছিলো, মার্ককে আমি ভালোবাসতাম, কিন্তু তার বেলায় তো কখনো এরকম হয়নি আমার। ওর সাথে সাগরে গিয়ে অনেকবার বিপদে পড়েছিলাম আমি, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে প্রতিবার ভয়ানক নিঃসঙ্গ মনে হয়েছিলো, মনে হয়েছে আমার ভয় আর ব্যথা দূর করার জন্যে কেউ নেই পাশে।’

ইতস্তত একটা ভাব নিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলো রানা, ওর মুখে হাত চাপা দিলো মারিকা। ‘না, রানা, কিছু বলো না। আমি তোমাকে কোনো প্রশ্ন করিনি। তুমি কি ভাবছো, আমাকে নিয়ে তোমার কি অনুভূতি, এ-সব আমার কল্পনায় থাকতে দাও।’

চুপচাপ বসে থাকলো ওরা, সময় বয়ে চললো। কুরা সবাই তাঁবুতে ফিরে গেছে, বাইরে ওরা একা। মাঝে মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছে মারিকা, কখনো একটানা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকছে। রানাও তাই। ছেলেবেলার অনেক মজার ও হাস্যকর ঘটনা রানাবে শোনানো হয়ে গেছে মারিকার। রানা তাকে শুনিয়েছে নিজের নিঃসঙ্গতার কাহিনী। ঘরে মন টেকে না, কোনো বাধন সহ্য করতে পারে না, অন্তরের অন্তস্তল থেকে জানে, স্পষ্ট কোনো কারণ ছাড়াই জীবনটা তার সুখের নয়। সম্ভবত সুখ কাকে বলে জানেই না সে।

মাঝরাতে দিকে পাহাড়ের কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালো ওরা। দু’জনের দুটো হাত এক হয়ে আছে। ডিমের খোলা আকৃতির আকাশের দক্ষিণ দিকে আরো নিচে নেমে এসেছে সূর্য। হঠাৎ রানার মনে

হলো, ওদের ওপর নজর রাখছে কেউ। সম্ভবত মারিকারও একই অসুভূতি হয়েছে, কারণ রানার সাথে সে-ও ঘাড় ফেরালো।

নিজের তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে মার্ক, ওদের কাছ থেকে বিশ গজ দূরে স্থির অনড় ভঙ্গিতে। গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করছে সে, হাড়ানোর ভঙ্গিটাতে এমন একটা কিছু আছে রানাকে তার বাপের কথা মনে করিয়ে দিলো। চোখাচোখি হলো ওদের, বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলো রানা তার চোখে কুৎসিত নগ্ন ঘৃণা উথলে উঠতে দেখে। বুড়ু নেকড়ের মতো লাগলো লোকটাকে।

রানার একটা হাত ঝাঁকড়ে ধরলো মারিকা, সে-ও মার্কের ভাব লক্ষ্য করে ভয় পেয়েছে। রানাকে ঘুরিয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো সে, ফিসফিস করে কাঁপা গলায় বললো, 'সাবধানে থেকো, রানা।' চট করে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকালো একবার। 'মার্ক অত্যন্ত বিপজ্জনক।' তারপর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলো সে, বললো, 'বাই, আমি আমার রোগীকে দেখি।' তাড়াতাড়ি তাঁবুর ভেতর ঢুকে পড়লো সে।

সে-রাতে ঠাণ্ডা আরো ঘন আর গাঢ় হলো। ক্যাম্পে একটা অস্থি-হুতা দেখা দিলো। যত্নের একটা অদ্ভুত সম্মোহনী শক্তি আছে। কেউ চায় না হঠাৎ করে তার হাতে ধরা পড়তে।

পরদিন সকালে আইসবার্গটা ওদের কাছে এসে পড়লো।

ছ'টার খানিক পর হামাগুড়ি দিয়ে রানার তাঁবুতে ঢুকলো মারিকা। তার চোখ দুটো অসম্ভব বড় হয়ে আছে, চেহারায় ক্রান্তি আর ভয়। 'রানা, বাইরে আসবে, প্লিজ ? আমার ধারণা, তাঁকে আমরা হারিয়েছি।'।



## হয়

মারিকার পিছু পিছু ক্যাপটেন সাভিকের তাঁবুতে ঢুকলো রানা। সকালের আকাশে কোনো সূর্য নেই। কালচে মেঘ জমেছে এখানে সেখানে, দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে গতি পাচ্ছে বাতাস। তাঁবুর ভেতর প্রায় অন্ধকার, ক্যাপটেন সাভিকের দাড়ি ঢাকা মুখ কোনো রকমে দেখতে পেলো রানা। চোখে অন্ধকার সয়ে আসতে কন্ঠন দিয়ে তাকে পুরোপুরি ঢেকে দিলো ও। অনেকক্ষণ হলো মারা গেছে মানুষটা, বরফ হয়ে আছে শরীর।

তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে রানা দেখলো, অন্যান্য তাঁবু থেকে অনেকেই বেরিয়ে এসেছে, তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ক্যাম্পের পরিবেশ টান টান হয়ে রয়েছে উত্তেজনা। লোকগুলো যেন মৃত্যুর গন্ধ পেয়েছে নাকে। ‘কিভাবে ওকে কবর দেবো আমরা?’ ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো মারিকা।

‘যেখানে আছে সেখানেই থাকতে দাও,’ বললো রানা।

তর্ক করার জন্যে মুখ খুলতে গেল মারিকা, রানা ধমকের সুরে বললো, ‘ওদেরকে দেখছো? সাতিক মারা গেছে না জেনেই আতং-

কিত হয়ে আছে সবাই।’

চোখ ঘুরিয়ে ক্যাম্পের চারদিকে তাকালো মারিকা, চোখ ছোটো ভরে উঠেছে পানিতে।

‘কর গডস সেক, কেঁদো না!’ চাপা গলায় বললো রানা। ‘ওরা মুখে ফেলবে! বুঝতে পারছো, ওদেরকে জানানো চলবে না!’

ঠোট কামড়ালো মারিকা। রানার দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাকালো। ‘ক্যাপটেন সাভিক আন্দের কথা করবেন না, রানা?’

‘তিনি খুশি হবেন, হওয়ার যদি সুযোগ থাকে।’ ঘুরে দাঁড়ালো রানা, চিৎকার করে স্টুয়ার্ডকে খাবার তৈরির নির্দেশ দিলো।

খেতে বসে জুরা কেউ তেমন কথা বললো না। তবে নিঃশব্দ বরাদ্দ ফেলে রাখলো না কেউ, জানে শারীরিক দুর্বলতা সময়ের আগে মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। মনে মনে এ-কথাও কারো অজানা নেই যে এটাই হয়তো ওদের শেষ খাওয়া। খাওয়া শেষ করেই তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলো সবাই।

মৃত্যুদণ্ড পাওয়া কয়েদী সর্বশেষ নাস্তার পর ফাঁসির মঞ্চের দিকে দৃষ্টান্তে ইঁা করে তাকিয়ে থাকে, ওরা সবাই সেই একই দৃষ্টিতে আইসবার্গটার দিকে তাকিয়ে থাকলো। কাউকেই করার মতো কোনো কাজ দিতে পারলো না রানা। একদৃষ্টে আইসবার্গটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো তারা, কেউ কেউ মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাপটেন সাভিকের তাঁবুর দিকে তাকালো।

আইসবার্গের সামনের অংশটা এখন আর ওদের কাছ থেকে তিনশো গজ দূরেও নয়। ওটার পিছনে বরফের পাঁচিল গায়ে কোথাও সবুজ কোথাও নীল কাঁচের রঙ নিয়ে, ঠাণ্ডা আর স্থির, আকাশের দিকে উঠতে উঠতে হারিয়ে গেছে মেঘের ভেতর।

ভাঙচুর আর বিক্ষোভের শব্দ এতো জোরালো যে চিংকার করলেও সব কথা শুনতে পাচ্ছে না ওরা। ওদের বরফের পাহাড়টা কাঁপছে। পায়ের কাছে তাকিয়ে কাঁপনটা দেখতেও পেলো রানা। বোটগুলো ছলছে, একসাথে বাঁধা কাঠের বাজ্ঞগুলো কাত হয়ে পড়ছে এদিক ওদিক। বিপুল আলোড়নের মাঝখানে বরফের আশ্রয়টা যেন একটা দ্বীপ। ওদের চারপাশে ভাসমান বরফ চুরমার হতে শুরু করেছে। আর একটু পরই ওই তুমুল আলোড়নের মাঝখানে নাগতে হবে রানাকে, চেষ্টা করতে হবে কানিসটার ওপর রশি আটকানোর। ভয় যেন রানার হৃৎপিণ্ডটাকে মুঠোর ভেতর নিয়ে চাপ দিচ্ছে।

আতংক শুরু হলো আইসবার্গ আর ওদের মাঝখানে বড় একটা ভাসমান বরফ কানফাটানো শব্দে বিক্ষোভিত হতে। টুকরোটার অর্ধেক, ওদের কাছাকাছি অংশটুকু, মাথাচাড়া দিলো, ধীরে ধীরে উল্টে যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, ওদের মাথার ওপর খাড়া হয়ে ঝুলছে সেটা, চল্লিশ কি পঞ্চাশ ফুট উঁচু। তারপর পতন শুরু হলো। ওটার কিনারা ওদের আশ্রয়ের সর্বশেষ কানিসে বিধ্বস্ত হলো। বিশ মন ওজনের মস্ত একটা টুকরো পড়লো লিবার্টি-ফাইভের এক ক্রুর ওপর। পাহাড়ের মেঝের সাথে চ্যাপ্টা হয়ে গেল শরীরটা। ওদের আশ্রয়ের কিনারা থেকে বিরাট একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে গেল দূরে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে কালো সাগরকে টগবগ করে ফুটতে দেখলো ওরা।

কেউ নড়লো না। প্রকৃতির প্রচণ্ড ও নির্মম শক্তির প্রকাশ দেখে সবাই ওরা স্তম্ভিত হয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ আর্তিচিংকার বেরিয়ে এলো। মুলারের গলা চিরে। সম্ভ্রান্ত হরিণের মতো লাফ দিয়ে ঘুরলো সে, তারপর দৌড় দিলো। এক সেকেন্ডে সবাই তাকিয়ে থাকলো,

অনড়, সম্মোহিত । তারপর এক লোক পিছু নিলো তার । পরমুহুর্তে  
ক্রুদের অর্ধেক লোক ছুটতে শুরু করলো ।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে ছুটলো রানা, লোকগুলোকে বাধা দেয়ার জন্যে ।  
তবে ওর আগে পৌঁছে গেল হেলমুটসেন । এক লোককে ধরে ফেললো  
সে, এক ঘুসিতে ফেলে দিলো বরফের ওপর । এরপর দুজানকে ধরলো  
সে, তার মুখটা ঘুরিয়ে দিলো ধ্বংসযজ্ঞের দিকে ।

আতংকিত লোকগুলো থামলো, হাপরের মতো । তাঁপাড়ে সবাই ।  
সদ্য অবাই করা পশুর দৃষ্টি নিয়ে হেলমুটসেনের দিকে তাকালো  
তারা । তারপর মাথা নিচু করে ফিরে এলো তাঁবুর দিকে ।

ওরা ফিরতে, এগিয়ে গিয়ে ওদের সাননে দাঁড়ালো রানা । উপলব্ধি  
করলো, হয় এখন নয়তো কখনোই নয় । এরপর যদি দেরি করে 'ও,  
চেঁটা করার জন্যে যে শক্তি আর সাহস দরকার হবে তা পাওয়া যাবে  
না । ভাঙচুরের শব্দের জন্যে কথা বলার উপায় নেই, সবাইকে জড়ো  
করে ইঙ্গিতে রানা জানালো, আইসবার্গে চাড়াতে যাচ্ছে ওরা । ওর  
পাশেই রয়েছে মারিকা, চিংকার করে প্রশ্ন করলো, 'প্রথমবার কে  
চেঁটা করবে ?'

'আমি,' বললো রানা, 'আর হেলমুটসেন ।'

ক্রুরা প্রায় সবাই বরফে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করলো, সবচেয়ে বেশি  
সময় নিলো মার্ক । তার দিকে একবার মাত্র তাকালো রানা, দেখলো  
অদ্ভুত একটা আলো কুটে আছে তার চেহারায়, চোখে কিসের যেন  
চকচকে উজ্জ্বলতা । ওয় আর উত্তেজনার নিশ্চয় বলে মনে হলো রানার ।

রশির কুণ্ডলী তাঁবু থেকে বের করে বরফের ওপর ফেলা হলো ।  
রশির হুটে প্রান্ত্র হাতে নিয়ে হেলমুটসেনকে ডাকলো রানা । চেহারায়  
অসন্তোষ নিয়ে এগিয়ে এলো সে । রশির একটা প্রান্ত্র তার হাতে

ধরিয়ে দিলো রানা। ইতস্তত করতে লাগলো লোকটা, চোখ ভরা রাগ। রানার মনে হলো, প্রতিবাদ করবে সে। সন্তুষ্ট কাপুরুষ শব্দটা শোনার ভয়ে শেষ পর্যন্ত কিছু বললো না সে, রশিটা নিছের কোমরে জড়াতে শুরু করলো। অপর প্রান্তটা নিয়ে পাহাড়ের কিনারায় চলে এলো রানা, এখান থেকে পাহাড়ের গা প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে আলোড়িত প্যাকে নেমে গেছে। এগিয়ে এসে ওকে চুমো খেলো মারিকা, সবার চোখের সামনে, সরাসরি ঠোটে। সে তার নিছের হাতে রানার কোমরে রশি জড়াতে শুরু করলো।

এই সময় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়া হলো তাকে। রানার কোমর থেকে হ্যাঁচকা টানে খুলে নেয়া হলো রশিটা। পাহাড়ের কিনারা থেকে পিছলে নিচের প্যাক আইসে নেমে গেল মার্ক। রশির প্রান্তটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে আছে সে, নিচ থেকে ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে উদ্মাদের মতো নিঃশব্দ হাসি হাসলো, দ্রুত হাতে কোমরে রশি জড়াচ্ছে। ধমকের সুরে হেলমুটসেনকে ডাকলো সে। রশিটা ধরে টানতে যাবে রানা, ওর কজ্জি চেপে ধরলো নিক শেডি। ‘যেতে দিন ওকে।’ ওর কানে চিংকার করলো সে। ‘আপনাকে আহঁ সাবধান করছি, ওকে যেতে দিন।’ রানা ইতস্তত করছে, দেখলো নিক শেডির চোখে কিসের যেন তৃপ্তি। তার বোধহয় বিশ্বাস, যে-ই প্যাক আইস পেরুতে চেষ্টা করুক তার কপালে নির্ধারিত মরণ আছে।

কুণ্ডলী থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করেছে রশিটা। নিচের বরফে তাকালো রানা, মার্ক আর হেলমুটসেন এক সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সময় রানা লক্ষ্য করলো, মার্ক তার বুটে ক্র্যাম্পন পরে আছে। কোথেকে পেলো রানার জানা নেই, তবে বুঝতে পারলো প্যাক আইসে নামার সিদ্ধান্তটা তার আকস্মিক নয়, পূর্ব-পরিকল্পিত। চার-

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জুরা মার্কের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে  
আছে। ওয়েছনার আর হোলস্টাড রশি ছাড়ছে ধীরে ধীরে। উদ্বে-  
জিতভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে যাচ্ছে কাইল  
জকোমো, বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তুলেছে মার্ক আর হেলমুট-  
সেনের।

নিচে, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ভাঙা বরফের ওপর দিয়ে এগোচ্ছে  
দু'জন। এদিক ওদিক কাত হচ্ছে এমন একটা ভাসমান বরফের ঢাল  
বেয়ে ওপরে উঠলো তারা, পিছনে সরু লাইন। বরফটার সামনের  
অংশ প্রায় খাড়া, ঢাল বেয়ে ওঠার পর তাদের আর দেখা গেল না।  
এই সময় অকস্মাৎ ফেটে গেল সেটা, উচ্চতা হারালো, পাহাড়ের  
কিনারা থেকে ওরা দেখলো সদ্য বিচ্ছিন্ন একটা টুকরো থেকে আরেক  
টুকরোর লাফ দিচ্ছে হেলমুটসেন। লম্বা হয়ে শুয়ে আছে মার্ক, বরফের  
বিশাল এক অংশের কিনারায় কুলছে তার শরীর, গোটা অংশটাই ধীরে  
ধীরে গুঁড়িয়ে পাউডারে পরিণত হচ্ছে। রানার মনে হলো, আহত  
হয়েছে সে। কিন্তু না, রশিটাকে টেনে নিজের পাশে কুণ্ডলী পাকালো  
সে, তারপর সমস্ত শক্তি এক করে ছোটো একটা বরফ টুকরোর দিকে  
লাফ দিলো, আকারে সেটা ওদের বোটের চেয়ে বড় নয়। দাঁড়িয়ে  
পড়লো, হেলমুটসেনের পিছু পিছু সে-ও লাফ দিয়ে এগোচ্ছে। বর-  
ফের টুকরোগুলো নড়নড়ে, আকারে ছোটো, দাঁড়িয়ে থাকার উপায়  
নেই, পা ঠেকিয়ে সাথে সাথে তুলে নিতে না পারলে পানিতে পড়তে  
হবে।

বিশ ফুটের মতো এগিয়েছে দু'জন, সামনে পাউডারের মতো গিহি  
বরফ 'স্ততি' একটা ফাঁক দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো, পাউডারের ভেতর  
মঝেমধ্যে কালো পানি উকি দিচ্ছে। রশিটা কুণ্ডলী পাকিয়ে লাফ

দিলো হেলমুটসেন, রানার মনে হলো ফাঁকটা পেরিয়ে যাবে সে। কিন্তু পারলো না, ঝপাৎ করে হাঁটু সমান পানিতে পড়ে গেল। ধীরে ধীরে ডুবছে সে। সামনের শক্ত কানিস মাঝে ছ'গজ দূরে, যদিও তার জন্যে ছ'মাইলের কম নয়। কালো পানিতে চিং হলো হেলমুটসেন, সাদা দাড়ির ভেতর তার মুখে কালো একটা গর্ত, কর্কশ গলায় কি যেন বললো সে, কিংবা ব্যথায় চিংকার করে উঠলো। ওরা শুধু মুখ খুলতে দেখলো তাকে, বরফের ভাঙচুর আর বিস্ফোরণের আওয়াধ ছাড়া কিছুই শুনতে পেলো না।

ইতস্তত করলো মার্ক, হেলমুটসেনের দিকে তাকিয়ে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে রশিটা। হঠাৎ সে পিছিয়ে এলো, তারপর ছুটলো সামনে। রানার বাহতে ডেবে গেল মারিকার আঙুলগুলো। এখন মার্ক সম্পর্কে যা-ই ভাবুক সে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত তার জীবনের একটা অংশ ছিলো লোকটা। লাফ দেয়ার পরিবর্তে, অপূর্ব সুন্দর ডাইভ দেয়ার ভঙ্গিতে গোটা শরীর শূন্যে লম্বা করলো মার্ক। ডাইভিং-এর দ্রুতগতি ফাঁকটার অপর-প্রান্তের কিনারায় পৌঁছে দিলো তাকে, কিন্তু ঢাল থেকে পিছলে নেমে এলো শরীরটা। সাতার কাটার ভঙ্গিতে সামনে বাড়ার চেষ্টা করলো সে, দু'হাতের আঙুল দিয়ে বরফ খামচাচ্ছে। শরীরটা পাউডারের ভেতর তলিয়ে গেল না, একটু একটু করে আবার শক্ত কিনারায় পৌঁছলো সে। তারপর আঁচড়াআঁচড়ি করে উঠে পড়লো সরু একটা কানিসে, টেনে তুললো হেলমুটসেনকে। কানিসের ওপর তারা দু'জন সিঁধে হয়ে দাঁড়াতে পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়ানো জুরা উল্লাসে ফেটে পড়লো। নতুন আশা আর প্রাণ-শক্তির প্রতীক তারা। জীবনের প্রতিনিধিত্ব করছে। উল্লসিত লোকগুলোর দিকে ফিরলো মার্ক। সাদা উজ্জলতায় দিনের পর দিন তাকিয়ে থাকায় চোখের দৃষ্টি দুর্বল হয়ে

লড়েছে রানার, তার মুখভাব পরিষ্কার দেখতে পেলো না। মনে হলো, হাসছে মার্ক। অবশ্যই, রানার তার সঙ্গত অধিকার আছে। ক্রুদের উল্লসিত হওয়ারও অধিকার রয়েছে। রানা নিজেও মনে মনে মার্কের প্রশংসা করলো, অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে সে। রানার কানে বোমা ফাটাচ্ছে নিক শেডি। ‘আমাদেরকে বাঙ্গ করছে কুত্তাটা। সে এখন একা। এটাই সে চেয়েছিল।’

ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলো রানা, লিবাটি-ফাইভের ফাস্ট মেট বিসমার্ককে ডাকলো, ভাগাদা দিলো টুলস আর আংকর আনার জন্যে। সেগুলো রশির সাথে বাঁধা হলো, আইসবার্গের কানিস থেকে রশিতে টান দিলো মার্ক আর হেলমুটসেন। পাহাড় আর আইসবার্গের মাঝখানে দু’শো গজ ব্যবধান। রানার কানে চিংকার করলো নিক শেডি, ‘কুত্তাটা আমাদের ফেলে যাবে, দেখবেন!’

‘বোকার মতো কথা বলো না,’ ধমক দিলো রানা। ‘বোট আর রসদ ছাড়া বাঁচবে না সে।’

‘আপনি তাহলে প্রথম দলের সাথে পার হোন।’

রাগের সাথে মাথা নাড়লো রানা। লোডিং প্ল্যান আগেই চূড়ান্ত করা হয়ে গেছে। একটা বোট, রসদ, তারপর বারোজন ক্রু প্রথমে যাবার কথা। পদ্ধতিটা পুনরাবৃত্তি করা হবে, যতোকণ না সমস্ত মাল-সামান ও লোকজন কানিসে স্থানান্তর হয়। রশিটা ওপারে নিয়ে যাওয়ার কাজটা যখন মার্ক করে ফেলেছে, লিভার হিসেবে রানার দায়িত্ব সবার শেষে ক্যাম্প ত্যাগ করা।

হেলমুটসেন আর মার্ক নোঙরগুলো বরফে গাঁথার জন্যে অশ্রুর মতো পরিশ্রম করছে। কাজটা শেষ হতে প্রথম বোটটাকে রশির সাথে ঝুলিয়ে দেয়া হলো। আইসবার্গ ওদের দিকে এগিয়ে আসছে, যাত্রা অন্তত-২



কলে প্রতি মুহূর্তে টিল পড়লো রশিতে, টেনে টান টান রাখতে গিয়ে  
 হিমশিম খেয়ে গেল ক্রুরা। ফাঁকটার মাঝামাঝিতে পৌঁছে নিচে  
 বরফের সাথে বিপজ্জনকভাবে ঘন ঘন বাড়ি খেতে শুরু করলো পৌর  
 কানিসের কাছে পৌঁছানোর ঠিক আগের মুহূর্তে বরফের ভেতর থেকে  
 ছিটকে বেরিয়ে এলো একটা নোঙর। ভাগ্য ভালো যে দ্বিতীয় নোঙর  
 টা ভারটুকু সহ্য করতে পারলো, কানিসের ওপর নিরাপদে পৌঁছে  
 গেল বোট। তবে এই ঘটনা থেকে রানা উপলব্ধি করলো, কানিসের  
 ওপর আরো লোক থাকা দরকার। স্লিং ফিরে আসতেই প্রথম দল  
 টাকে পার হবার নির্দেশ দিলো ও। লোডিং টেবিলে সূপ করা রসদ  
 পয়ের বার যাবে।

স্লিং নিজেদের জড়িয়ে নিচ্ছে ক্রুরা, রানার পাশে এসে দাঁড়ালে  
 এরিকা। 'আপনি ওখানে থাকলে ভালো হতো, স্যার। ওদিকে যদি  
 কোনো গোলমাল হয়, সব ভেস্তে যাবে।'

ধারণাটা পছন্দ না হলেও, সিদ্ধান্ত পাণ্টে প্রথম দলের সাথেই  
 আইসবার্গের কানিসে যাবার কথা ভাবলো রানা। বিসমার্ককে ডেকে  
 পিছনে থেকে যাওয়া দলটার নেতৃত্ব দিতে বললো ও। এখন  
 লোককে সরিয়ে তার জায়গায় বাঁধলো নিজেকে স্লিংয়ের সাথে। সাথে  
 বাকি দুটো নোঙরও নিলো ওরা।

মাত্র এক প্রস্থ টিলে রশির সাথে ঝুলে আলোড়িত প্যাক আইস  
 পেরোনো অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা। ফাঁকটার মাঝখানে পৌঁছলো ওরা,  
 রশি এতোটাই ঝুলে পড়লো যে নিচের সচল বরফের ওপর নাচানাচি  
 শুরু করলো ওদের পা। তবু সব ঠিক ছিলো, বিপত্তি ঘটলো একটা  
 ভাসমান বরফের ওপর দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ সেটা বিক্ষোভিত হও-  
 য়ায়। শেষ প্রান্তে ভর দিয়ে খাড়া হলো সেটা, ওদের মাথা ছাড়িয়ে

উঁচু হলো, মনে হলো রশিসহ ওদেরকে নিয়ে বিধ্বস্ত হবে। ভাগ্য ভালো যে আরেক দিকে কাত হয়ে পড়লো সেটা, সহস্র টুকরোর এক-টাও ওদের কারো গায়ে আঘাত করলো না। নিতম্বে স্নিগ্ধের কামড় আর ব্যথা নিয়ে কানিসে পৌঁছে গেল দলটা।

এরপর মালপত্রের আর লোকজন পার করার কাজটা সহজ হয়ে গেল। একটার বদলে দুটো রশি থাকলো বরফের পাহাড় আর আইসবার্গের মাঝখানে। দ্বিতীয় বোটটা নিরাপদে পৌঁছুলো, পৌঁছুলো তৃতীয় বোটটাও। লোকজনও যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পার হয়ে আসছে। এই সময় রানা লক্ষ্য করলো, রশি দুটোতে টিল পড়ার পরিবর্তে টান টান একটা ভাব। বরফের পাহাড়ে এই মুহূর্তে রয়েছে বিসমার্ক আর লিবার্টি-ফাইভের পাঁচজন ক্রু। দর্শনীয়, কিন্তু অবিশ্বাস্য ও মর্যাদাসিক ঘটনাটা সবাই ওরা চাক্ষুষ করলো। চিৎকার করে উঠলো রানা, কিন্তু বৃথাই। বরফের পাহাড়ে যারা রয়েছে তাদের সাবধান হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আইসবার্গ এগোচ্ছে, তার সাথে পিছাতে শুরু করেছে পাহাড়টা। কিন্তু কারো জানা নেই এরপর কোন দিকে মোড় নেবে ঘটনা।

স্নিগ্ধ ফেরার জন্যে অপেক্ষা করেছে বিসমার্ক আর তার দল। হঠাৎ বরফের পাহাড়টা উল্টে যেতে শুরু করলো। চার কি পাঁচ সেকেন্ড লাগলো, দ্রুতবেগে উল্টে গেল পাহাড়টা। মাথায় দাঁড়ানো লোকগুলো আতংকিত দৃষ্টিতে রানাদের দিকে তাকিয়ে থাকলো, শুয়ে পড়ে বরফ ঝাঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলো তারা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ডিগবাজি খাওয়ার ভঙ্গিতে আরেকদিকে কাত হলো পাহাড়, লোকগুলোকে নিয়ে সমতল চূড়াটা অদৃশ্য হলো ওদের কাছ থেকে দূর প্রান্তে।

মারিকা হুঁপিয়ে কঁদে ওঠার আগেই কাঁধে হাত রেখে তাকে নিজের দিকে টানলো রানা। আড়ষ্ট শরীর থরথর করে কাঁপছে তার। এখনো ডিগবাজি খাচ্ছে বরফের পাহাড়। আবার যখন চূড়াটা ওর দেখতে পেলো, সমতল বরফ সম্পূর্ণ খালি। ছ'জন লোকের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। কয়েকবার ডিগবাজি খাওয়ার পর বিচ্ছিন্ন হলো সেটা। চারদিকের কামান দাগার শব্দকে ছাপিয়ে উঠলো নিকোরায়ে'র আওয়াজটা। একটা অপরাধবোধে জর্জরিত হলো রানা, শেষ দলের সাথে থাকার কথা ছিলো ওর-ও। কাজটা যদি আরো কয়েক মিনিট আগে শুরু করা হতো, ছ'জন লোককে মরতে হতো না। তবে, সেই সাথে উপলব্ধি করলো রানা, মন খারাপ করার সময় নয় এটা। অনেক কাজ হাতে, নতুন ক্যাম্প তৈরি করতে হবে।

আইসবার্গের সন্ন্যাস, এবড়োখেবড়ো কানিস কেটে চওড়া ও ময়লা করার জন্যে বারোজন লোককে লাগানো হলো, পথটা তৈরি হলে বোটগুলোকে টেনে যতোটা সম্ভব ওপরে তোলা হবে। রানা ঘুরতেই দেখলো, ওর দিকে এগিয়ে আসছে মার্ক। কানিসে পৌঁছার পর তার অস্তিত্ব খেয়াল করেনি রানা। কাছ থেকে দেখে বোঝা গেল, মার্ক চোখের আঁড়িতে নতুন আত্মবিশ্বাসের আমদানী ঘটেছে। সম্পূর্ণ না হলেও, অনেকটাই যেন বদলে গেছে সে। চোখে নেশাখোরের দৃষ্টি অহংপন্থিত, সরাসরি এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়ালো সে, বুক টান টান করে। 'তোমার সাথে আমার কথা আছে, রানা,' বললো সে, বলার সুরে স্পষ্ট কর্তৃত্বের ভাব। গলা চড়িয়ে কথাটা বললো সে, আশপাশ থেকে অনেকেই কাজ ফেলে ওদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো।

'বলো।'

'ভবিষ্যতে তুমি আমার হবু-জীর কাছে ঘেঁষবে না,' হিসহিস করে

উঠলো মার্ক ।

‘মারিক! তোমাকে বিয়ে করতে রাজি নয়,’ বললো রানা । ‘তাছাড়া, কার কাছে ঘেঁষবে বা ঘেঁষবে না সেটা মারিকার ব্যক্তিগত ব্যাপার ।’  
চেটে করলো রাগটুকু চেপে রাখতে ।

‘আগি তোমাকে অর্ডার করছি!’ চিৎকার করলো মার্ক ।

‘বাচতে চাইলে কাছে হাত লাগাও, মার্ক,’ শান্ত সুরে বললো রানা । ‘আমার সাথে লাগতে এসো না, হাত-পা ঝুঁড়িয়ে দেবো ।  
তুমি জানো, তা আমি পারি ।’

নিঃশব্দ হাসির সাথে হঠাৎ মাথা নাড়লো মার্ক । তার চোখে কিসের যেন উত্তেজনা । ‘তুমি এখানে অর্ডার করার কেউ নও, রানা ।’  
একটু থেমে আবার বললো, ‘মিঃ রানা, মিঃ মাসুদ রানা । প্লিজ, ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো । সাত্তিক মারা যাবার পর নেতৃত্ব আমার হাতে চলে এসেছে ।’ ঝট করে লোকজনের দিকে ফিরলো সে, সবাই ওদের দিকে তাকিয়ে আছে । ‘আমার বাবার অনুপস্থিতিতে অবশ্যই আমি তার ডেপুটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবো । কমাণ্ডার হিসেবে কুশিটা আমিই পার করে এনেছি । মাসুদ রানা, সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড হিসেবে, শেষ দলের সাথে আসবে, সেই নির্দেশই দিয়েছিলাম আমি । কিন্তু...’ কাঁধ ঝাকালো মার্ক । ‘কিন্তু সে আমার নির্দেশ অমান্য করেছে ।’ রানার দিকে ফিরলো সে । ‘নতুন লোক হিসেবে, তুমি অনভিজ্ঞ, এ-ধরনের পরিস্থিতি সামলানো তোমার কর্ম নয় ।’  
রানাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ ঘুরলো সে, স্থির দাঁড়িয়ে থাকা জুদের দিকে এগোলো । তার হাঁটার ভঙ্গিতে অদ্ভুত এক দৃঢ়তা ।

## সাত

কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো রানা। ঘটনার অসম্ভব ও আকস্মিক মোড় পরিবর্তনে স্তব্ধ হয়ে গেছে ও। ভাবলো, নিক শেডি ঠিকই বলেছিল। নিজের আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে মার্ক। বোনার পাইটনের মৃত্যু, ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে লিবার্টি-ফোরকে ধাক্কা দেয়া—সব সে ভুলে গেছে। লোকটা যে মাত্রা ছাড়িয়ে বিপজ্জনক, এটা বুঝতে না পারায় নিজেকে ধিক্কার দিলো রানা।

কতৃষ্ণের সুরে, চিৎকার করে ক্রুদের নির্দেশ দিচ্ছে মার্ক। রানা নিজের বিস্ময় ও হতভম্ব ভাবটা ক্রুদের চেহারাতেও দেখতে পেলো ও। তবে আশপাশের বৈরী প্রকৃতির ভয়াবহ রূপ আচ্ছন্ন করে রেখেছে ওদেরকে। যে-কোনো লিডারকে অনুসরণ করবে তারা, নেতৃত্ব সে দিতে পারলেই হলো। এখনই সময়, তা না হলে পরিস্থিতিটা নাগালের বাইরে চলে যাবে, বুঝতে পেরে একাই সামনে এগোলো রানা, জানে কাজটা বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে। ও এগোচ্ছে, শুনতে পেলো হেলমুটসেন আর ডানকানকে মেট হিসেবে বহাল করলো মার্ক। কি যেন একটা নির্দেশ দিলো সে, কাকে যেন গ্রেফতার

করতে বললো—সম্ভবত রানাকে। লোক দু'জন ইতস্তত করছে,  
ডাকালো রানার দিকে। ঘুরলো মার্ক।

তার চেহারায় হিংস্র মারমুখো ভাব। শান্ত দৃঢ়তার সাথে তাকে  
নির্দেশ দিলো রানা, 'প্যাকিং কেসটা তোলো, মার্ক। সরিয়ে আরো  
খানিক ওপরে রেখে এসো। দিস ইজ অ্যান অর্ডার।'

এক চুল নড়লো না মার্ক, তার ঠোটে ব্যঙ্গাত্মক হাসি লেগে  
রয়েছে। 'মানলাম না তোমার অর্ডার, দেখি কি করতে পারো তুমি  
আমার।'

'স্যার,' পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ওয়েজনার। 'আপনি অর্ডার দিন,  
ওকে আমরা গ্রেফতার করি।'

একটা হাত তুলে তাকে থামালো রানা। মার্ককে বললো, 'মার্ক  
রোসেট, তোমার বিরুদ্ধে বোনার পাইটনকে খুনের অভিযোগ আছে।  
লিবার্টি ফোরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়েছো তুমি,  
যার ফলে দু'জন লোক সাথে সাথে মারা গেছে—বাকি আমরা সবাই  
মারা যেতে পারি। বন্দরে কেবলমাত্র তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে  
দেয়া হবে।'

মুহূর্তের জন্যে মার্কের চেহারায় উদ্ভূত একটা ভাব দেখা গেল। কিন্তু  
তারপরই হাসলো সে। 'কৌশল করে কোথাও তুমি পৌছতে পারবে  
না, রানা,' বললো সে। 'প্রথমে তুমি আমার হবু-স্ত্রীকে চুরি করার  
চেষ্টা করেছো, এখন তার মাধ্যমে চেষ্টা করছো কোম্পানীটা দখল  
করতে।'

'কথা না শুনলে তোমাকে আমি শুনতে বাধ্য করবো,' কঠিন সুরে  
বললো রানা, মার্কের দিকে এগোলো। রানাকে এগোতে দেখে শক্ত  
হলো মার্ক, মনে হলো লড়তে রাজি আছে সে। খয়েরি দাড়ির ভেতর তার

মুখ হস্তশূন্য লাগলো। চোখ দুটো এদিক-ওদিক দ্রুত ঘুরছে। তারপর হঠাৎ ঘুরলো সে, পিছলে নামতে শুরু করলো। কানিসের ঢাল বেয়ে। এই পরিস্থিতিতে ধাওয়া করে কাউকে ধরা ক্রুদের মনে বিরূপ প্রতি-  
ক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে জেনেও, মার্ককে স্বেচ্ছাচারী হতে না দেয়ার  
ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রানা। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো ও। কয়েক  
ফুট নেমে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো রানা। ক্রুদের কিছু  
বলার জন্যে, এই সময় ওকে সতর্ক করে দিয়ে চিৎকার করে উঠলো,  
নিক শেডি। ঝট করে মার্কের দিকে ঘুরলো রানা। খোলা একটা  
প্যাকিং কেস থেকে রাইফেল তুলে নিচ্ছে মার্ক।

দুটে এলো হোলস্টাড আর ওয়েজনার, কিন্তু রানার পাশে পৌঁছেই  
থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো তারা। রাইফেল কক করে ওদের তিনজনের  
দিকে তুললো মার্ক। হাসছে সে। রানার পিছন দিকে একটা গুলির  
আওয়াজ হলো। ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেলো, নিক শেডির সাথে  
যজ্ঞাধস্তি করছে হেলমুটসেন। নিক শেডির হাত ধরে মোচড় দিলো  
হেলমুটসেন, মুঠো থেকে পিস্তলটা খসে পড়লো। শক্ত বরফে ঠক ঠক  
আওয়াজ করে কানিসের কিনারা থেকে অদৃশ্য হলো সেটা।

কানিসের ঢাল বেয়ে উঠে আসছে মার্ক, রানা সহ লিবার্টি-ফোরের  
বাকি দু'জন পিছু হটতে বাধ্য হলো। ভারি খুশি মার্ক। তার হাঁটার  
ভঙ্গি আর চোখের দৃষ্টিতে বিজয়ী বীরের উল্লাস। ক্রুদের সবাইকে  
রাইফেলের নলের সামনে জড়ো করলো সে। ক্রুরা কেউ ইতস্তত  
করলো না। তার চোখ সরু আর দৃষ্টি ঠাণ্ডা। রাইফেলটা যে ভঙ্গিতে  
ধরে আছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না, প্রয়োজনে ব্যবহার করতে বিধা  
করবে না।

হেলমুটসেন আর ডানকানকে কাছে ডাকলো সে। অনিশ্চিত

ভসিঙে ইতস্তত করলো তারা, তবে শেষ পর্যন্ত এগোলো। এরপর বাকি সব লোককে তার দলে যোগ দেয়ার নির্দেশ দিলো মার্ক। নর-ওয়ের ভাষায় কথা বললো সে। জুগা রানার দিকে তাকালো, তারপর নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করলো।

‘মার্ক ওদেরকে বলছে, লিডার একজন থাকাই নিরাপদ,’ রানাকে তরজমা করে শোনালো মারিকা। ‘বলছে, আইন অনুসারে সে-ই ওদের লিডার, তার নির্দেশ অমান্য করা হলে মিউটিনি-র অভিযোগ আনা হবে।’

জুদের উদ্দেশ্যে কথা বলার জন্যে ফিরলো রানা, কিন্তু এরিকা ওর হাত ধরে টান দিলো। রানার উদ্দেশ্যে চিৎকার করছে মার্ক, কাঁধে রাইফেল ঠেকিয়ে সরাসরি ওর দিকে লক্ষ্যস্থির করছে সে।

‘কিছু বলো না, রানা,’ মিনতি করলো মারিকা। ‘গুলি করবে ও। অস্থির হয়ে না, প্রচুর সময় পাবো আমরা।’

নিক শেডি, রানার পিছন থেকে বললো, ‘ওর কাছ থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিতে হবে।’

ওরা যখন ইতস্তত করছে, এক কি দু’জন লোক ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো। আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সবাই তারা দল বদল করবে। তাদের একজন লিডার দরকার। মার্কের হাতে রাইফেল রয়েছে, রয়েছে ব্যবহার করার ব্যাকুলতা। তা সত্ত্বেও, মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো রানা। মার্ককে যদি নিরস্ত্র করতে পারে ও, হেলমুটসেন আর ডানকানকে কাবু করা কঠিন হবে না। আর, ও যদি মার্কের গুলিতে মারাও যায়, লিবার্টি-ফোরের জুগা তাকে নিরস্ত্র করতে পারবে।

তিন ফুটও নামেনি রানা, স্যাং করে ওকে পাশ কাটিয়ে নিচে নেমে যাওয়া অশুভ-২



গেল এরিকা পিটারসেন। ঢাল বেয়ে তখনো নামছে লোকগুলো, তাদের সামনে পৌছে ছ'দিকে হাত লম্বা করে বাধা দিলো সে, তাঁর ভৎসনার স্বরে নরওয়ে ভাষায় কি যেন বলছে, মার্কের দিকে পিছন ফিরে। দাঁড়িয়ে পড়লো লোকগুলো। রানা ধারণা করলো, প্রকৃত ঘটনা ব্যাখ্যা করছে এরিকা। রাগে ঘোঁং ঘোঁং করে উঠলো লোকগুলো।

মার্কের দিকে তাকালো রানা। সে তার রাইফেল নামিয়ে নিয়েছে। এইটুকু বুদ্ধি এখনো তার ঘটে আছে যে এরিকাকে এখন যদি সে খুন করে, ক্রুরা তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে। তবে ঢাল বেয়ে উঠে আসছে সে, রাগে টকটকে লাল হয়ে আছে মুখ। এরিকাকে সাবধান করে চিৎকার করলো রানা। কিন্তু কোনো দিকে না তাকিয়ে কথা বলে চলেছে সে। খালি হাতটার কিনারা দিয়ে তার ঘাড়ের ওপর প্রচণ্ড জোরে মারলো মার্ক। আত্ননাদ করে উঠে ছুটলো নিক শেডি। ধপ করে তাকে ধরে ফেললো মারিকা, কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো সে। পাগলের মতো চিৎকার ছেড়ে মার্কের ওপর লাফিয়ে পড়লো নিক শেডি।

তৈরি ছিলো মার্ক, নিক শেডি শূন্যে থাকতেই রাইফেলটা তার পেট লক্ষ্য করে ধরে রাখলো। তলপেটে ব্যারেলের গুঁতো খেয়ে বরফের ওপর পড়ে ভাঁজ হয়ে গেল নিক শেডির শরীর। ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছিলো সে, একটা পা বাড়িয়ে তার পতন ঠেকালো মার্ক। চিৎকার করে বললো সে, 'এই কাজটা করার ইচ্ছে আমার বহুদিনের, আজ সুযোগ পেয়েছি।' রাইফেলের বাঁটটা নিক শেডির মুখ লক্ষ্য করে তুললো সে। তারপর নামিয়ে আনলো। চোখে আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়েও সেটাকে নেমে আসতে দেখলো নিক শেডি, সময় মতো সরে

মাওয়ায় কাঁধের ওপর পড়লো বাঁটটা। এরপর ঝেড়ে তার পাঁজরে কয়েকটা লাথি মারলো মার্ক। কুকড়ে ছোটো হয়ে গেল নিক শেডি। তার দুর্বল শরীর থেকে যন্ত্রণাকাতর একটি আওয়াজও বেরলো না। রাইফেলটা আবার ঢালের ওপর দিকে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের দিকে তাক করলো মার্ক, কাউকে এগোতে দেখলে গুলি করবে। নিঃশব্দে হাসছে সে।

না তাকিয়েও অনুভব করলো রানা, ওর পাশে শিউরে উঠলো মারিকা। আসল চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে মার্ক রোসেট। এই মার্ককে চেনে সে, যে লোক নাৎসীদের আদর্শে বিশ্বাস করে, অসহায় মেয়েদের ওপর যৌনঅত্যাচার চালাবার পর হাসতে হাসতে, একটু একটু করে মেরে ফেলে। নিক শেডির অজ্ঞান শরীরে মার্ক লাথি মারছে দেখে রানা উপলব্ধি করলো, কেউ ওরা প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না, যদি না তার আগে মার্ককে ওরা খুন করতে পারে। নিজের ওপর প্রচণ্ড ক্রোধে কাঁপতে থাকলো রানা। কী কক্ষণেই লিবার্টি-থিুর বোটগুলো আনতে গিয়েছিল ও।

আবার জুদের উদ্দেশ্যে কথা বলতে শুরু করলো মার্ক।  
 'জুদের বলছে, আমাদের যেন ত্যাগ করে তারা,' ভরজমা করলো মারিকা। এক সেকেণ্ড থেমে আবার বললো সে, 'রানা, দায়িত্ব এখন তোমার কাঁধে। যেভাবে পারো, থামাও ওকে। আমরা যদি কিছু একটা না করি, ওরা আমাদের ত্যাগ করবে।'

কিন্তু রানা ভাবলো, ওর কথা জুদের ওপর তেমন কোনো প্রভাব না-ও ফেলতে পারে। শত হলেও, সে একজন বহিরাগত। 'তুমি কথা বলো, মারিকা,' বললো ও। 'ওরা সবাই টনসবার্গের লোক। তোমার বাবার মৃত্যু সম্পর্কে সব কথা ব্যাখ্যা করে বলো ওদেরকে।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে সামনে এগোলো মারিকা। কাছটা তার জন্যে কঠিন, রানা জানে। মার্ক রোসেটের সাথে তার বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে আছে, সাধারণ জুরা এখনো কেউ জানে না নিজেদের সিদ্ধান্ত পাল্টেছে মারিকা। তাকে এখন বলতে হবে তার হবু-স্বামী মার্ক রোসেট তারা বাবাকে খুন করেছে। কথা বলতে শুরু করলো মারিকা, বরফের গর্জন সত্ত্বেও তার কণ্ঠ স্পষ্ট শোনা গেল। কয়েক মুহূর্ত মারিকা আর মার্ক একযোগে কথা বলে গেল। রানার নামে যা-তা বলে চলেছে মার্ক। কিন্তু একটু পরই জুরা মারিকার কথায় মন দিলো। ইতস্তত ভাব নিয়ে চুপ করে গেল মার্ক। অর্বাচীন বালকসুলভ গৌরাত্ম্যের ভাব অদৃশ্য হলো তার চেহারা থেকে। অস্বস্তির সাথে একবার জুদের দিকে, একবার মারিকার দিকে তাকালো সে। লোক-জনের ভেতর থেকে চাপা গর্জন উঠতে শুরু করায় রাইফেলটা আরো শক্ত করে ধরলো।

তারপর হঠাৎ হংকার ছাড়লো সে, লোকজনকে তার দলে ভেড়ার আদেশ করলো। নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করলো জুরা, অনেকেই দ্বিধায় ভুগছে। সবাই এক সময় চুপ হয়ে গেল। আবার আশঙ্ক করলো মার্ক। কিন্তু কেউ নড়লো না। 'ঠিক আছে,' ইংরেজিতে চিৎকার করলো সে। 'যা ভালো বোঝো তাই করো তোমরা। রানার সাথে থাকো, তারপর দেখো কোথায় নিয়ে যায় সে তোমাদের।' রানার দিকে ফিরলো। 'ওদের নিরাপত্তার দায়িত্ব এখন তোমার ওপর, রানা।' বুটের ডগা দিয়ে কানিসের বরফে একটা দাগ কাটলো সে। 'তোমরা এই দাগের ওপর দিকে ক্যাম্প ফেলবে। বিদ্রোহী জুদের কেউ এই দাগ পেরুলেই তাকে গুলি করা হবে। বুঝতে পারছো? তোমাদেরকে তাঁবু আর রসদ দেয়া হবে। সারাদিনে একবার, দুপুরবেলা,

রেশন সংগ্রহের জন্যে একজনকে পাঠানে তুমি । ওকোমো ।’

খাটো আপানী ফটোগ্রাফার প্রায় চমকে উঠে শিরদাঁড়া খাড়া করলো । ‘ইয়েস, মিঃ রোসেট ।’

‘আপনি রাঁধতে পারেন ?’

‘আমি ? রাঁধতে ?’ একটা ঢোক গিললো কাইয় ওকোমো । ‘দেখুন, আমি একজন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার, ঠেকায়-বেঠেকায় কখনো যে রান্না করিনি তা হয়তো নয়, কিন্তু... ।’

‘অফিসারদের কুক করা হলো আপনাকে,’ ঘোষণা করলো মার্ক ।

‘নিচে গিয়ে হেলমুটসেনকে রিপোর্ট করুন । তোমরা বাকি সবাই কানিসের ওপর দিকে, দাগের ওদিকে উঠে যাও ।’ রাইফেল তুলে ছমকি দেয়ার ভঙ্গি করলো সে । ‘যাও, যাও ।’

‘বোটগুলো কি হবে ?’ জিজ্ঞেস করলো রানা ।

রানার মুখের ওপর বিজয়ীর হাসি ছুঁড়ে দিলো মার্ক । ‘বোটগুলো আমার কাছে থাকবে, রানা । তোমার হয়ে ওগুলো রক্ষা করবো আমি ।’ এরপর মারিকার দিকে তাকালো সে । ‘ভেবো না তোমার ওপর আমার দাবি আমি ছেড়ে দিয়েছি । তবে আপাতত তোমাকে আমি তোমার বয়স্ক্রেণের সাথে থাকতে দিচ্ছি । আরো কিছু কলংকের জন্ম দাও ।’

উত্তরে কিছু না বলে তার দিকে পিছন ফিরলো মারিকা । নড়ে উঠলো এরিকা, জ্ঞান ফিরে আসছে তার । ধীরে ধীরে উঠে বসলো সে । ঘাড়টা এক হাতে ডলতে ডলতে ঠাঁড়ালো । দু’জন লোকের সাহায্য নিয়ে নিক শেডিকে বরফ থেকে তুলে নিলো রানা । তারও জ্ঞান ফিরে আসছে । দুর্বল লোকটার ওপরের ঠোঁট ফুলে আছে, ইকি খানেক চামড়া উঠে গেছে ডান হাতের । বাকি ত্রুনা এরইমধ্যে কানি-

সের ওপর দিকে উঠতে শুরু করেছে, ওরা তাদের পিছু নিলো।

লোকজনদের খেলিয়ে তোলার কোনো কুঁকি মার্ক নিলো না। প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাবু আর রসদ হস্তান্তর করলো সে। ভালো জিনিসগুলো নিজের জন্যে রাখলো, তবে যা দিলো ওদের জন্যে তা পরিমাণে কম নয়। রানার দল এরইমধ্যে বরফের মেঝে সমতল করে নিয়েছে, কানিসের গিছন দিকের পাঁচিল খুঁড়ে খানিকটা অতিরিক্ত আশ্রয়ের ব্যবস্থাও করা হলো। ঝড় শুরু হলে গা-বাঁচানোর একটা উপায় করা থাকলো।

বেলা যতোই চড়লো, মারিকাকে নিয়ে ততোই উদ্বেগ বোধ করলো রানা। ওর সাথে মাত্র একবার কথা বললো সে, অভিযোগের শুরুরাইফেলটাকে ভয় পেয়ে মার্কের বিরুদ্ধে কিছু না করা রানার বোকামি হয়ে গেছে। ঐ অবস্থায় ওর কিছুই করার ছিলো না, এ-কথা বোঝাবার জন্যে রানা মুখ খুলতেই রাগের সাথে ঘুরে অন্যদিকে সরে গেল সে।

মারিকা আর এরিকার জন্যে আলাদা একটা তাঁবু বরাদ্দ করা হলো। সেটা খাটানো হতেই হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকলো মারিকা। সেদিনের মতো সেই তাকে শেষ দেখা রানার। একবার, তাঁবুটার পাশ দিয়ে যাবার সময়, তার ফৌপানোর আওয়াজ পেলো রানা। দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করলো ও, ভাবলো ভেতরে ঢুকে সান্দ্রনা দেবে কিনা। এই সময় একজনের ডাক শুনে সরে আসতে হলো ওকে। কানিসের ওপর তাঁবু খাটানোর কাজটা অত্যন্ত কঠিন আর পরিশ্রম সাপেক্ষ, রানার সমস্ত সময় আর মনোযোগ কেড়ে নিলো। মারিকাকে নিয়ে দুশ্চিন্তাটা মনের কোণে থাকলেও, কিছু করার উপায় থাকলো না।

রাত্রে, খাওয়াদাওয়া শেষে, নিঃশব্দে তাঁর ঘরে নিক শেডি, হোল-  
কট আর ওয়েডনারের সাথে কথা বলছে রানা, হামাগুড়ি দিয়ে  
বেতরে ঢুকলো এরিকা। 'স্যার, কি ভাবছেন আপনি?'

'এখনি কিছু করার কথা ভাবছি না,' বললো রানা।

'কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না। একটা কিছু...'

'সময় হোক,' জবাব দিলো রানা। নিক শেডির পাশে বসলো  
এরিকা, রানা দেখলো ছ'জন ছ'জনের হাত ধরে আছে। মারিকার  
কথা মনে পড়লো ওর। জিজ্ঞেস করলো, 'মারিকা কেমন আছে?'

'মন খারাপ।' আধো অন্ধকারে রানার দিকে ভালো করে তাকা-  
বার চেষ্টা করলো এরিকা। 'আপনার সাথে তাকে জড়িয়ে মার্ক অশ্লীল  
ইজিত দেয়ার প্রচণ্ড রোগে আছে বেচারি। তার বিশ্বাস, ব্যাপারটা  
আপনার সহ্য করা বা মেনে নেয়া উচিত হয়নি। আপনি প্রতিবাদ  
বা কোনো বিহিত না করায় মারিকার মর্মান্বাহানি ঘটেছে। এটা  
অবশ্য মারিকার ধারণা, আমার নয়। তবে, একটা ব্যাপারে মারিকার  
সাথে আমি একমত। গোটা দলের নেতৃত্ব আপনার হাতে থাকা  
উচিত। অর্থাৎ মার্কের বিরুদ্ধে একটা কিছু করা দরকার আপনার।'

'ওদের সাথে আমি একমত,' বললো নিক শেডি। 'মার্ক অপরাধী,  
তাকে আপনি বাঁচিয়েছেন, অথচ সে-ই এখন সবার মাথার ওপর হুড়ি  
ঘোরাচ্ছে!'

'বেশ, তাহলে তোমরাই বলো, মার্কের কি ব্যবস্থা করবো আমি?'

মুহূর্তে প্রশ্ন করলো রানা। 'তিনটে রাইফেলই ওর কাছে, সাথে  
আর এক হাজার রাউণ্ড অ্যামুনিশন। রাত অন্ধকার নয় যে অতক্রিতে  
হামলা করে ওগুলো আমরা তার কাছ থেকে কেড়ে নেবো। তাছাড়া,  
ক্রুদের কথা ভাবো। অনেকদিন পর এই প্রথম নিরাপদ আশ্রয়

পেয়েছে তারা, পেটও খালি নয়, তিনটে রাইফেলের বিরুদ্ধে কুঁকি  
নিতে তারা রাজি হবে বলে মনে হয় না। রসদ কমুক, তারা বেপরোয়া  
হয়ে উঠুক, তখন একটা কিছু করার কথা ভাবা যাবে।’

‘তখন হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে,’ বললো এরিকা। ‘পরের  
ঝড়ে এই আইসবার্গটা হয়তো প্যাক ভেঙে বেরিয়ে যাবে, বোট নিয়ে  
পালার স্থযোগ পাবে মার্ক। একা বাঁচতে পারাটাই তার শাস্তি  
এড়াবার একমাত্র উপায়।’ এ যেন এরিকা নয়, কথা বলছে নিক  
শেডি।

‘রসদ দখল করার জন্যে বা অন্য কোনো কারণে এতোগুলো  
লোককে আমি বিপদে ফেলতে পারি না,’ বললো রানা। ‘এ-সব  
নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তোমরা সবাই ঘুমোতে যাও।’ কক্ষের নিচে  
মুখ ঢোকালো ও।

‘আইসবার্গের কানিসের ওপর ওদের দিন বয়ে চললো। প্রতিটি  
দিন প্রায় একই রকম, বদল হলো শুধু বাতাসের গতি আর ঠাণ্ডার  
প্রচণ্ডতা। রানার জন্যে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে নিঃসঙ্গতার ভেতর  
অপেক্ষায়। ওর হাতে নেতৃত্ব থাকলেও, বিশেষ করে লিবার্টি-থ্রু  
ক্রুদের ওপর ওর তেমন কোনো প্রভাব নেই। লিবার্টি-ফাইভের  
লোকজন অবশ্য রানার প্রতি বিশ্বস্ত থাকলো, কৃতিত্বটা মারিকার।  
ক্রুরা সবাই জানে, পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর চেয়ারম্যান ওয়া-  
কার রোসেট আর তার ছেলে। মালিকানায় পরিবর্তন ঘটেছে বললেও  
তারা কতোটুকু কি বিশ্বাস করবে বলা কঠিন। কাজেই দল ছেড়ে  
ভাদের মার্কের সাথে যোগ দেয়ার ভয়টা সব সময়ই থাকলো। ভয়ের  
মাত্রাটা বাড়তে লাগলো মার্ক রেশনের পরিমাণ কমিয়ে দিতে শুরু  
করায়। প্রথমে কোনো রকমে বেঁচে থাকার মতো, তারপর আরো কম

রেশম বরাদ্দ করলো সে। একই খাবার, অল্পটর শিকার হলো জুরা।  
 তখু রসদ নয়, বোটগুলোও রয়েছে মার্কের কাছে। রসদ আর বোট  
 বেঁচে থাকার আশা আর নিরাপত্তার প্রতিনিধিত্ব করছে। কাইমু  
 একোমোর কাছ থেকে জুরা জানতে পারলো, প্রতিপক্ষের ক্যাম্পে  
 খাবারদাবার আর তামাক দরাজ হাতে বিলি করা হচ্ছে। লোভের  
 বশে বা ষোঁকের মাথায় যদি একজন লোকও দাগ পেরিয়ে ওদিকের  
 ক্যাম্পের দিকে রওনা দেয়, যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো সবাই তাকে  
 অহুসরণ করবে। রানার নির্দেশগুলো দিনে দিনে যতোটা না নির্দেশ,  
 তারচেয়ে অহুরোধের পর্যায়ে নেমে এলো। ওদিকে নিজের তাঁবু থেকে  
 ভুলেও একবার বেরুলো না মারিকা, রানার সাথে কথা বলতেও  
 অস্বীকৃতি জানিয়েছে সে।

মারিকা ও নিক শেডিকে নিয়ে হুশিচুস্তা বাড়লো রানার। কাজে  
 মন নেই নিক শেডির, কাউকে কোনো সাহায্য করলো না। সে-ও  
 খুব কম বেরুলো তাঁবু থেকে, কুৎসিত চেহারায় গভীর চিন্তার ছাপ।  
 কোথেকে কে জানে লম্বা আর চ্যাপ্টা একটা লোহার রড যোগাড়  
 করেছে সে, তাঁবুতে বসে তার কাজই হলো ফাইল দিয়ে ঘষে সেটাকে  
 ধারালো করা। তার এই আচরণ রানার স্মারক ওপর যেন হাতুড়ির  
 বাড়ি মারতে লাগলো। নিষেধ করা সত্ত্বেও ক্ষান্ত হলো না সে।

অবশেষে তাকে কড়া ধমক লাগালো রানা। ‘থামবে তুমি!’

রানার দিকে একবার তাকালো নিক শেডি, পরমুহূর্তে আবার শুরু  
 করলো নিজের কাজ। কন্ডল থেকে মুখ আর হাত বের করে ছুঁচালো  
 রডটা তার হাত থেকে কেড়ে নিলো ওয়েজনার, ফেলে দিলো তাঁবুর  
 বাইরে। ‘আমরা ঘুমোতে চাই, বুঝলেন?’

কিছু বললো না নিক শেডি, কিন্তু সেদিন গভীর রাতে ফাইল ঘষার  
 যাত্রা অন্ত-২



শক্ষে ঘুম ভেঙে গেল রানার। মাথায় রক্ত চড়ে গেল ওর। খুন এক-চোট গালমন্দ করলো। চুপ করে শুনলো নিক শেডি, তারপর রানা খামতে জিজ্ঞেস করলো, 'মার্ক যদি আপনার বাপকে খুন করতে, আপনি কি করতেন?' রানা কোনো জবাব দিচ্ছে না দেখে নিচু গলায় বিড়নিড় করে তার জীবনে বোনার পাইটনের ভূমিকা আর অবদানের কথা বলতে শুরু করলো সে।

জাহাজ থেকে ফিরে প্রথমেই নিক শেডিকে বোডিং হাউসে দেখতে যেতেন তিনি। অবৈধ সম্ভান, কিন্তু একজন বাপ তার বৈধ সম্ভানের জন্যে যা করে বোনার পাইটন নিক শেডির জন্যে তারচেয়ে কম কিছুই করেননি। হাতে কখনো নগদ পরসাদ দেননি ছেলেকে, কিন্তু তার কোনো শখ-সাধ অপূর্ণ রাখেননি। আঠারো বছর বয়সে নিক শেডিকে একটা বোট কিনে দেন তিনি। একবার তিনি তাকে সাউথ জর্জিয়াতেও নিয়ে গেছেন। লেখাপড়ার ব্যাপারে তাকে উৎসাহ দিয়েছেন, খরচ চালিয়েছেন, কিছু সম্পত্তিও কিনে দিয়েছেন ইংল্যান্ডে। সবশেষে সে বললো, 'জানেন, তার সাথে আমার সম্পর্কটা ছিলো বন্ধুর মতো। আপনি ভেবেছেন, আমার বাপ খুন হওয়ার পর আনন্দ কি কর্তব্য আমি জানি না? সেদিন হেলমুটসেন বাধা না দিলে ঠিকই আমি মার্ককে কুকুরের মতো গুলি করে মারতাম। হেলমুটসেন এখনো আমার কাজে একটা বাধা। যদি দেখি উপায় নেই, ওদের দু'জনকেই আমার খুন করতে হবে।'

কম্বল সরিয়ে উঠে বসলো হোলস্টাড। 'শ্লিঙ্গ, আপনি এবার একটু খামবেন, ডঃ শেডি?'

কিন্তু তার কথায় কান দিলো না নিক শেডি। খুন করবো, মার্ককে খুন করবো, অনন্তকাল ধরে এই একটা কথাই ইনিয়োর বিনিয়োর বলে

চললো সে। তার একঘেয়ে কথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লো রানা,  
ঘুম ভাঙলো ফাইলের শব্দে।

অগত্যা এরিকাকে সব কথা খুলে বললো রানা। কিন্তু এরিকা  
ভাবতে আসছে বুঝতে পেরে লোহার রডটা লুকিয়ে ফেললো নিক  
শেডি। 'জিনিসটা কোথায় লুকালে, নিক?' শাস্ত শুরু জিজ্ঞেস  
করলো এরিকা। 'দাও, বের করে দাও আমাকে।'

রডটা হাতছাড়া করার কোনো ইচ্ছে নেই, আবার এরিকার কথা  
অমান্য করাও নিক শেডির জন্যে অসম্ভব। দোটানায় পড়ে ঘামতে  
শুরু করলো সে। আরেকবার রডটা চাইলো এরিকা। ভাবাবেগে  
নিক শেডির চেহারা এমন হলো যেন এখুনি সে ভেউ ভেউ করে কেঁদে  
ফেলবে। কক্ষের দিকে একবার তাকালো সে, ওখানেই রডটা লুকিয়ে  
রেখেছে। হাঁটু গেড়ে বসলো এরিকা, কক্ষের দিকে হাত বাড়ালো।  
ঝট করে ভেতরে হাত গলিয়ে রডটা বের করে আনলো নিক শেডি।  
তার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিলো এরিকা। বাচ্চা ছেলের হাত থেকে  
প্রিয় খেলনা কেড়ে নিলে যা হয়, কেঁদে ফেললো নিক শেডি। এরি-  
কার হাত থেকে প্রায় ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিলো রডটা ওয়েজনার, ছুঁড়ে  
সেটা কানিস থেকে ফেলে দিলো নিচের প্যাক আইসে। কিন্তু পরদিন  
আরেকটা রড যোগাড় করে সেটার ওপর কাজ শুরু করলো নিক  
শেডি। বরফ বিক্ষোভের গর্জন, শীত, থিদে, আর উদ্বেগে এতোই  
নির্জীব আর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওরা যে ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা  
ঘামাবার উৎসাহ পেলো না।

কানিসে আশ্রয় নেয়ার পর ক'টা দিন আবহাওয়া অনুকূল থাকায়  
বরফ কেটে ধাপ তৈরি করার নির্দেশ দিলো রানা। দিনে দিনে ধাপের  
সংখ্যা বাড়তে লাগলো, ক্রমশ আরো উঁচুতে উঠে আশপাশে নজর

রাখার সুযোগ পেলো লুকআউট। তারপর একদিন আইসবার্গের সমতল মাথায় পৌঁছে গেল পাহারাদার। প্যাক আইস থেকে একশো বিশ ফুট ওপরে ওটা। মিনার আকৃতির চূড়ার বাকি অংশটুকু মেঘের ভেতর হারিয়ে গেছে, শেষ প্রান্ত দেখা যায় না।

ফেব্রুয়ারীর তেইশ তারিখ দুপুরের খানিক আগে উদ্বেজিত এক লুকআউটের চিংকারে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসতে হলো রানাকে। 'ধোঁয়া, অনারেবল ক্যাপটেন!'

'কোন্ দিকে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'পশ্চিম দিকে।'

একশো সাতচল্লিশটা ধাপ বেয়ে উঠলো রানা, দেখলো সত্যি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ধোঁয়ার বিরাট একটা স্তম্ভ রয়েছে। তবে ফ্রস্ট-স্মোকও হতে পারে। যদিও রাতের বেলা, সূর্য যখন দিগন্তরেখার ঠিক নিচে নিপ্রভ হয়ে রয়েছে, ধোঁয়ার ভেতর লালচে একটু আভা দেখলো ওরা। গোটা ক্যাম্প উল্লাসে ফেটে পড়লো। সবাই নিশ্চিত মনে বিশ্বাস করছে, ওদেরকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ভুলটা ধরিয়ে দেয়া অত্যন্ত অপ্রীতিকর ও কঠিন কাজ। তবু, না বচাটাও অন্যায়। 'এমন হতে পারে,' একটু ঘুরিয়ে বললো রানা, 'কোকুন তার ফেলে দেয়া তেলে আগুন ধরিয়েছে।' এ-কথা শুনেও ক্রুদের উল্লাসে ভাটা পড়লো না। কোকুন যদি আগুন জ্বলে থাকে, নিশ্চয়ই উদ্ধারকারী জাহাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে, আর জাহাজগুলো যদি আসে তাহলে ওদেরকেও উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।

চুটো দিন মহা উল্লাসে কাটলো। তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে, ধোঁয়ার দিকে চোখ, ক্রুরা শুধু হাসাহাসি করে সময় কাটালো। তারপর আঘাত হানলো ঝড়। ঝড়টা এলো দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে,

রানা-১৭১

সম্মুখীন। তীব্রগতির একটানা বাতাস আইসবার্গের দেয়ালের সাথে  
সেঁটে ধরলো ওদেরকে। ঝড়ের সাথে, খানিক পর এলো তুষার আর  
বৃষ্টি। ঝাঁক। কানিসের ওপর অসহায় পেয়ে নির্দয় শীত অকণ্ঠে নির্যাতন  
চালালো ওদের ওপর। হুঁয়োগের সাথে যোগ হয়েছে থিমে। মার্কের  
কাছ থেকে খাবার আনতে যাওয়া অত্যন্ত ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে  
দাঁড়ালো, প্রতিবার ওরা আগের চেয়ে কম বরাদ্দ নিয়ে ফিরলো।  
উদ্ধার পাবার কথা ভুলেও আর কেউ মুখে আনলো না।

এই ঝড়ে একজন লোককে হারালো ওরা। দুই সঙ্গীর সাথে  
বেরিয়ে আর সে ফিরলো না। তিনজনই ওরা লিবার্টি-থ্রুর লোক,  
পরে তাদেরকে জেরা করেও আসল ব্যাপারটা কি ঘটেছে জানতে  
পারলো না রানা। দু'জনই তারা স্বীকার করলো, কানিস বেয়ে তারা  
নিচে নেমেছিল মার্কের কাছ থেকে অতিরিক্ত কিছু রেশন চাওয়ার  
জন্যে। ব্যস, এর বেশি আর কিছু বললো না। রানার ধারণা হলো,  
দল বদল করার জন্যে মার্কের কাছে গিয়েছিল ওরা, কিন্তু মার্ক ওদের-  
কে গ্রহণ করেনি। ফেরার পথে তৃতীয় লোকটা সম্ভবত বাতাসের  
ঝাঁকায় খসে পড়ে কানিস থেকে। সেই থেকে নিয়ম করা হলো, রসদ  
আনতে যারা যাবে, একটা রশির সাথে পরস্পরকে বেঁধে নেবে তারা।

ছ'টা দিন একইভাবে কাটলো। তারপর থামলো ঝড়। সেদিনই,  
কয়েকজন লোক রেশন কম বরাদ্দ করার জন্যে মার্কের বিরুদ্ধে অভি-  
যোগ করলো রানার কাছে। তাদের মধ্যে নিচের ক্যাম্প থেকে ঘুরে  
আসা লোক দু'জনও রয়েছে। কাইসু ওকোমো তাদেরকে বলেছে,  
নিচের ক্যাম্প এখনো অটেল রসদ রয়েছে। রানা বললো, 'ঠিক আছে,  
আমি নিজে গিয়ে কথা বলবো মার্কের সাথে।'

রানার হাত ধরে একপাশে টেনে নিয়ে এলো নিক শেডি, ফিসফিস  
যাত্রা অন্তত-২

করে বললো, 'মুখ্য একটা সুযোগ পাওয়া গেছে, মিঃ রানা। জুড়া খেপছে, আরেকটু উত্তেজিত করলে ওরাই কামেলাটা নিটিয়ে ফেলবে।'

কিন্তু রানা তা হতে দিতে পারে না। জুড়াদের উত্তেজিত করলে তারা এমনকি মার্কসহ বাকি দু'জনকে খুনও করে ফেলতে পারে। 'বললো, 'চলিশজনের রেশন ওরা তিনজন যদি খুব বেশি করেও খায়, শেষ করতে পারবে না।'

কোটরে ঢোকা নিক শেডির চোখ দুটো অঙ্গারের মতো বলছে লাগলো। 'জুড়াদের কথা ভাবছেন কেন? এই সুযোগে মার্কস উচিত শাস্তিটাও তো হয়ে যেতে পারে।'

রানার একই কথা, 'না।' নিক শেডিকে আর কোনো কথা বলা? সুযোগ না দিয়ে কানিসের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো ও। তুবাদের ভূপ তৈরি করে দুটো ক্যাম্পের সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে, ওপারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল কাইসু ওকোমোকে। তাকে ডেকে রানা বললো, 'মার্কসের সাথে দেখা করতে চাই।'

নিজের ঠোঁটে একটা আঙুল রাখলো কাইসু ওকোমো। 'আপনার সাথে আমার কথা আছে, মিঃ রানা।'

বিরক্তি চেপে রানা বললো, 'কি কথা?' লক্ষ্য করলো, গায়ে-গতরে আগের মতোই নখর রয়েছে কাইসু ওকোমো।

'আমি চাই,' নাকি সুরে, চাপা গলায় বললো কাইসু ওকোমো। 'আপনি জানুন, মার্ক খুব ভয়ে ভয়ে আছে।'

'কেন?'

'সমস্ত কৃতিত্ব আমার, এই বিখ্যাত ফটোগ্রাফার কাইসু ওকোমোর' বললো সে। 'সুযোগ পেলেই তাকে আমি শোনাচ্ছি, আপনাদের ক্যাম্পের জুড়া তার বিরুদ্ধে কি রকম অসন্তুষ্ট। বোনার পাইটনের

রানা-১৭১

স্বপ্ন সম্পর্কে তাকেই ওরা দায়ী বলে ভাবছে, ইত্যাদি। আরো বলেছি, সবাই বিশ্বাস করে আপনি ইচ্ছে করে লিবার্টি-ফোরকে ধাক্কা দিয়েছেন। প্রথমদিকে ধমক মেরে আমাদের চুপ করাবার চেষ্টা করতো, একবার তো ঠাস করে একটা চড়ই মেরে বসলো। কিন্তু তার এখনকার অবস্থা শুনবেন? একধারে একা বসে আছে গালে হাত দিয়ে, চেহারা দেখে মনে হবে এতিম। সুযোগ বুঝে আবার আমি মস্ত আঙুড়িতে শুরু করেছি—ক্রুরা আপনার ওপর খেপে আছে, বোনার পাইটনকে আপনি খুন করেছেন বলে ভাবছে তারা, লিবার্টি-ফোরকে ধাক্কা দেয়ায় ওরা আপনার ওপর প্রতিশোধ নিতে পারে। ফল হয়েছে, মার্ক ঘুমোতে পারছে না।’ থিক থিক করে হাসলো সে, রূপকথা বইয়ের ধূর্ত শেয়ালের মতো লাগলো তাকে রানার।

‘এ-সব কি সত্যি, ওকোমো?’ কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘সত্যি না হলে এতো কষ্ট করে বলতে যাবো কেন আপনাকে? বিশ্বাস করুন, ভয়ানক ঘাবড়ে গেছে মার্ক। তার আশা ছিলো প্যাক ভেঙে বেরিয়ে যাবে আইসবার্গ টা। ঝড়টা শুরু হওয়ায় তার আত্মবিশ্বাস আরো বেড়ে যায়। কিন্তু এখন অন্য কথা ভাবছে। আমার ধারণা, শিগগিরই ক্যাম্প ত্যাগ করবে মার্ক। আর মাত্র পঁচিশ দিনের মতো রেশন আছে, তার ইচ্ছে নয় তাতে কেউ ভাগ বসাক।’

‘যান, বলুন, আমি তার সাথে কথা বলতে চাই।’

প্রায় বজ্রাহত চেহারা নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো কাইস ওকোমো। তার আশা ছিলো, রানা তার কাজের প্রশংসা করবে।

করাই বোধহয় উচিত ছিলো, কারণ ঢাল বেয়ে উঠে আসা মার্ককে দেখে রানা বুঝতে পারলো, তার আত্মবিশ্বাস বলে কিছু নেই। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে, সামনের দিকে মুখে পড়েছে

শরীর । সরাসরি রানার দিকে ডাকাতেও অস্বস্তি বোধ করলো সে ।  
'কি ?' জিজ্ঞেস করলো রানাকে, প্রশ্নের ধরনটাই বলে দেয় নিজে  
মানসিক দুর্বলতা ঢাকার চেষ্টা ।

'রেশন কম দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করছে জুয়া ।'

'করুক অভিযোগ ।'

'কিন্তু তোমার ক্যাম্পে তো রেশন ব্যবস্থা চালু করোনি, যতো দুর্ভিক্ষ  
ভরছে পেটে ।'

'ভরবোই তো, আমার দলে থাকলে ওরাও সে সুযোগ পেতো ।'

'ওরা মরিয়া হয়ে উঠছে, মার্ক,' বললো রানা । 'সময় থাকতে তুমি  
সাবধান না হলে তোমাদের ক্যাম্পে চড়াও হবে ওরা । সেটার কি  
অর্থ দাঁড়াবে, তুমি জানো, তাই না ?'

জিঙের ডগা বের করে শুকনো ঠোট ভেজালো মার্ক । 'কাউকে  
আসতে দেখলে গুলি করে মারবো আমি ! যাও, সবাইকে জানিয়ে  
দাও কথাটা । আমার ক্যাম্পে চড়াও হবার স্পর্ধা কারো যেন না হয় ।'

'রেশনের কি অবস্থা ? ওকোমো বলছে, আর নাকি পঁচিশ দিন  
চলবে ?'

'বেজম্মা ওকোমো জাহান্নামে যাক !' বিড়বিড় করলো মার্ক ।  
'আপানী বাদরটা বেশি কথা বলে ।'

'কথাটা কি সত্যি, মার্ক ?'

'হ্যাঁ । যে পরিমাণে দেয়া হচ্ছে, তাতে আর পঁচিশ দিন পেতে  
পারবে । জানিয়ে দাও ওদের ।'

রেশনের কড়াকড়ি না থাকলে পঁচিশ দিনে চারজন লোক কি পরি-  
মাণ খাবার হজম করতে পারবে তার একটা হিসেব করলো রানা মনে  
মনে । তারপর বললো, 'আমার লোকদের জন্যে তিরিশ দিনের খাবার

চাই আমি, চাই তিনটে বোটসহ রসদ আর নেভিগেটিং ইকুইপমেন্টে  
আমাদের সবটুকু ভাগ—সম্ভার আগে।’

রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো মার্ক, ওর গলার স্তর স্তর পাইয়ে  
দিয়েছে তাকে। ‘বেশি বাড়াবাড়ি করলে, রানা, তোমাদের রেশন  
আমি একেবারে বন্ধ করে দেবো।’

‘আজ রাত আঠারো ঘণ্টার মধ্যে যদি ওগুলো না পাই, তোমার  
পরিণতির জন্যে আমি দায়ী থাকবো না,’ বললো রানা। ‘তোমাকে  
ছ’শিয়ার করে দেয়া হলো।’ কথা শেষ করে ঘুরলো ও, ঢাল বেয়ে উঠে  
এলো নিজেদের ক্যাম্পে।

কি করে এসেছে, জুদের শোনালো রানা। অনেক দিন পর  
তাদেরকে হাসতে দেখলো ও। সময় নষ্ট না করে তখনই সবাই তুষার  
স্তূপ অর্থাৎ সীমানার কাছে ক্ষুধার্ত একদল নেকড়ের মতো জড়ো হলো  
তারা। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নিজেদের ক্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের  
দিকে তাকিয়ে থাকলো মার্ক। ছপূরের খানিক পর এপার থেকে উল্লাসে  
ফেটে পড়লো জুরা। নিচের ক্যাম্প মার্কের ছ’জন সহযোগী আর  
কাইসু ওকোমো রসদ বের করে এক জায়গায় জড়ো করছে। হাতে  
রাইফেল নিয়ে পাহারায় রয়েছে মার্ক নিজে। তুষার স্তূপ ভেঙে ফেলা  
হলো, ছুটে নিচের ক্যাম্প নেমে গেল রানার দল, ওপরের ক্যাম্প  
নিয়ে আসা হলো বোটসহ অন্যান্য জিনিস-পত্র। রসদ আর ইকুইপ-  
মেন্ট পাহারা দেয়ার দায়িত্ব দিলো রানা ওয়েজনার আর এরিকার  
ওপর। জুরা একবার স্বাধীনতা পেয়ে গেলে গোত্রাসে খেতে শুরু  
করবে, যতোটা না খাবে তারচেয়ে নষ্ট করবে বেশি।

মাসের শেষ দিনটা এলো এবং চলে গেল, রানার লগ-এ দিন-  
গুলোর উল্লেখ ছাড়া আর কিছু লেখা হলো না। এরইমধ্যে রাত  
যাত্রা অন্ত-২



অন্ধকার হতে শুরু করেছে, প্রতিটি রাতে আগের রাতের চেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে থাকলো অন্ধকার। আনহাওয়া শান্ত হলোও, দশ দিনে মাত্র একবার সূর্যের মুখ দেখলো রানা। এর হিসেবে, ৬৩-৩১ দক্ষিণ, ৩১-৩৩ পশ্চিমে রয়েছে ওরা। লিবার্টি-ফোরকে ফেলে এসেছে প্রায় ২০০ মাইল উত্তর-উত্তর পূবে। এ-থেকে স্রোতের সাথে ভেসে যাওয়ার গতি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া গেল।

পুরোটা সময় রড চোখা করার কাজে মগ্ন থাকলো নিক শেডি, সবার চোখের আড়ালে কাজটা করে সে; ভয়, আবার না বেড়ে নিচে সেটাও কানিসের নিচে ফেলে দেয়া হয়। তাঁবুর ভেতর যখনই কেউ ঢুকলো, কন্সলের তলায় রডটা লুকিয়ে চূপচাপ শুয়ে থাকার ভান করলো সে, ওদের দিকে তাকিয়ে থাকলো চেহারায় অপরাধী-অপরাধী হাসি নিয়ে।

মারিকাকে নিয়ে রানার উদ্বেগও দূর হলো না। কানিসে আবার পর থেকে ওর সাথে কথা বলেনি সে। নিজের ভেতর গুটিয়ে গেছে মেয়েটা। এরিকার মুখে রানা শুনলো, মাঝে-মধ্যে গভীর রাতে মারিকার চাপা কান্নায় ঘুম ভেঙে গেছে তার, বাবা-বাবা করে ফোপাতে শুনেছে সে।

তারপর একদিন এরিকা রানাকে বললো, 'স্যার, আপনার একটা কিছু করা উচিত। এভাবে গুম মেরে থাকলে মারিকা পাগল হয়ে যাবে।' সেদিন আটই মার্চ। মারিকার তাঁবুতে এলো রানা।

কন্সলে নিজেকে মুড়ে শুয়ে আছে মারিকা। রানা ডাকতে মুখ থেকে কন্সল সরালো সে। চেহারা শুকিয়ে ম্লান হয়ে গেছে, কোটরে ঢোকা চোখ দুটো বিশাল লাগলো। কোন কথা না বলে রানার দিকে শুধু ক্যালফাল করে তাকিয়ে থাকলো সে, যেন চিনতে পারছে না। মাংস

ওদের ক্যাম্প অমূল্য একটা খাবার, এরিকাকে ডেকে খানিকটা স্টু-  
তৈরি করতে বললো রানা। তাঁর থেকে বেরিয়ে আসছে, পিছন থেকে  
মারিকা বিড়বিড় করে উঠলো, 'বোনার পাইটন আমার একমাত্র বন্ধু  
ছিলো।'

মন খারাপ, মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলো রানা। মারিকাকে নায়না  
দেয়ার ভাষা জানা নেই ওর।

সেদিনই ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল প্লেনটা।

## আট

চিহ্ন দেখে বোঝা গেল, ওটা একটা আমেরিকান প্লেন। ওদের মাথা  
থেকে পাঁচশো ফুট ওপর দিয়ে উড়ে গেল সেটা। সংকেত দেয়ার  
কোনো উপকরণ নেই, তাছাড়া খাড়া বরফ-পাঁচিলের গায়ে তুষারে  
প্রায় ঢাকা পড়ে আছে ক্যাম্প, প্লেন থেকে ওদেরকে দেখতে না পাও-  
য়ার আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আগুন ধরানোর উপযোগী কাপড়  
ইত্যাদি এক জায়গায় জড়ো করে ধোঁয়া তৈরি করা হলো, নতুন  
আশা দেখতে পেয়ে সবার মুখে আবার হাসি ফিরে এসেছে। দু'দিন  
পর আরো একটা প্লেন দেখতে পেলো ওরা, দূর দক্ষিণে চোখে  
যাত্রা অন্তত-২

বিনো কিউলার থাকায় দেখতে পেলো রানা, এতো দূরে যে ওদের ধোঁয়া পাইলটের চোখে ধরা পড়বে না। ফুয়েল অমূল্য সম্পদ, তাই আগুন ধরাতে নিষেধ করলো ও।

এরপর বৃষ্টি আর তুষারপাত শুরু হলো, তারপর আর সার্চ-প্লেন চোখে পড়লো না। বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে খাবার, শীত আর হতাশা চেপে বসলো ক্যাম্পের ওপর।

একদিন মাঝরাতে লুকআউটের ডাকে ঘুম ভাঙলো রানার। কাউকে কিছু না বলে নিক শেডি নিচের ক্যাম্পের দিকে নেমে গেছে। কানিসের বেশ খানিকটা নিচে, ছোটো ক্যাম্পের মাঝখানে একা তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো ওরা, পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে আছে, হাতে চোখা করা রড। রানা তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেও নড়লো না সে। লোকটা যেন নিজের চিন্তায় বিভোর। তারার ঠাণ্ডা আলোয় তার চেহারায় আত্মপীড়নের স্পষ্ট ছাপ দেখতে পেলো রানা, দ্বিধায় ভুগছে। রডটা তার হাত থেকে নিলো রানা, সে বাধা দিলো না। তার একটা হাত ধরে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো ও। সম্ভবত বেশ অনেককাল ধরে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলো নিক শেডি, শরীরটা ঠাণ্ডা শক্ত হয়ে গেছে। ফিরিয়ে আনার সময় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সে। মার্কের ক্যাম্পে গিয়েও তার কোনো লাভ হতো না, কারণ নড়াচড়া দেখে রানা বুঝতে পারলো ওখানে পাহারা আছে। এরিকাকে ডেকে তার হাতে নিক শেডিকে ছেড়ে দিলো রানা।

ঝড় নেই, তাই আকাশ ঢাকা মেঘ সরছে না। একটু একটু করে দীর্ঘ হচ্ছে রাতের অন্ধকার। প্রতিদিন নিচে নামছে তাপমাত্রা। জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছে সমাপ্তির জন্যে একঘেয়ে অপেক্ষার পালা। ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে এখন আর নিচের ক্যাম্পের দিকে তাকিয়ে থাকে না ক্রুরা।

কাইন্স ওকোমোর কাছ থেকে জানা গেছে, তাদের ক্যাম্পেও রেশনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। রোজই একবার অবশিষ্ট রসদ পরীক্ষা করে রানা, পরিমাণ কমে যাচ্ছে দেখে মনে মনে আতঙ্কিত হয়। লুকআউট থেকে এখন আর প্লেন খোঁজা হয় না, সাদা উজ্জলতায় ধাঁধানো চোখ নিয়ে পাহারাদাররা তাকিয়ে থাকে বরফের দিকে, যে-কোনো প্রাণীর খোঁজে, এক আধটা পেঙ্গুইন বা সীল পেয়ে গেলে খেতে না পেয়ে মরার আশংকা সামান্য একটু হলেও কমে। আইসবার্গের নড়াচড়া ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে এসেছে। চারদিকের গোটা পরিবেশ আগের তুলনায় অনেক শান্ত। এখন আর বরফ বিক্ষোভের কোনো শব্দ শোনা যায় না। মৃত্যুর নিস্তকতা যেন চেপে বসছে ওদের ওপর। প্রেশার রিজ সৃষ্টি হয় না, ফলে ওদের কানিসটাও আর কেঁপে ওঠে না। ওদের ফুয়েল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর ক'দিন পর গরম কিছু খেতে পাবে না ওরা। পান করার জন্যে গরম কিছু না পেলে, জীবন ওদেরকে নিঃশব্দে ছেড়ে যাবে।

উনিশে মার্চ, রানা ওর লগে লিখলো, 'রেশন আরো কমিয়ে দেয়া হয়েছে। ইলিয়টসেন মারা গেছে। ভাঙা পাজরটা সম্ভবত ফুসফুস ফুটো করে দিয়েছিল। কানিস থেকে নিচে ফেলে দেয়া হয়েছে লাশটা। ক্রুরা কেউ কাদেনি, কারণ সবারই চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। এমনকি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলাও একটা বিলাসিতা, কারণ সবাই তারা ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়েছে। শীত অত্যন্ত তীব্র। বাতাস থেমেছে, আর আইসবার্গটা প্যাকের মাঝখানে স্থির হয়ে আছে। প্যাক আইস ভেঙে খোলা সাগরে বেরিয়ে যাওয়ার আপাততঃ কোনো আশা নেই।'

মনে মনে একটা প্ল্যান করেছে রানা, উপলব্ধি করলো এবার সেটা কাজে লাগানো দরকার। এভাবে অপেক্ষা করার চেয়ে বাঁচার চেষ্টা

করতে গিয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। দেখা গেল, এরিকাও তাত্তি ভাবছে। পরদিন সকালে ওর তাঁবুতে এলো সে। আধো-অন্ধকারে তাকে দেখে বিস্মিত হলো রানা। তাকিয়ে প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে মেয়েটা। তার সাথে নিক শেডিও এসেছে, মোটা কাপড়চোপড়ের ভেতর হাড়িসার একটা দেহ, কংকালই বলা চলে, তবে দৃশ্যের ব্যাপার হলো আরো রোগা হয়ে যাওয়ায় তার চেহারা থেকে বৃহস্পতি ভাবটুকু প্রায় সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে। তাকে দেখে আধুনিক শিল্পীদের আঁকা যীশুর কথা মনে পড়ে গেল রানার।

‘মিঃ রানা, স্যার,’ শুরু করলো এরিকা। ‘আর দেখি করা যায় না, কিছু একটা আমাদের করা দরকার।’

মাথা ঝাঁকালো রানা। ‘আমারও তাই ধারণা।’

‘চেষ্টা করে মরাও ভালো,’ বললো এরিকা। ‘আমার ইচ্ছে, বাবাকে খুঁজতে বেরোই। পরিস্থিতি এখন শাস্ত। বরফের ওপর দিয়ে যাওয়া সম্ভব। কোকুন যখন ডুবেছিল, পনেরো কি বিশ মাইল দূরে ছিলো সেটা। বাবা হয়তো বেঁচে আছে। জানি না। তবে তার খোঁজে আমাকে যেতে হবে।’

‘কোকুন যেখানে ডুবেছে সেখান থেকে প্রায় আড়াইশো মাইল দূরে চলে এসেছি আমরা, বোঝো-তো?’ জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘জানি। তবে তারাও সম্ভবত একই গতিতে ভেসে এসেছে, তাই না? চেষ্টা করলে, আমার ধারণা, ওদেরকে আমরা খুঁজে পাবো।’

‘ভুলো না আমরা একটা আইসবার্গে রয়েছি, দিনের পর দিন একই গতিতে ভেসে এসেছি। কোকুনের ওরা যদি কেউ বেঁচেও থাকে, বিশ মাইলের চেয়ে অনেক বেশি দূরে থাকতে পারে ওরা।’

‘জানি। এ-ও জানি, আমরা জানি না কোনদিকে আছে ওরা। কিন্তু

যেতে আমাকে হবেই। শরীরটা দুর্বল, সতিয়া, কিন্তু দরকার আসলে  
উইলপাওয়ার আর স্পিরিট। ছটোরই কোনো আশ্রয় নেই আমার।  
ক্যাপটেন মাসুদ রানার কাছে ফাস্ট মেট এরিকা পিটারসেন অন্তর্ভুক্তি  
চাইছে সে তার বাবাকে খুঁজতে যাবে।’

‘আর নিক শেডি ?’ জিজ্ঞেস করলো রানা।

এরিকার চেহারায় কোনো ভাবাবেগ নেই। সে জানে, নিক শেডির  
কন্যে ব্যাপারটা হবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। ছ’জনের কোনোই  
ব্যাপারটা তাই, তবে প্রথমে মারা যাবে নিক শেডি, এরিকার চোখের  
সামনে। তবু এরিকার চোখের পাতা একটু কাঁপলো না, শুধু বললো,  
‘নিক আমার সাথে যাবে।’

চেহারা দেখেই বোঝা গেল, নিজেদের মধ্যে আলাপ করেছে ওরা।  
সিকান্ড নেয়া হয়ে গেছে ওদের। ছ’জনের চেহারাতেই অদ্ভুত একটা  
আলো ফুটে রয়েছে। এই মুহূর্তে নিক শেডির কুৎসিত ভাবটুকু দারুণ  
ভালো লাগলো রানার, তাকে রীতিমতো সুন্দর লাগলো ওর চোখে।  
এরিকাকে ভালোবাসে বলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে একপায়ে খাড়া

হবে, ব্যাকুল আনন্দের সাথে।

চূপচাপ লম্বা হয়ে শুয়ে থাকলো রানা, অনেকক্ষণ কিছু বললো না।  
নিজের প্ল্যানটা নিয়ে ভাবলো ও। তারপর উঠে বসলো, তাকিয়ে  
আছে নিক শেডির দিকে, জানে না ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে সে।  
‘নিক,’ এই প্রথম তার প্রথম নাম ধরে ডাকলো রানা, ‘তুমি শারীরিক  
দিক থেকে দুর্বল। তোমার ইচ্ছে শক্তি যতোই বেশি থাক, নিজেও  
জানো কোকুনের জুরা যেখানে আছে সেখানে পৌঁছুবার আগেই  
মারা যাবে তুমি। ঠিক ?’

দপ্ করে দলে উঠলো নিক শেডি। ‘আপনি চান এখানেই আমি

এরিকাকে শুভসাই জানাই ?

‘ভেবে দেখো । আমার একটা প্ল্যান আছে । ধরো, তাই । এরিকাকে এখানেই তুমি শেষ বিদায় জানালে । এরিকার সাথে তুমি থাকলে তুটো আশা আছে । এরিকার পক্ষে তার বাবার কাছে পৌছানো সম্ভব হতে পারে । আমাদের সবারও আরো ক’টা দিন বেশি বেঁচে থাকার উপায় হতে পারে । সবার স্বার্থে, দাঁড়ি হবে তুমি ।’

চোখের পানি লুকাবার জন্যে অন্য দিকে ফিরলো নিক শেডি  
‘হ্যাঁ ।’

দাঁড়ালো রানা, তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো, ওকে আঁকড়ে ধরে বেরিয়ে এলো এরিকাও, ব্যাকুলতার সাথে জানতে চাইছে, রানার প্ল্যানটা আসলে কি । রানা শুধু বললো, ‘অপেক্ষা করো ।’ এরপর ক্রুদের সবাইকে ডেকে এক জায়গায় জড়ো করলো ও । তারা সবাই ওকে ঘিরে দাঁড়ালো ।

‘তোমরা জানো, আর মাত্র কয়েক দিনের খাবার আছে আমাদের ?’ জিজ্ঞেস করলো রানা ।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো তারা ।

‘এখন যে রেশন দেয়া হচ্ছে, আর সতেরো দিন খেতে পাবো আমরা,’ বলে গেল রানা । ‘তারপর উপবাস শুরু হবে । আজ পর্যন্ত আশপাশে কোথাও আমরা কোনো প্রাণী দেখিনি । খাবার আর ফুয়েল না পেলে সবাই আমরা মারা যাবো ।’ স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো তারা, বোকা বোকা চেহারা নিয়ে, জানা কথা নির্মম ভাষায় শুনে হতভম্ব ।

‘এরিকা পিটারসেন কোকুনের পজিশনে পৌঁছাতে চাইছে,’ বললো রানা । ‘সে জানতে চায় তার বাবা বেঁচে আছে কিনা । কারো যদি

খাবার অধিকার থাকে তো তারই আছে, তাই না ?' একমত হয়ে  
ওয়েম তুললো জুরা।

এরপর নিজের স্তানটা ব্যাখ্যা করলো রানা। ডুবে যাবার আগে  
ক্যাটরি শিপ কোফুন বরফে তার রগদ খালাস করেছে। কোফুনে নিপুল  
পরিমাণে তিমির মাংস আর চর্বি ছিলো। সম্ভবত নেই সে-সবও বরফে  
নামানো হয়েছে। কোকুনের কোনো লোক যদি বেঁচে থাকে, তাদের  
সাথে মাংস আর ফুয়েলও আছে। রানার ইচ্ছে, তাদের কাছে  
পৌছনো। পৌছনোর সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ, আর তাই এর রওনা  
হবার ব্যাপারে সবার সমর্থন থাকাটা জরুরী। তিনজন লোক যাবে  
জুরা, তাদেরকে কমপক্ষে দুটো দিন প্রচুর খেতে দিতে হবে, কারণ  
দুর্বল শরীর নিয়ে পাঁচ মাইলও পেরুতে পারবে না তারা। তাদের  
সাথে রেশনও থাকতে হবে। ফলে জুদের তিন দিনের খাবার কমে  
যাবে। কাজেই এখন সিদ্ধান্তটা তাদের, ভেবে দেখুক সুযোগটা তারা  
নেবে কিনা।

নিজেদের মধ্যে ফিসফাস আলাপ শুরু করলো জুরা। সামনে এক  
পু' এগিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে এরিকা বললো, 'তোমাদের সিদ্ধান্ত যাই হোক,  
আমি যাবোই। তোমাদের খাবার আমার দরকার নেই।'

লোকেরা তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলো। তাদের মধ্যে  
থেকে, এক বুড়ো, এক সময় এরিকার বাবার জাহাজে কাজ করেছে,  
ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে বললো, 'তোমাকে আমরা খালি হাতে যেতে  
দিতে পারি না। লিবার্টি-ফোরের জুরা যতো ইচ্ছে খাবার নিয়ে  
যেতে দেবে।'

একযোগে মাথা ঝাঁকালো লিবার্টি-ফোরের জুরা। তাদের সবার  
চোখে একটা আলো ফুটে উঠেছে--ঝাঁচার নতুন আশায় নয়, ত্যাগ  
যাত্রা অন্তত-২



স্বীকার করতে পারার গর্বে ।

এরপর সামনে বাড়লো ওয়েল্ডনার, দ্বিজেন করলো, 'নিঃ রানা, স্যার, আপনি আমাদের বলবেন কি, আর কাকে সাথে নিয়েছেন আপনি ?'

'হ্যাঁ,' বললো রানা । 'হোলস্টাড, যদি সে রাজি থাকে ।' তারপর বললো, 'সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আমাদের আমি সাবধান করে দিচ্ছি, আমাদের পৌছতে পারার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, বেশির-ভাগ সম্ভাবনা মাকপথে যাত্রা পড়বে । তবে, এটাই একমাত্র সুযোগ পরে হয়তো সুযোগটা আর পাবো না, রেশন শেষ হবার সাথে সাথে আরো যখন তুর্নল হয়ে পড়বে ।'

'আমি যাবো,' বললো হোলস্টাড ।

'ওড !' মাথা ঝাঁকালো রানা, তারপর জুদের সিদ্ধান্ত শোনার অপেক্ষায় থাকলো ।

কেউ কিছু বললো না, তবে রানা দেখলো স্টুয়ার্ডদের একজন খাবার তৈরির কাজে লেগে গেছে । বাকি সবাই শিশুর মতো নিঃশব্দ হাসছে । গোটা পরিবেশটা উৎসবমুখর করে তুললো তারা । চৌকির চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়ালো সবাই, এটা-সেটা পরামর্শ দিতে, নিজের বরাদ্দ থেকে আরো খাবার নিতে অনুরোধ করছে । নিঃশব্দ কাঁদছে এরিকা, ভাবাবেগে কাঁপছে সে, ভিড়ের মধ্যে ঢুকে জড়ির ধরছে লোকজনকে, চুমো খাচ্ছে, কপাল ঘষছে জুদের বুকে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে অস্থির । তার ধারণা, তার জন্যেই সবার এই আত্ম-স্বীকার । রানাও ভাবতে পারলো না তার ধারণাটা পুরোপুরি সঠিক নয় । এরিকার দৃঢ় মনোবল লক্ষ্য করে জুদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে নিজের মধ্যে নতুন শক্তি ও আনন্দের উৎস খুঁজে পায়নি ।

রানা-১৭১

পরের ছ'দিন শিকারী যোগের মতো খাওয়ানো হয়ে ওদেরকে। রান্না অনুভব করলো, হারানো শক্তি ফিরে আসতে শুরু করেছে শরীরে। সেই সাথে হতাশ ভাবটুকু দূর হলো মন থেকে। এমনকি খানিকটা আশাও যেন দেখতে গেলো ও। শীত সহনীয় হয়ে এলো। কুঁড়ো মতো হয়ে গিয়েছিল হোলস্টাড, আনার লম্বা দেখালো তাকে। উন্টো একটা ব্যাপারও ঘটলো, ওরা তিনজন আগের শক্তি আর আস্থা ফিরে পাবার সাথে সাথে বাকি সবাই আরো একটু করে নিষ্ঠুর হয়ে পড়লো, আরো তুকিয়ে গেল তাদের চেহারা। ওদের তিনজনকে যখন খাওয়ানো হয়, ফুদার্ত জুরা চারপাশ থেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে, ভান করে তারা ব্যাপারটা উপভোগ করছে। আসলে কাউকে প্রচুর পরিমাণে খেতে দেখার মধ্যে ফুদার্ত মানুষ এক ধরনের তৃপ্তি পায়। ওদের ননের অবস্থা কল্পনা করে চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসতে চায় রান্নার। মুখে খাবার উঠতে চার না যখন দেখতে পায় জুরা তাদের চোখ থেকে থিদের ভাবটুকু গোপন রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

প্রথমদিন একটা ঘটনা ঘটলো, যা থেকে রান্নার বুকে নেয়া উচিত ছিলো মার্কের আসল মতলবটা কি। ওদের ক্যাম্প এসে রান্নার সাথে কথা বলতে চাইলো কাইস্র ওকোমো। তুকিয়ে গেছে সে, কুঁকড়ে ছোট্ট হয়ে গেছে চওড়া শরীরটা, চেহারায় কিসের যেন ভয়। তাকে ওদের ক্যাম্প নেয়ার জন্যে অনুনয়-বিনয় শুরু করলো সে, পারলে রান্নার পায়ের ওপর গড়াগড়ি খায়। 'সমস্ত খাবার খেয়ে ফেলছে ওরা,' কাদো-কাদো গলায় বললো জাপানী ফটোগ্রাফার। 'আমাকে কিছুই দিচ্ছে না, অথচ সারাদিন ওদের মুখ চলছে। এভাবে যদি খেতে থাকে, ক্যাম্প আর কোনো খাবারই থাকবে না। থিদের পেট খলে যাচ্ছে আমরা, কিন্তু আমাকে দিয়ে রান্না করিয়ে সব খাবার কেড়ে নিলে খেয়ে

ফেলছে ওরা।’

‘আপনি বরং মার্কস সাথে বুঝুন,’ বললো রানা। ‘এতো দিন তো তাদের কুক-এর ভূমিকা ভালোমতোই পালন করেছেন। তার দলে যোগ দেয়ার সময় আপনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেননি।’ নিজের প্ল্যান আর জুদের ভালো-মন্দ নিয়ে এতো ব্যস্ত রানা যে কাইসু ওকোমোর রেশন নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই, তার সাথে একটু বোধহয় কৰ্কশ ব্যবহারই করা হয়ে গেল। সেদিন সকালে সুন্দর ও হালকা একটা স্নেজ বানাবার কাজ শেষ করলো ওরা।

রাতে ওরা তিনজন খেতে বসলো একটা তাঁবুর ভেতর, পরিবেশন করলো মাত্র দু’জন। জুরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ওদের খাওয়ার সময় ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না। আরও একটা দিন, সীমাহীন বরফের জগতে পা বাড়াবে ওরা খাবার ও কোকুনের জুদের খোঁজে। তারা কোথায়, ওদের কারো জানা নেই। এমনকি তাদের কোনো অস্তিত্ব আছে কিনা তা-ও অজানা। এগোতে হবে ওদেরকে, মাইলের পর মাইল পেরিয়ে যেতে হবে, যতোকণ শক্তি থাকবে, যতোকণ না অচল হয়ে পড়ে শরীর। চিন্তাটা ভীতিকর, বিশেষ করে আল্ট্রা ভীতিকর এই জন্যে যে এখন ওদের পেট খালি নয়, আশা করার শক্তি পেয়ে গেছে। ওরা তিনজনই এখন রানার তাঁবুতে থাকে, আলোচনায় কোনো বিরতি নেই, সম্ভাব্য সেরা পথটা বের করার জন্যে গবেষণা চলে।

পরদিন খুব ভোরে খাবার খেয়ে ঘুম ভাঙলো রানার। প্রথমে ওর মনে হলো, ওদের বোধহয় রওনা হবার সময় হয়েছে। তারপর মনে পড়লো, আজ নয়, কাল, বাইশ তারিখে রওনা হবে ওরা। চোখ মেললো রানা, দেখলো ওর মুখের ওপর কুঁকে রয়েছে কাইসু ওকোমো।

‘মিঃ রানা, ক্যাপটেন, স্যার । মিঃ রানা, ক্যাপটেন, স্যার । ওরা চলে গেছে ! ওরা সবাই চলে গেছে । চলে গেছে কিন্তু আমার জন্যে কিছুই রেখে যায়নি । কিছু না । একদম কিছু না ।’ আতংকে কাঁপছে সে ।

উঠে বসলো রানা । ‘কারা চলে গেছে ? কি বলছেন আপনি ?’

‘মার্ক,’ ককিয়ে উঠলো কাইন্স ওকোমো । ‘মার্ক চলে গেছে, সব নিয়ে পালিয়েছে সে । মার্ক, হেলমুটসেন আর ডানকান ! আমাকে একা ফেলে... বিশ্বাস না হয় আমার সাথে আসুন, নিজের চোখেই দেখতে পাবেন ।’

হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো রানা, কানিসের কিনারায় দাঁড়িয়ে চোখের কাছে হাত তুলে সাদা উজ্জলতা ঠেকালো, তাকালো কাইন্স ওকোমোর লম্বা করা হাত বরাবর । অবিশ্বাস্য একটা সকাল । উত্তর-পূবে রক্ত-লাল সূর্য ঠিক যেন একটা কমলা । গোটা আকাশ সবুজাভ নীল । ‘ওদিকে ! দেখতে পাচ্ছেন ?’

বরফের ওপর তিনটে বিন্দুর মতো দেখালো ওদেরকে, একটা স্নেহ টেনে নিয়ে যাচ্ছে । সূর্যের দিকে পিঠ, চলেছে যদিকে কোকুনকে শীতল হবে বলে আশা করা যায় । নিজেকে ধিক্কার দিলো রানা, ওরা সব খাবার সাবাড় করে ফেলছে শোনার পরও সাবধান হয়নি বলে । আইসবার্গ প্যাক আইস ভেঙে খোলা সাগরে বেরিয়ে যাবে না বুঝতে পেরে মার্কও একমাত্র উপায়টা বেছে নিয়েছে, পশ্চিম দিকে যাচ্ছে সে, কোকুনের ক্রু কিংবা উদ্ধারকারী জাহাজের সন্ধানে ।

কাইন্স ওকোমোর চেষ্টামেচিতে ছেগে উঠলো ক্যাম্প । টলতে টলতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো লোকজন । তাদের একজনকে বলতে শুনলো রানা, ‘এখন বোধহয় আপনি আর যাবেন না, ক্যাপটেন । ওরা তিনজন প্রচুর খাবার নিয়ে গেছে । কেউ যদি কোকুনের কাছে যাত্রা

পৌছতে পারে তো ওরাই পারবে। উদ্ধার পাবার বড় একটা আশা দেখতে পাচ্ছি আমি।’

নিক শেডি বললো, ‘কোকুনের ক্যাম্প মার্ক যদি পৌছতেও পারে আমাদের উদ্ধার করার জন্যে কেউ এদিকে আসবে না। মার্ক দু’তিন একা বাঁচার চেষ্টা করছে। ইলেকট্রিক চেয়ার থেকে বাঁচার এটাই একমাত্র উপায়।’ রানার দিকে ফিরলো সে। ‘মিঃ রানা, আপনি আমাদের শেষ ভরসা। প্ল্যানটা বদলাবেন না, প্লিজ। কোকুনের ক্যাম্প আপনাকে পৌছতেই হবে।’

ওদেরকে মার্কের পথ ধরে এগোতে হবে। লোকটা সম্পর্কে রানার মনে কোনো ভুল ধারণা নেই। পথে কোথাও হেলমুটসেন আর ডানকানকে ফেলে যাবে সে। নিক শেডির কথাই ঠিক, কোকুনের ক্যাম্প পৌছে মার্ক জানাবে, আর কেউ বেঁচে নেই, মারা গেছে সবাই, কাছেই এদিকে কোনো উদ্ধারকারী দল আসবে না।

তিনজন ওরা সারাটা দিন তাঁবুর ভেতর কাটালো, খরচ না হওয়ায় শক্তির সঞ্চয় বাড়লো, খাওয়াদাওয়া করলো প্রচুর। সম্ভাব্য পথ, কোকুনের ক্যাম্প খুঁজে পাবার সম্ভাবনা, মার্কের সাথে যদি দেখা হয়ে যায়, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হলো। তারপর এক সময় কিমুনি এসে গেল ওদের, সচেতন হলো আবার আলোচনা করার জন্যে। পেট খালি নয়, শরীর গরম, শুয়ে আছে, আইসবার্গ ঠিক যেন একটা নিরাপদ বাড়ি।

সেদিন রাতে, খাওয়াদাওয়া শেষ করেছে মাত্র ওরা, তাঁবুর পর্দা নড়ে উঠলো, বাইরে থেকে শোনা গেল মারিকার গলা, ‘ভেতরে একবার আসতে পারি, রানা?’

হায়াগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকলো সে, রানার হাতটা শক্ত করে ধরে

বসে থাকলো কিছুক্ষণ, তারপর হোঁপাতে শুরু করলো। এক সময় রানার গায়ের ওপর চলে পড়লো সে, মুখ ঘষলো রানার বুকে, আহত পাখির মতো কাঁপছে শরীরটা। ‘আমাকে ক্ষমা করো,’ অনেকক্ষণ পর বিড়বিড় করে বললো সে, ‘বোকার মতো সময়টা নষ্ট করলাম।’ রানাকে ঠেলে গুইয়ে দিলো সে, ওর বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো, চুমো খেলো ঘন ঘন—কপাল, গাল, ঠোঁট, চিবুক আর গলায়। তার চোখের পানিতে ভিজে গেল রানার গাল, মারিকা ওকে নিঃশ্বাস ফেলারও সময় দিচ্ছে না। তারপর এক সময় ওর পাশে, প্রায় ওর গায়ের ওপর নিজেও শুলো সে, নিঃশব্দে কাঁদছে। রানার মনে হলো, মার্ক বিদায় নেয়ার সাথে সাথে খাঁচায় বন্দী মারিকার মনটা ঘেন মুক্তি পেয়ে গেছে।

এক সময় মারিকা বললো, ‘এখন তোমার ঘুম দরকার। কাল তোমার চলে যাওয়া আমি দেখতে পারবো না। আজ, এখনই তোমাকে আমি বিদায় জানাবো।’ রানার ঠোঁটে চুমো খেলো সে, আঙুলগুলো ওর দাড়ি নিয়ে খেলছে। খানিক পর ফিসফিস করে বললো সে, ‘আমার ক্ষম হয় না আবার আমাদের দেখা হবে। যদি মারা যাই, তুমি বা আমি, কিংবা ছ’জনেই, তোমার কি মনে পড়বে মারিকা নামে এক বোকা মেয়ে তোমাকে ভালোবাসতে চেয়েছিল, কিন্তু সুর্যোগ পায়নি।’ উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে উঠে বসলো সে, কন্বল থেকে বেরিয়ে থাকা এরিকার মুখের দিকে তাকালো। ‘ওড-বাই, এরিকা,’ বললো সে। ‘বাবা বেঁচে থাকলে আমিও তোমার মতো তাকে খুঁজতে বেরুতাম।’ বুকে চুমো খেলো এরিকাকে। সবশেষে রানাকে আবার চুমো খেয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল সে। চলে গেল মারিকা, কিন্তু তার

লোনা চোখের পানি লেগে থাকলো রানার গালে, মনে করিয়ে দিলো  
ভাবতে সে এসেছিল।

## নয়

পরদিন সকাল। আলো ফুটেই রওনা হয়ে গেল ওরা। সাথে ছ'-  
দিনের খাবার, সামান্য তামাক, একছোড়া স্কি, এক প্রস্থ রশি, ছোটো  
একটা স্টোভ আর কিছু কাপড়। সব একটা স্নেজে তোলা হলো।  
সকালটা আশ্চর্য অনড়, ওদের নিঃশ্বাস মাথার আশপাশে শূন্যে ঝুলে  
থাকলো খোঁয়াটে খুঁদে মেঘের মতো। কানিস বেয়ে নামছে ওরা, ফুঁ  
উঠলো, সোনালি আলোর ঝকমকিয়ে উঠলো ছুনিয়া, দিগন্তরেখা  
বরাবর ফুঁটে উঠলো কমলা রঙের একটা লম্বা ফিতে। সবাই ওদেরকে  
বিদায় জানাবার জন্যে ভাব থেকে বেরিয়ে এসেছে, বেশিরভাগই  
কানিসের নিচ পর্যন্ত নামলো ওদের সাথে। অসমতল, এবড়োখেবড়ো  
প্যাক আইসে ওরা পা রাখতেই ছোট্ট, ককঁশ একটা আনন্দধ্বনি  
বেরলো জুদের সম্মিলিত কণ্ঠ থেকে। ওদের পিছু পিছু নামানো হলো  
স্নেজটাকে, সেটার সাথে নেমেছে ওয়েজনার, রানার একটা হাত চেপে  
ধরলো সে। 'ওডলাক, স্যার।'

‘তিমির মাংস নিয়ে পনেরো দিনের মধ্যে ফিরবো আমরা,’ লোক-  
দের মনে সাহস যোগাবার জন্যে গলা চড়িয়ে বললো রানা, যেন  
আত্মবিশ্বাসের কোনো অভাব নেই ওর, যদিও স্বেচ্ছা ভান করছে। ‘এই  
সময়ের মধ্যে যদি আমরা না ফিরি,’ ফিসফিস করে বললো ও,  
‘তোমার সাধ্যমতো যা পারো করবে।’ বেচারী ওয়েজনার, তার কাঁধে  
প্রায় অসম্ভব একটা দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে রানা। লিবার্টি-ফাই-  
ভের সেকেন্ড মেট মার্টিনসেন-এর হাতে নেতৃত্ব দিয়ে যেতে বলেছিল  
এরিকা, কিন্তু মার্টিনসেনকে চেনে না রানা, চেনে ওয়েজনারকে।  
লোকটার নিঃস্বার্থ সততার প্রতি ওর আস্থা আছে।

‘আপনি ওদেরকে পাবেন, স্যার,’ ওয়েজনার বললো। ‘আমাদের  
কথা ভেবে চিন্তা করবেন না। প্যাক ভেঙে খোলা সাগরে বেরিয়েও  
তো যেতে পারে আইসবার্গটা।’

তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে স্নেহের রশ্মি ধরলো রানা। নিক শেডির  
কাছ থেকে শেষ বিদায় নিচ্ছে এরিকা, স্নেহের সাথে সে-ও নিচে নেমে  
এসেছে। মার্ক তার দল নিয়ে যে পথে এগিয়েছে সেই একই পথ ধরে  
দাঁড়না হয়ে গেল রানা আর হোলস্টাড। পিছন থেকে নিক শেডি  
বললো, ‘মিঃ রানা, আপনাকে কোকুনের ক্যাম্পে পৌঁছাতেই হবে।  
মার্ক যদি একা পৌঁছায়...’ কথাটা সে শেষ করলো না, যদিও কি বলতে  
চায় বুঝতে পারলো রানা। উত্তরে একটা হাত নাড়লো ও। তুষার  
ঢাকা বরফের ওপর দিয়ে এগোলো দু’জন, খানিক পর ওদের সাথে  
যোগ দিলো এরিকা।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বরফের অদ্ভুত জগৎ গ্রাস করলো ওদেরকে,  
চারদিকে সোনালি নিস্তরতা। সমতল বলে কিছু নেই, বিশাল আকা-  
রের বরফের ঢাল আর স্তম্ভগুলোর মাঝখান দিয়ে পথ করে নিলো



ওরা, তুষার ঢাকা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে প্রতি মুহূর্তে আইসবার্গ থেকে দূরে সরে আসছে। মাঝে মধ্যে পিছন ফিরে তাকালো ওরা। আইসবার্গের কানিস বেয়ে কালো মূর্তিগুলো উঠে যাচ্ছে ক্যাম্পের দিকে, সবুজ বরফের গায়ে এখনো রোদ লাগেনি, তাবুগুলোকেও কালো লাগলো দেখতে। একবার একটা মূর্তিকে মেয়েলি বলে মনে হলো রানার, সম্ভবত মারিকাই হবে, হাত নাড়ছে। সাড়া দিয়ে রানাও একবার হাত নাড়লো। মুখ ঘুরিয়ে পশ্চিম দিকে হাঁটা ধরলো আবার। বরফের ভাঙাচোরা বেটপ প্রান্তরে খানিক পরই হারিয়ে গেল আইসবার্গটা।

সেদিন রাতে ক্যাম্প ফেলার পর ছোট্ট একটা বরফের পাহাড়ে চড়লো রানা, তাকালো পিছন দিকে। অস্তগামী সূর্যের আলোয় আইসবার্গ আর তার কানিসটা স্পষ্ট দেখতে পেলো ও। রূপকধার দুর্গ যেন, মনে হলো এতো কাছে যে ছুঁতে হলে শুধু হাত বাড়ালেই চলে। এমনকি তাবুগুলোও পরিষ্কার দেখতে পেলো রানা, দেখলো তাবুর বাইরে হাঁটাচলা করছে কুরা পিপড়ের আকৃতি নিয়ে। তাবুতে ফেলার পর রানা দেখলো, ওদের জন্যে গরম স্টু তৈরি করেছে এরিকা। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে শুয়ে পড়লো ওরা, যে যার নিজের বুট স্পিপিং ব্যাগের ভেতর রাখলো, ভেতরে যাতে বরফ জমতে না পারে।

চারদিনে, প্রতিদিন চোদ্দ ঘণ্টা হেঁটে, প্রায় তিরিশ মাইল পেরেলো ওরা। গতি মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়, কিন্তু আবহাওয়া ভালো হওয়া সত্ত্বেও, বরফের গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে এগোনো অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ। আইসবার্গগুলো যে পথ দিয়ে গেছে, সেই পথ ধরে এগোচ্ছে ওরা। দেখে মনে হলো ভাসমান বরফের বিশাল মাঠগুলো

ভূমিকম্পের দরুন ভেঙেচুরে বেটপ স্তূপ-এর আকৃতি পেয়েছে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তুলনায় ছোটো টুকরোগুলো। তার ওপর, গোদের ওপর বিষকোড়ার মতো, বরফের এই উচু-নিচু ভগতে পুরু স্তর জমেছে তুষারের। খানিক পরপরই পথপ্রদর্শক সামনের লোকটা নতুন জীবন পেলো শুধু তার হাতে রশিটা থাকায়। পেট ভরে ছ'দিন খেতে পেয়ে গারে যে জোর ফিরে এসেছিল, এই ক'দিনে নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে। তাছাড়া, দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয়তার কারণেও শরীর দুর্বল। মার্কের স্নেহের চিহ্নিত পথ ধরে না এগোলে চার দিনে ওরা তিরিশ মাইল এগোতে পারতো কিনা সন্দেহ।

স্নেহ-চিহ্নিত পথটা ওদের মনে বিচিত্র ভাবের জন্ম দিলো। প্রথমে মার্ককে ওরা শত্রু বলে ভাবলো, বরফ ছাড়া তাকেও পরাস্ত করতে হবে। তার স্নেহের পথ ধরে এগোচ্ছিল ওরা ওদের পরিকল্পিত পথটা একই দিকে গেছে বলে, জানে নিজেদের প্ল্যান অনুসারে বা যখন খুশি সেটা ছেড়ে আরেক দিকে রওনা হতে হবে ওদের। কিন্তু প্রতিদিন যতোই এগোলো ওরা, পথটা ওদের পরম বন্ধুর মতো হয়ে উঠলো। ওদের সাথে আগ্নেয়াস্ত্র নেই। মার্ক যদি দেখতে পায় ওদের, চাইলেই সে ওদেরকে খুন করতে পারে। ওদের যাতে কোকুনের ক্যাম্প পৌঁছানো সম্ভব না হয়, উদ্ধারকারী কোনো দলের সাথে সাক্ষাৎ যেন না ঘটে। রানা জানে, ঠিক গুলি করবে মার্ক। রানার বিশ্বাস, মার্ক এমনকি তার দুই সঙ্গীকেও ফেলে যাবে, নিজের সুযোগ ও সময়মতো। তবু তার পথটা থেকে সরে যাবার কথা কেউ মুখেও আনলো না। পায়ের নিচে জমাট তুষার আর মাথার ওপর পরিষ্কার আকাশ, পথটা বহুদূর পর্যন্ত এতো স্পষ্ট দেখা গেল যেন সদা তৈরি করা হয়েছে। ক্রান্তি আর দুর্বলতা যতোই চেপে ধরলো ওদেরকে, ততোই আশা আর জীবনের যাত্রা অন্ত-২

একমাত্র প্রতীক হয়ে উঠলো পথটা। ওদের সামনে সেটা সীমাহীন লম্বা হয়ে আছে, অন্য কোনো মানুষের সাথে যোগাযোগ করার একমাত্র রাস্তা। অজ্ঞের মতো সেটাকে অনুসরণ করে যাচ্ছে ওরা, মনে বিশ্বাস, ওদের সামনে কোথাও, হয়তো পরবর্তী ঢালের ওদিকে, কিংবা সম্ভবত দিগন্তরেখার ওপাশে, এই পথটা বাইরের দুনিয়ার সাথে ওদের মিলন ঘটিয়ে দেবে।

চারদিনের দিন এরিকার চেহারায় ও আচরণে দুর্বলতার লক্ষণ দেখা দিলো। গোড়ালি ফুলে ওঠায় খোঁড়াচ্ছে হোলস্টাড। পুরনো ব্যথাটা আবার ফিরে এসেছে রানার বুকে। সেদিন ওরা মাত্র মাইল দুয়েক এগোতে পারলো। তুষার গলতে শুরু করেছে, ফাঁক-ফোকরের ভেতর পা ডেবে গেল। চওড়া একটা ফাটলের ভেতর একবার প্রায় হারিয়ে ফেলছিল স্নেজটা। চারদিকে বরফের স্তম্ভ আর মিনার, মাঝখানে ক্যাম্প ফেললো ওরা। এর আগে পর্যন্ত, রানার ধারণা, মার্কের চেয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়েছে ওরা। কিন্তু রাতটা কাটলো বুক ভরা হতাশা নিয়ে। তবে ওদেরকে খানিকটা প্রেরণা যোগালো বরফের পাহাড় থেকে দেখা পশ্চিম দিগন্তরেখার কাছে কালো একটা রেখা। মনে হলো, ওটা একটা ওয়াটারশাই হতে পারে, সামনে খোলা সাগর থাকার লক্ষণ প্রকাশ করেছে। কিন্তু কতোটা সামনে? রানার হিসেবে চল্লিশ মাইলের কম নয়। কিন্তু সবাই ওরা জানে, পাঁচ মাইল হাঁটার শক্তিও অবশিষ্ট নেই ওদের কারো।

পরদিন আরো দুর্বল হয়ে পড়লো এরিকা। রক্ত-আমাশার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। রানা আর হোলস্টাডও ডায়রিয়ার শিকার। সান গগলস না থাকায় সাদা উজ্জলতা ওদের দৃষ্টি শক্তি ধীরে ধীরে শুবে নিচ্ছে। সব সময় খালা করে চোখ। বেশিদূর দৃষ্টি চলে না। সেদিন

শক্ত বরফ পেলো ওরা, সঞ্চিত শক্তির সবটুকু কাজে লাগিয়ে বেশ অনেক দূর এগোলো। ছপুরের দিকে ধারণা হলো, দশ কিংবা এগারো মাইল পেরিয়ে এসেছে ওরা। বরফের একটা পাহাড়ে চড়ে পূর্ব দিকে তাকাতো সার বাধা আইসবার্গগুলোর শুধু চূড়া দেখতে পেলো রানা। বাপসা দিগন্তরেখায় লম্বা পালতোলা জাহাজের মতো লাগলো দেখতে, কখনো দেখা যায় কখনো যায় না। কম্পাস বের করে বেয়ারিং নেয়ার পর নিজেদের ফেলে আসা আইসবার্গটা চিনতে পারলো ও।

একটা বিস্কিট আর জম্বাট চিনির দুটো করে টুকরো খেয়ে আবার হাঁটা ধরলো ওরা। কুয়াশার চাদরে ঢাকা সূর্য স্নান একটা খালা। বাতাস আগের চেয়ে ঠাণ্ডা, ওদের চারপাশের জগৎ রঙ হারালো। সাদা উজ্জলতা স্নান হবার সাথে সাথে চোখের ছালা একটু কমলো, তবে প্রাকৃতিক পরিবেশে ফুটে উঠলো অপেক্ষাকৃত বৈরী একটা ভাব। রানার ধারণা হলো, সম্ভব ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ওরা। তারপর হঠাৎ ওরা উপলব্ধি করলো, কারো পক্ষেই আর এগোনো সম্ভব নয়। টলতে টলতে, আছাড় খেতে খেতে ক্যাম্প ফেলা হলো। মনে হলো, কাল সকালে কেউ ওরা ছুনিয়ার আলো দেখার জন্যে বেঁচে থাকবে না।

ক্যাম্প মৈত্রিয়ে পড়লো ওরা, সন্ধ্যার প্রথম লগ্নে রানার মনে হলো, কাদের যেন গলা শুনলো সে। কল্পনা, দুর্বল মনের উপর অদ্ভুত সব চাতুরি করে। রাতে রানার পাশে শুয়ে বিড়বিড় করে এরিকা বললো, 'স্যার। এভাবে সম্ভব নয়। আমাদেরকে আপনারা রেখে যান।'

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলো রানা। ওর ধারণা ছিলো না, আজ সারা-দিন হাঁটার ফলে কতোটুকু মাশুল দিতে হয়েছে এরিকাকে। রাগের যাত্রা অন্তত-২

সাথে মাথা নাড়লো ও । ‘একসাথে থাকবো আমরা ।’

রানার একটা হাত ধরলো এরিকা । ‘প্লিজ !’ ফিসফিস করলো সে ।  
হ্রবল কণ্ঠ, কিন্তু সুরটা ব্যাকুল । ‘আপনাদের সাথে এসে স্বার্থপরতার  
পরিচয় দিয়েছি আমি । আমার বোঝা উচিত ছিলো, একজন পুরুষ-  
মানুষের সমান ক্ষমতা ও শক্তি আমার থাকার কথা নয় । আমাকে  
ফেলে রেখে এগিয়ে যাওয়া আপনার দায়িত্ব, স্যার । আমি সাথে-  
থাকলে আপনাদেরকে দেরি করিয়ে দেবো । আইসবার্গে ফেলে আসা  
ওদের কথা ভাবতে হবে আপনাকে । আপনি সাহায্য নিয়ে ফিরবেন,  
এই আশায় পথ চেয়ে আছে ওরা । আপনিই ওদের একমাত্র ভরসা ।’

‘কাল সকালে কথা হবে,’ বললো রানা, সরে এলো এরিকার গায়ের  
কাছে, ভয় পাচ্ছে, গভীর রাতে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারে সে ।

অনেকক্ষণ জেগে থাকলো রানা, এরিকার বলা কথাগুলো নিয়ে  
ভাবছে । তর্ক করলে কি হবে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এরিকাকে ফেলে  
যাওয়াটা যে একমাত্র উপায় তা সে-ও জানে । চিন্তাটা ভয়ংকর, মেনে  
নিতে মন চায় না । ওদের এগিয়ে যাওয়ার ওপর অনেকগুলো মানুষের  
জীবন-মরণ নির্ভর করছে । যার শক্তি আছে তাকে এগিয়ে যেতে হবে,  
যতোকণ না শেষনিঃশ্বাস পড়ে ।

রাতের কোনো এক সময় ঝড় উঠলো । ঘুম ভাঙার পর তাঁবুর  
কাপড় তুলে বাইরে একবার তাকালো রানা, তারপর তাড়াতাড়ি এরি-  
কার দিকে ফিরলো, তাঁবুর ভেতর সে আছে কিনা দেখার জন্যে ।

ঘুমাচ্ছে এরিকা । ঝড় শুরু হওয়ায় সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিলো  
রানা, সকালে ওরা রওনা হতে পারবে না । একটা দিন বিশ্রাম পেলে  
এরিকা হয়তো তার হ্রবলতা কাটিয়ে উঠতে পারবে, অন্তত আরো  
একদিন হাঁটার শক্তি সে পেয়েও যেতে পারে ।

একটা তিন দিন ধরে বইলো, এই তিন দিনে সমস্ত খাদ্য খেয়ে ফেললো ওরা, বাকি থাকলো শুধু পাঁচটা সিগারেট আর গানেরো টুকরো।  
 একটা চিনি। ডাবুর ভেতর অক্ষকার, কখনো একটু কম, কখনো বেশি।  
 কেবলকে যেন জ্যান্ত কবর দেয়া হয়েছে। বেড-প্যান হিসেবে নিষিদ্ধ  
 কখনো একটা টিন ব্যবহার করলো ওরা। সিপিং ব্যাগের ভেতর পুড়ে  
 থাকলো সবাই, একদিক অলাড় না হলে পাশও কিরলো না।

ঘেরাতে তুষারপাত ধামলো, শেষ সিগারেটটা ভাগাভাগি করে  
 খেলো ওরা। সকালের ঝাপসা আলোয় লগে রানা লিখলো, 'এখন  
 আর কোনো আশা দেখতে পাচ্ছি না। এগোনোর কোনো অর্থ নেই।  
 ওরা দু'জনও, আমার ধারণা, ব্যাপারটা বুঝতে পারছে। এরিকাকে  
 আমি ফেলে যাবো না। এখন আর ফেলে যাবার কোনো যুক্তি নেই।'

খুব ভোরে বরফ পড়লো ওরা। তিন দিন বিশ্রাম পাওয়ায় অল্প একটু  
 শক্তি ফিরে এসেছে, সেটা সদ্যবহার করার তাগাদা অনুভব করলো  
 রানা। এই প্রথমবারের মতো ওদের সামনে স্লেজ-চিহ্নিত পথ নেই।  
 স্লেজ এক ফুট গভীর। এরিকাকে স্কি-তে তুলে দেয়া হলো। তুষারের  
 উপরটা বুঝলেও, নিচের দিকে কঠিন, বেশ হাসিখুশি মন নিয়েই  
 বরফ পড়লো ওরা। বরফের প্রথম পাহাড়টা পেরিয়ে এসে খানিকটা  
 এলোমেলো তুষার দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল, এখানে একটা ক্যাম্প  
 ফেলা হয়েছিল। আজ সকালেই ক্যাম্পটা ত্যাগ করা হয়েছে, বোঝা  
 গেল ক্যাম্পের সামনে নতুন তুষারে স্লেজ আর স্কির চিহ্ন দেখে।  
 পথটা আবার ওরা খুঁজে পেলো।

'মার্ক ১' রানার পাশে থেমে জিজ্ঞেস করলো এরিকা।

মাথা ঝাঁকালো রানা। তারমানে ঝড় শুরু হওয়ার রাতে সত্যি  
 তাহলে ওদের গলা গুলতে পেয়েছিল ও। অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার।

তিন দিন ওরা মার্কের পকাশ গজের মধ্যে ছিলো, অথচ টের পায়নি।  
'ওরা সম্ভবত আমাদের কাছ থেকে ঘটাখানেকের পথ সামনে এগিয়ে  
আছে,' বললো ও।

'ওদের কাছে যখন পৌঁছুবো, কি ঘটবে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকলো রানা। ওদেরকে ধরা সম্ভব কিনা  
সন্দেহ আছে ওর। স্নেজটা তারা তিনজন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মার্ক  
আর হেলমুটসেন দু'জনেই শক্তিশালী লোক।

'আমার ধারণা, ওদের পথ থেকে সরে থাকা উচিত আমাদের,'  
বললো এরিকা।

মাথা নাড়লো রানা। 'আমরা যদিকে যাবো বলে ঠিক করেছি  
প্রায় সেদিকেই যাচ্ছে ওরা। ওদের পথ ধরে যাওয়াটা সহজও।'

হোলস্টাড আর রানা স্নেজ টানছে, কি নিয়ে অনায়াসে ওদের সাথে  
আসতে পারছে এরিকা। দুই কি আড়াই ঘণ্টা ভালোই এগোলো  
ওরা। তবে ছপুরের দিকে সূর্য উঠলো, সাদা উজ্জলতায় আবার  
ধাঁধিয়ে গেল চোখ, সেই সাথে নরম হতে শুরু করলো তুষার। তুষারের  
ভেতর বুট ডেবে যাওয়ায় গতি মন্থর হয়ে পড়লো। পাহাড়গুলোর  
ওপর থেকে ধসে পড়া তুষারও খানিক পর পর বাধা হয়ে দাঁড়ালো।  
মাঝে মাঝে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল তুষারে। শক্তি ফুরিয়ে এলো, হাঁপাতে  
শুরু করলো ওরা।

অন্ধকার নামলো আকাশ জুড়ে ঝাঁক ঝাঁক ঝলমলে তারা নিয়ে।  
তীব্র শীতে ঘুম এলো না। তলপেটের ব্যথায় কাতরাচ্ছে এরিকা।  
বরফের ঘষায় কয়ে গেছে হোলস্টাডের বুট, ফ্রস্ট-বাইটের শিকার সে,  
ওগুলো এখন আর ওয়াটার-টাইট নয়।

পরদিন সকাল হলো ঝড়ো বাতাস আর মেঘ নিয়ে। দেরি করে

রওনা হলো ওরা। এরিকা এতোই দুর্বল হয়ে পড়েছে প্রথমে মনে হলো আজ ওরা বেরোতে পারবে না। ভুল করে সে তার বুট ছোড়া সিলিং ব্যাগের বাইরে রেখেছিল, শক্ত লোহা হয়ে গেছে। স্টোভ ছেলে গরম করার পর নরম হলো। তবে রওনা হবার পর বেশ ভালোই এগোলো ওরা, ঠাণ্ডা বাতাসে বুরবুরে তুষার জমাট আর কঠিন হয়ে গেছে। ওদের সামনে একেবেঁকে এগিয়েছে মার্কের স্নেজ-চিহ্নিত পথ।

‘শিগগিরই ওদের ক্যাম্প দেখতে পাবো আমরা, তাই না, স্যার?’

হোলস্টাডের কথাই ঠিক হলো। তুষার আর বরফের পাহাড়গুলো ক্রমশ কমতে শুরু করলো সংখ্যায়, তারপর ওদের সামনে উন্মুক্ত হলো খোলা একটা প্রান্তর, যেখানে প্যাক আইস প্রায় সমতল হবার সুযোগ পেয়েছিল। এই খাঁ খাঁ বরফ প্রান্তরে একছোড়া সরল রেখা এগিয়ে গেছে, শেষ মাথায় কালো একটা দাগ।

‘ওটাই ওদের ক্যাম্প,’ চিৎকার করে বললো হোলস্টাড। ‘এখনো রয়েছে ওরা ওখানে। লোকজনকে নড়তে দেখছি আমি!’

চোখ কুঁচকে তাকালো রানা, পরিষ্কার একটা ছবি পাবার আশায়। চোখ দুটো ওর টকটকে লাল হয়ে আছে, দৃষ্টি ঝাপসা। কালো একটা দাগ দেখতে পেলো বটে, কিন্তু নাচানাচি করছে। এরপর কেন যে ওরা ইন্টার গতি বাড়িয়ে দিলো বলতে পারবে না রানা। মার্কের সাথে মিলিত হবার কোনো ইচ্ছে ওদের নেই। লাভ কি তাতে? তবু শুধু অন্য কোনো মানুষের সাথে সাক্ষাৎ ঘটার চিন্তাটাই হৃদয়ের মতো টেনে নিয়ে চললো ওদেরকে। ‘আমার চোখের বারোটা বেজে গেছে, হোলস্টাড,’ বললো রানা। ‘ওরা কি ক্যাম্প তুলে ফেলছে?’

‘বোধ হয়,’ জবাব দিলো হোলস্টাড। ‘কোনো তাঁবু দেখতে পাচ্ছি না।’ এক মুহূর্ত পর সে আবার বললো, ‘আমি কিন্তু মাত্র দু’জন লোক-যাত্রা অণ্ড-২



কে দেখতে পাচ্ছি।’

‘হ’জন।’ আবার চোখ কুঁচকে তাকালো রানা, সচল ছোটো নৃতি, কাপসা, নাচানাচি করলো ওর দৃষ্টিসীমার শেষ মাথায়।

‘ওরা হেলমুটসেন আর ডানকান,’ রুদ্ধশ্বাসে বললো হোলস্টাড

‘মার্ককে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না?’ জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘না, স্যার। শুধু হেলমুটসেন আর ডানকান।’

ওদের সাথে মিলিত হবার জন্যে এগিয়ে এলো তারা, চিংড়ি করছে, হাত নাড়ছে। মাঝখানে ব্যবধান একশো গজের মতো, এই সময় হঠাৎ তারা স্থির হয়ে গেল। স্নেজ টেনে নিয়ে তাদের কাছে পৌঁছলো ওরা, বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে। ওদের সাহায্য দরকার বুঝতে পেরেও কেউ তারা এগিয়ে এলো না। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ক্যালকাল করে তাকিয়ে থাকলো শুধু। হেলমুটসেন চোখে পড়ার মতো রোগা হয়ে গেছে, তার পায়ে বুটও নেই। বুট ডানকানের পায়েও নেই। তার হাতে একটা ছুরি আর এক টুকরো চামড়া দেখা গেল। ‘মার্ক কোথায়?’ ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার ফাঁকে জিজ্ঞেস করলো রানা, হাত থেকে খসে পড়লো স্নেজের রশি, সামনে বাড়ার ঝোঁটটা খেমে যাওয়ায় টলছে।

‘মার্ক?’ কোর্টরের গভীরে হঠাৎ দপ করে ঘলে উঠলো হেলমুটসেনের চোখ। ‘সে চলে গেছে। আমরা ভেবেছিলাম আপনারা উদ্ধারকারী দল, আমাদের পথটা খুঁজে পেয়েছেন। আপনাদের সাথে থাবার কতোটা?’

‘নেই,’ বললো রানা। ‘কিছু চিনি আর এক কি ছোটো বিস্কিট।’ স্নেজের ওপর বসে পড়লো ও। খামার পর ক্রান্তি পেয়ে বসলো ওকে, ইচ্ছে হলো ওয়ে পড়ে। হঠাৎ এতো ঘুম পেলো যে চোখ খুলে রাখা

দায়। 'মার্কের কথা কি বললে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো ও, হেলমুট-সেন ঠিক কি বলেছে এখন আর ভালো করে স্মরণ করতে পারছে না।

'সে চলে গেছে,' চাপা গলায় হিসহিস করে উঠলো, আকোশে কাপছে হেলমুটসেন। 'আপনার কথাই ঠিক, অনারেবল ক্যাপটেন। হুল করেছি আমি আর ডানকান। আমাদেরকে বোকা বানিয়ে চলে গেছে মার্ক। আজ সকালে ঘুম ভাঙার পর দেখি পান্টে গেছে ওর রূপ, স্নেজ টেনে ক্যাম্প থেকে দূরে সরে যাচ্ছে মার্ক। স্নেজের ওপর তাঁবুটাও ছিলো। চিংকার করে ডাকলাম, ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সে, হাসলো। পিছু নিলাম আমরা, কিন্তু বেশিদূর যেতে পারলাম না—মার্ক আমাদের বুটগুলো নিয়ে গেছে। আমাদের রাইফেলটাও রেখে যায়নি সে। তবে ডানকানেরটা কক্ষের তলায় ছিলো, ঘুম থেকে জেগে উঠবে ভেবে সেটা নেয়নি। বেজমাটা খুন করে গেছে আমাদের।'

নিক শেডিওর কথাই ফললো, ভাবলো রানা। 'তার সাথে খাবার কি আছে?'

'একজন লোকের তিন কি চারদিন চলে যাবে। বৃষ্টিতেই পারছেন, কম।'

'সে কি দুর্বল?'

'খুবই। তার পক্ষে একা স্নেজ টেনে নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব একটা কাজ, কিন্তু তাই সে করছে।'

'ঠিক আছে,' বললো রানা। 'হোলস্টাড, ক্যাম্প ফেলো।' উত্তরটা জানা আছে ওর—কি। এরিকার সাথে কথা বলার জন্যে ঘাড় ফেরালো ও, কিন্তু নেই সে। ফেলে আসা পথের দিকে তাকালো রানা, কয়েক শো গজ পিছনে বরফের ওপর লম্বা হয়ে পড়ে রয়েছে এরিকা, নড়ছে না। ছোট্ট ইচ্ছে হলেও, সে শক্তি ওদের নেই।

প্রায় টলতে টলতে রওনা হলো ছ'জন। মাত্র তিনশো গজ দূরত্ব, কিন্তু পেরোতে গিয়ে মনে হলো তিন মাইলের কম নয়।

বৈচে আছে এরিকা। নাকের ফুটোর চারপাশে সদ্য জমা বরফ নিঃশ্বাস পতনের সাথে কাঁপছে। তবে জ্ঞান নেই তার। ছ'জন অনেক কষ্টে দেহটাকে স্নেজের ওপর তুললো। স্নেজ টানতে শুরু করলো ওরা, রানার মনে হলো হিমালয়কে কাত করার চেষ্টা করছে। যেখানে জিনিস-পত্র রেখে এসেছে, স্নেজ নিয়ে সেখানে ফিরতে পারবে বলে বিশ্বাস হলো না। হেলমুটসেন আর ডানকান সাহায্য করতে এগিয়ে না এলে পারতোও না ওরা।

তাঁবু খাটাবার পর স্টোভ খেলে খানিকটা বীফ টি তৈরি করা হলো। নিজের ক্রান্তির কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করছে রানা। জানে, এখন যদি সেবা-যত্নের অভাব ঘটে, এরিকাকে হারাবে ওরা। নিজের প্রাণ থাকতে সেটা ঘটতে দিতে রাজি নয় রানা। এরিকার জ্ঞান ফিরলো ধীরে ধীরে। বমির সাথে বেরিয়ে এলো সবটুকু বীফ টি। এরপর রানা তার মুখের ভেতর খানিকটা মহামূল্য ত্র্যাণ্ডি ঢাললো। কথা বলার শক্তি ফিরে পেয়ে বারবার একই শব্দ আওড়ালো এরিকা, 'এবারে স্যার, আমাকে আপনি রেখে যান। দোহাই আপনার, আমার কথা ভুলে যান। আইসবার্গে ওরা রয়েছে, ওদের কথা ভাবুন, প্লিজ।'।

তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে মার্কের কাহিনী শোনালো রানা। সমস্ত রসদ নিয়ে একা চলে গেছে সে। কিন্তু রানার কথা এরিকা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। ওর একটা হাত ধরলো সে, আলাগা হয়ে থাকলো আঙুলগুলো, বললো, 'আপনাদের একজনকে এগিয়ে যেতে হবে, স্যার।' অস্পষ্ট হয়ে এলো তার গলা। 'কি নিয়ে একজন অসুস্থ রওনা হয়ে যান। মার্ক একা যেন পৌঁছতে

না পারে। আইসবার্গের ওপর ওরা অনেক লোক....।’

রানা বললো, ‘চিন্তা করো না। কেউ একজন যাবো আমরা।’

এরপর ঘুমিয়ে পড়লো এরিকা। রানার হাত ধরে টান দিলো হোলস্টাড। ‘শরীরের যতোটুকু সাধ্য, তার মনের সাধ তারচেয়ে বেশি, স্যার।’

হোলস্টাড আসলে বলতে চাইছে, এরিকা মারা যাচ্ছে। চোখের পিছন দিকে ভেজা ভেজা একটা ভাব অনুভব করলো রানা। ও জানে, বোঝা না হবার জন্যে ওদের সাথে কিভাবে নিজেকে টেনে এনেছে মেয়েটা। ক্লান্তি আর দুর্বলতা মৃত্যুর মুখে পৌঁছে দিয়েছে তাকে, তারপরও ফেলে আসা অসহায় লোকগুলোর কথা ভাবছে সে। হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলো রানা। ওদের মধ্যে থেকে একজনকে মার্কের পিছু নিতে হবে। প্রথমেই হেলমুটসেনের কথা ভাবলো ও। সে-ই সবার চেয়ে শক্তিশালী। মার্কের আসল পরিচয় পেয়ে গেছে সে, কাজেই এখন তাকে বিশ্বাসও করা যায়। কিন্তু প্ল্যানটা নিয়ে আরো ভাবতে গিয়ে রানা আবিষ্কার করলো, বুটগুলো নিয়ে গিয়ে হেলমুটসেন আর ডানকানকে আক্ষরিক অর্থেই পঙ্গু করে রেখে গেছে মার্ক। যে-ই মার্কের পিছু নিক, কি নিয়ে যেতে হবে তাকে, আর বুট ছাড়া স্থিতে চড়ার প্রশ্নও ওঠে না। রানার আর হোলস্টাডের পা হেলমুটসেন বা ডানকানের চেয়ে অনেক ছোটো, বুট ধার দেয়ার প্রশ্নও ওঠে না। যেতে হবে হোলস্টাড, নয়তো রানাকে। হোলস্টাডের দুটো পা-ই ফ্রস্টবাইটের শিকার, কাজেই যেতে হবে রানাকে।

আয়োজন শুরু হলো। অল্প যে-টুকু রেশন আছে, সাথে করে নিয়ে যেতে হবে রানাকে। ‘তোমার রাইফেলটা নিয়ে এসো, ডানকান,’ বললো ও। ‘সাথে কিছু অ্যামুনিশন।’ একটা বাকসাক-এ জিনিস-যাত্রা অন্তত-২

পাত্র ভরে নিলো ও, বেরিয়ে এলো তাঁবু থেকে। জানে মৃত্যুর দিকে  
এগোতে হবে ওকে, তবু একদণ্ডও নষ্ট করতে চাইছে না। তাঁবু থেকে  
বেরোবার সময় রানা জানলো না এরিকা ঘুমাচ্ছে, নাকি আবার জান  
হারিয়েছে। নিঃসাড় পড়ে আছে সে, চোখ বন্ধ। বেরুবার আগে তার  
কপালে চুমো খেলো রানা। সামান্য একটু নড়লো এরিকা। বোধহয়  
বুঝতে পারলো, রানা তাকে চুমো খেয়েছে। এরিকা বুঝতে পেরেছে  
যে নিরে মনটা খুশি হয়ে উঠলো ওর। মনে মনে ও জানে, চুমোট  
দিয়ে অভ্যস্ত সাহসী ও মহৎ একটা মেয়েকে সম্মান দেখিয়েছে ও।

কিভে চড়তে রানাকে সাহায্য করলো হোলস্টাড। ডানকানের  
হাইকেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলো রানা। এরপর বাকস্যাকটা ওর  
আরেক কাঁধে ঝুলিয়ে দিলো হোলস্টাড। এই বাকস্যাকে তার জীবন-  
ধারণের জন্যে যা কিছু একান্ত প্রয়োজন সব আছে, স্বেচ্ছায় নিয়ে  
যেতে দিচ্ছে রানাকে। খানিকটা বীফ টি আর স্টোভটা ছাড়া ওদের  
জন্যে কিছুই রেখে যাচ্ছে না রানা, স্টোভে ফুয়েল বলতে আছে শুধু  
তলানিটুকু। রানার সাথে কর্মমর্দন করলো হোলস্টাড। 'গুডলাক,  
অনারেবল ক্যাপটেন।' তাকে বুকে টেনে নিলো রানা। খানিক দূরে  
পথথমে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো হেলমুটসেন আর ডানকান।  
ওরা উদ্ধারকর্মী নয় এবং ওদের সাথে কোনো খাবার নেই জানার পর  
থেকে হতাশায় একেবারে মুগ্ধ পড়েছে তারা। এমনকি মার্কের পিছু  
নিতে যাচ্ছে রানা, এই ব্যাপারটাও ওদেরকে নাড়া দিতে পারলো না।  
'নেতৃত্ব এখন তোমার কাঁধে, হোলস্টাড,' বললো রানা। 'এরিকা  
পিটারসেনের ওপর খেয়াল রেখো।' স্বি নিয়ে রওনা হয়ে গেল রানা,  
পিছন ফিরে একবারও তাকালো না। মার্কের স্নেহ চিহ্নিত পথের  
ওপর দৃষ্টি। পিছন ফিরে তাকালো না, কারণ জানে যাদেরকে ফেলে

যাচ্ছে তাদেরকে আর জীবিত দেখতে পাবে না কখনো। জানে, এরিকা পিটারসেন আজ কিংবা হয়তো দু'দিন পর মারা যাবে। মারা যাবে ও নিজেও। কিন্তু মৃত্যু অনিবার্য ও একেবারে কাছে জানা সত্ত্বেও প্রতিশোধ নেয়ার একটা স্পৃহা মাথাচাড়া দিচ্ছে রানার মনে।

## দশ

প্রতিশোধের এই স্পৃহা মৃত্যু পথযাত্রী মাসুদ রানার মনে অদ্ভুত একটা শক্তি এনে দিলো। সেই সাথে ওকে যেন একটা উদ্দেশ্য পাইয়ে দিলো। এখন আর কোকুনের বেঁচে যাওয়া ক্রুদের ক্যাম্প খুঁজে পাবার কোনো আশা নেই মনে, কিংবা ক্যাম্পটার আদৌ কোনো অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করে না। রানা বেরিয়েছে একজন লোককে খুন করার জন্যে। লোকটা ওদের সবার মৃত্যু ডেকে আনার জন্যে দায়ী। মারিকার বানা বোনার পাইটনকে খুন করেছে সে। ওদের জাহাজটাকে ধাক্কা দিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছে। সর্বস্ব হরণ করে ফেলে গেছে দু'জন সহযোগীকে। ওর হয়ে কাজটা বরফও সারতে পারে, এই চিন্তাটাকে আমল দিলো না রানা। মার্ক রোসেটকে নিজের হাতে খুন করবে ও। এই একটা কাজ করার জন্যে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করা

এয়োজন বলে উপলব্ধি করলো।

নিজেই অধাক হয়ে গেল রানা, কি নিয়ে কী স্বচ্ছন্দে আর অনা-  
রাসে এগোতে পারছে এখন। বরফের মেঝে শক্ত আর মসৃণ। এক-  
টানা হিসহিস শব্দ ভুলে ছুটে চললো কি। স্টিক ধরা হাত ছোটো শুধু  
আড়ষ্ট হলো।

মার্ক, রানা ধারণা করলো, ওর চেয়ে তিন ঘণ্টা আগে রওনা  
হয়েছে। হুপুরের খানিক পর সঙ্গীদের ছেড়ে এসেছে ও। স্নেজ টেনে  
নিয়ে যাচ্ছে এমন একজন লোকের চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে এগোতে  
পারছে ধরে নিয়ে হিসেব করলো, বিকেল তিনটের দিকে ওর সাথে  
দেখা হবে মার্কের। তারপর দিনের আলো খুব কমই থাকবে হাতে।  
সন্ধ্যার অন্ধকার নামার আগে যদি মার্কের ক্যাম্প খুঁজে না পায় ও,  
তাহলে আরেকটা সকাল দেখার ভাগ্য হবে না ওর। তাঁবুর বাইরে,  
খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে হলে নির্ধাৎ মরণ। যদিও  
ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামালো না রানা। নিজের মৃত্যুর  
চিন্তা ছেড়ে গেছে ওকে। শুধু জানে, অবশ্য পালনীয় কর্তব্যটা রাত  
নামার আগেই শেষ করতে হবে ওকে।

ওর সামনে আকাশের রঙ গাঢ়, যেন নতুন একটা রাতের সৃষ্টি  
ঘটতে যাচ্ছে। তবে ওর পিছনে দিগন্তরেখার কাছাকাছি মেঘপুঞ্জ  
অসম্ভব উজ্জ্বল আর সাদা। জগৎটা সমতল, মরুভূমির মতো, কিন্তু  
সাদা। যতোই এগোলো রানা, বরফ প্রান্তরের মেঝে বদলে যেতে  
লাগলো। মেঝের নিচে, তুষারে ঢাকা, ফাটল রয়েছে। কি ছাড়া এক  
মাইলও এগোতে পারতো না রানা। অসংখ্য গর্তের ওপর সেতু তৈরি  
করেছে তুষার, পেরিয়ে আসার পর শব্দ শুনে বুঝলো ধসে পড়ছে  
ওগুলো। এরপর খোলা গর্ত পড়লো সামনে, এতো চওড়া যে তুষার

সেতু রচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। মেজের দাগ এগিয়েছে গর্ত আর ফাটলগুলোকে এড়িয়ে, এঁকেবেঁকে।

বেলা দুটোর খানিক পর কয়েক হুণ্ডার মধ্যে এই প্রথম খোলা পানি দেখতে পেলো রানা। যেন কালো একটা লেক, লেকের বুকে ভাসছে সাদা পাথরের মতো অসংখ্য বরফের টুকরো। আগের চেয়ে দ্রুত এগোচ্ছে রানা, সঞ্চিত সর্বশেষ শক্তিটুকু কাজে লাগিয়ে। অন্ধকার নামতে খুব বেশি দেরি নেই, আর মাঝে মধ্যে খোলা পানি চোখে পড়ায় বুঝতে অসুবিধে হলো না প্যাক আইসের কিনারা থেকে খুব বেশি দূরে নেই ওরা। মার্কের কাছে চারদিনের খানার রয়েছে। ফীণ একটু আশা এখনো আছে। ফীণ আশার এই আলোটুকু রানাকে যেন নতুন শক্তি এনে দিলো।

হিসেবে তেমন ভুল হয়নি রানার, কারণ তিনটের খানিক পরই ওর সামনে কালো একটা সচল বিন্দু দেখতে পেলো ও। বেশ খানিকক্ষণ মেজের পথটা কালো লেকগুলোকে এড়িয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে, চলে গেছে প্যাকে আটকে পড়া ছোটো একটা আইসবার্গের দিকে। আইসবার্গের সবুজ ঢালের গায়েই কালো বিন্দুটা। ওটার ওপর স্থির দৃষ্টি রাখা চোখের জন্যে পীড়াদায়ক, বিপজ্জনকও বটে, কারণ সামনের পথ থেকে চোখ তুললেই ভারসাম্য হারাবার অবস্থা হয়। বিন্দুটার কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করলো ও, মন দিলো স্কিইং-এ।

আবার যখন চোখ তুললো রানা, বার্গটা অনেক কাছে চলে এসেছে, কিন্তু মার্কের কোনো চিহ্ন দেখলো না। সম্ভবত বার্গটাকে টপকে ওপারে চলে গেছে সে। ওর জন্যে সে কি ওত পেতে আছে কোথাও? শুয়ে আছে, যাতে রানা তাকে দেখতে না পায়? তার পথ থেকে সরে এলো রানা, ঘুরপথে বার্গটার উত্তর দিকে এগোলো। খানিক পরই যাত্রা অন্ত-২



আবার তাকে দেখতে পেলো ও, বাগটার একটা পাশ ধরে এগোচ্ছে, আধ মাইলটাক দূরে। হ'জনের মাঝখানে বরফ প্রান্তর সমতল, সাদা চাদরের মতো। শক্ত বরফে ঘন ঘন স্টিক গোঁথে গতি আরো বাড়িয়ে তুললো রানা।

বাগের প্রায় শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে মার্ক, এই সময় রানাকে দেখতে পেলো সে। থামলো, ঠাণ্ডা বাতাসে ভর করে তার গলা ভেসে এলো। রানার উদ্দেশ্যে চিৎকার করছে, স্টিক নাড়ছে। তার সঙ্গীরা যেনন ভেবেছিল, সে-ও ঠিক তাই ভাবছে, উদ্ধারকর্মীদের একজন সদস্য রানা।

রাইফেলটা নিঙ মুক্ত করলো রানা, কক করলো, একটা কজিতে কি স্টিকের লুপ পেঁচিয়ে নিয়ে সামনে এগোলো। চরম মুহূর্ত উপস্থিত হওয়ার ঠুর হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে।

রানার এগোবার ধরনের মধ্যে এমন একটা কিছু রয়েছে, সতর্ক হয়ে সেল মার্ক। চিৎকার থামলো তার, স্থির হয়ে গেল। সাদা বরফে কালো মুতিটা টার্গেট হিসেবে আদর্শ, তবু কোনো বুঁকি নিতে চাইছে না রানা। দূরত্ব আরো কমিয়ে আনলো ও।

‘কে তুমি?’ মার্কের চিৎকার পরিষ্কার শুনতে পেলো রানা।

‘রানা,’ পান্টা চিৎকার করলো ও।

এক সেকেণ্ড স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো মার্ক, তারপর ডাইভ দিলো সেক্স আর রাইফেল লক্ষ্য করে। রাইফেল নিয়ে দাঁড়ায়নি, গুলির শব্দ হলো। সেক্সটাকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করছে মার্ক। আড়াল থেকে আরো একটা গুলি করলো সে। ঘুরলো রানা, বৃত্ত রচনা করে আরেক দিকে এগোলো, বাগের পশ্চিম প্রান্তের আশ্রয়টুকু পেতে চায়। রানা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাওয়ার আগে আরো কয়েকটা গুলি করলো

মার্ক। কিন্তু রানা একটা সচল টার্গেট, প্রতিটি বুলেট ফাঁকা স্বারগা দিয়ে ছুটে গেল।

বার্গের চারদিকে কিন্তু তকিমাকার আকৃতি নিয়ে ফুলে-ফেঁপে আছে তুখার, সেগুলোর আড়ালে থেকে বার্গের নিচের কাঁধ লক্ষ্য করে এগোলো রানা। ওখানে পৌঁছে, আকাশ থেকে নেমে আসা বুলন্ত বরফ পাঁচিলের তলায়, পাঁচিলটা যেখানে নিচের বরফ স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয়েছে, রানা দেখলো মার্কের স্নেজটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বার্গের পাশে কোথাও কোনো আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে মার্ক। সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে সামনে বাড়লো রানা। গুলির একটা শব্দ হলো, বরফ কুচিগুলো তীরের মতো আঘাত করলো রানার নাকে-মুখে। কেটে যাওয়ায় গাল থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করলো। হাত দিয়ে রক্তটুকু মুছে রাইফেল তুললো রানা। মার্ককে দেখতে পাচ্ছে ও, ফোলাফাঁপা একটা বরফ-স্তম্ভের আড়াল থেকে উকি দিচ্ছে, রাইফেলটা তৈরি। গুলি করতে যাবে রানা, এই সময় মার্কের পিছনে কি যেন নড়ে উঠতে দেখলো ও। ঘন ঘন লাফ দেয়ার ভঙ্গিতে সাদা বরফের ওপর দিয়ে কালো একটা প্রকাণ্ড বল যেন ছুটে আসছে মার্কের দিকে। দেখছে রানা, ধীরে ধীরে পরিষ্কার হলো চেহারাটা। প্রকাণ্ড একটা জন্তু। কালো নয়, গায়ের রঙ তামাটে, তার সাথে খয়েরি ফোঁটা। আগেও দেখেছে রানা, চিনতে অসুবিধে হলো না। ওটা সী-লেপার্ড, কীলার হোয়েল-এর পর অ্যান্টার্কটিকার হিংস্রতম প্রাণী।

বিপদটা মার্কও প্রায় একই সময়ে টের পেলো, রাইফেলসহ ঘুরে গেল সে। গুলির তীব্র আওয়াজ শুনলো রানা। প্রকাণ্ড পশুটা থামলো না। আরো একটা গুলি করলো মার্ক। একেবারে কাছ থেকে, পয়েন্ট ব্র্যাক রেঞ্জ। পরমুহূর্তে মার্কের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো সী-লেপার্ড।

পিছন দিকে হোঁচট খেলো মার্ক, চোখের পলক পড়ার আগেই দেখা  
গেল বরফে চিং হয়ে রয়েছে সে, সী-লেপার্ড তার বুকের ওপর।

এবড়োখেরডো বরফের ওপর দিয়ে যতোটা সম্ভব দ্রুত এগোলো  
রানা। মার্ক তার পাশের বরফে রক্তের দাগ ফেলছে। জানোয়ারটা-  
কেও টলমল করতে দেখলো রানা, সম্ভবত আহত হয়েছে। মাত্র কয়েক  
গজ দূর থেকে ওটাকে লক্ষ্য করে পুরো মাগাজিন শেষ করলো রানা।  
এরপর সামনে এগোলো। সী-লেপার্ড স্থির হয়ে আছে, পড়ে আছে  
মার্কের ছই পায়ের ওপর। মার্ককে কসরৎ করতে দেখলো সে, পা  
ছটো মুক্ত করার চেষ্টা করছে। রাইফেলটা এখনো তার এক হাতে  
ধরা, অপর হাতে বোন্ট ধরে টানাটানি করছে। সেটা কেড়ে নিয়ে  
দূরে ছুঁড়ে দিলো রানা। রাগে ছঃখে ফোঁপাচ্ছে মার্ক।

সী-লেপার্ডের বুক থেকে কল কল শব্দে রক্ত বেরোতে দেখলো ও।  
মার্কের পাঞ্জরের কাছে অনেকটা জায়গার মাংস অদৃশ্য হয়েছে। রানার  
দিকে ফিরে কিছু বলার চেষ্টা করলো সে, তারপর জ্ঞান হারালো।

নিহত সী-লেপার্ড আর ওটার নিচে আটকে পড়া আহত মার্ক—  
দৃশ্যটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো রানা, তারপর হঠাৎ তাড়ু-  
পর্যটক উপলব্ধি করলো। মার্ক রোসেটের এখানেই সমাপ্তি, আর  
ওদের জন্যো নতুন আশা। এখানে রয়েছে, হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারে  
রানা, এক হাজার পাউণ্ড তাজা মাংস আর চবি। এগুলো নতুন জীবন  
দিতে পারে এরিকাকে, আইসবার্গে আটকা পড়া ক্রুদের বাঁচতে  
সাহায্য করতে পারে। যেভাবেই হোক, দূর একটা জেদ জন্ম নিলো  
রানার বুকে, ফিরে যেতে হবে ওকে। আবার ওকে পেরোতে হবে  
ছর্গম বরফরাজ্য, সাথে মাংস আর চবির বোঝা নিয়ে।

মার্কের স্নেজটা টেনে অজ্ঞান দেহের পাশে আনলো রানা। তাঁবু

খাটানো শেষ করেই সী-লেপাডের তলা থেকে মার্কের পা ছুটো টেনে  
বের করলো, তাকে তুলে দিলো মেজে। মারা যাচ্ছে মার্ক। যতোটুকু  
জালোভাবে শারা যায় ক্ষতটায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধলো ও। তারপরই হাতে  
ছুরি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো নিজের কাছে।

চবি দিয়ে খালা স্টোভের আগুনে গরম হলো তাঁবুর ভেতরটা,  
আগুনে সেদ্ধ করা হলো মাংসের বড় কয়েকটা টুকরো। গন্ধে জ্বিত  
পানি এসে গেল রানার। মার্ক খেতে পারবে না, কোনো রকমে তার  
গলার ভেতর খানিকটা গরম রক্ত ঢেলে দিলো ও। মাত্র কয়েক মিনিটে  
এতো খেলো রানা, গত কয়েকদিনে যা খেয়েছে তারচেয়ে পরিমাণে  
অনেক বেশি। গরম রক্ত যেন নতুন শক্তি এনে দিলো মার্ককে, জ্ঞান  
ফিরে পেয়ে কাত হলো সে। একবার রানাকে জিজ্ঞেস করলো, ওর  
সাথে আইসবার্গ থেকে আর কে এসেছে। রানার জবাব শুনে হাসলো  
মার্ক, বললো, 'তারমানে সবাইকেই মরতে হচ্ছে, কেউ পার পাবে না।'।  
এরপর আবার সম্ভবত জ্ঞান হারিয়ে ফেললো সে। ভালমত কন্ট্রল  
মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো রানা। ঘুম এলো না হঠাৎ করে এক সাথে  
ভূতনেক বেশি খাবার খেয়ে ফেলায়। পেটে ব্যথা নিয়ে জেগে থাকলো  
ও। কিন্তু শরীর ক্লান্ত, ঘুম একসময় ঠিকই এলো।

দম আটকে মারা যাচ্ছে, এরকম একটা অনুভূতি নিয়ে জেগে  
উঠলো রানা। বসলো, অক্সিজেনের অভাবে হাঁপাচ্ছে, কাশছে অন-  
বরত। কি ঘটেছে কিছুই বুঝতে পারলো না কয়েক মুহূর্ত। তারপর  
দেখলো, গোটা তাঁবু ধোঁয়ায় ভরে গেছে। মার্কের দিকে ফিরলো, নেই  
সে। চোখে পানি, ঝাপসা দৃষ্টিতে ধরা পড়লো তাঁবুর একদিকে  
গোলাপী আভা। ক্রল করে বেরিয়ে এলো ও, দেখলো সী-লেপাডের  
গায়ে আগুন বুলছে, আগুনের একটা শিখা এরইমধ্যে প্রায় ছুঁয়ে  
যাচ্ছে। অন্তঃ-২

কেলোছে তাঁবুর একটা দিক, সেদিকটা কালচে হয়ে গেছে। শিখা  
গুলোর মাঝখানে তুয়ে আছে মার্ক, চেয়ে রয়েছে রানার দিকে, তাঁর  
কৃপা কুটে রয়েছে ওর হুটোখে। রক্তে ভিজে লাল হয়ে রয়েছে  
হাতের। পুড়ছে আগুনে, কিন্তু পরোয়া নেই।

পা ধরে টেনে মার্কের শরীরটা সরিয়ে আনলো রানা, তুমার চেয়ে  
সী-লেপার্ডের গা থেকে আগুন নেভালো। কি থেকে কি দট্টে  
আন্দাজ করতে অনুবিধে হলো না ওর। সী-লেপার্ড পুড়িয়ে কল  
করতে চেয়েছিল মার্ক, তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে খুন করতে চেয়েছিল  
রানাকে। আগুনের মাঝখানে পাওয়া গেল হুঁজোড়া দি, আদ-পোত  
অবস্থায়।

আগুন নিভিয়ে আবার তাঁবুতে ফিরে এলো রানা। নিভের ত্রি  
আগুন থেকে মার্ককে টেনে বের করার সময় সে বেঁচে ছিলো, এটুকু  
বলতে পারবে ও, কিন্তু কত রাতে কতটা কষ্ট পেয়ে মারা গেছে বলতে  
পারবে না। কমাট বরফ হয়ে গেছে লাশটা। তাকে সারটা রাত  
বাইরে কেলো রাখার মারা গেছে সে, এটাই জানে রানা, কিন্তু সেজন্যে  
ওর মনে কোনো অনুশোচনা বা অপরাধবোধ নেই। মার্কের লক্ষ  
সেখো সামান্যতম হুঃখও হলো না ওর।

ভাগ্য ভালো যে সময়মতো ফিঙলো রক্ষা করতে পেরেছে ও। পুড়-  
লেও ব্যবহার করা যাবে। স্টোভ ধোলে মাংস সেদ্ধ করলো ও, বাও-  
য়ার পর তুমার দিয়ে ঢাকলো লাশটা। তাঁবুটা খুললো না, আবার  
বন্ধনা হলো ফিরতি পথে, সাথে মার্কের ফি, প্রচুর মাংস আর চবি।

পশ্চিম দিকে ছুটছে জোরালো বাতাস। রওনা হবার খানিক পরই  
পায়ের নিচে বরফের নড়াচড়া টের পেলো রানা। তবে পথে কোনো  
বিপদ ঘটলো না, দ্রুতবেগে এগোতে পারলো ও। হুপুরের খানিক পর

ক্যাম্পে ফিরে আসতে পারলো।

ফিরেই এই অভিযানের সবচেয়ে বড় আঘাতটা পেলো রানা। মারা গেছে এরিকা। রানা চলে যাবার পর তার আর জ্ঞান ফিরে আসেনি। তুষারের উঁচু একটা স্তূপ দেখালো ওকে হোলস্টাড, ওটার নিচে তাকে প্রাণ কবর দিয়েছে। পিঠে তীব্র বাতাস নিয়ে স্তূপটার সামনে দাঁড়িয়ে অবুধ শিশুর মতো কাঁদলো রানা। সবাই এতো শোকাহত যে এগিয়ে এসে রানাকে সাহুনা দেয়ার কথা ভাবলো না কেউ। জীবনে কখনো আর কারো জন্যে এভাবে কাঁদেনি রানা, অথচ এরিকা পিটারসেন না ছিলো ওর আত্মীয় বা বান্ধবী, না ওর সাথে তার কোনো বিশেষ সম্পর্ক ছিলো। এরিকার জন্যে শক্তির উৎস প্রচুর মাংস আর চবি নিয়ে এসেছে রানা, কিন্তু এসে দেখে কোমলমতি সাহসী মহৎপ্রাণ মেয়েটা কররে শুয়ে আছে। তার মৃত্যু অপ্ৰয়োজনীয় আর অর্থহীন মনে হলো ওর। প্রতিবার, সব সময়, কেন শুধু ভালোমানুষটিকেই চলে যেতে হয়? 'যখন তাকে আমরা কবর দিই,' রানার পাশ থেকে বিড়বিড় করে বললো হোলস্টাড, 'তাকে খুব সুখী দেখাচ্ছিল, স্যার।' অশ্রুর ধারণা, এরিকা পিটারসেন তার বাবার দেখা পোয়েছে। ডাফ পিটারসেনও যদি মারা গিয়ে থাকেন, সবদিক থেকে ব্যাপারটা ভালোই হলো। এরিকা তার বাবাকে বড় বেশি ভালোবাসতো।

আগের দিন মার্কের স্নেহ-চিহ্নিত পথ ধরে খুঁজতে বেরিয়ে হেল-মুটসেন আর ডানকানের বুটগুলো পেয়ে গেছে হোলস্টাড, তুষারের নিচে পুঁতে রেখেছিল মার্ক। নতুন ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রক্ষণা হতে কাজেই কোনো বাধা নেই ওদের। ভরপেট খাবার খেয়ে সবারই ওদের পেট ব্যথা করলো, সবচেয়ে অসুস্থ বোধ করলো হোলস্টাড। বাতাস ঠেলে এগোতে হলো ওদেরকে, যতোই সামনে এগোলো ততোই পথের যাত্রা অশুভ-২

চিহ্ন ঝাপসা হয়ে এলো। এবারের যাত্রাটা দুঃস্বপ্নের মতো লাগলো ওদের। পায়ের নিচে বরফ আড়মোড়া ভাঙছে, ভেঙে যাচ্ছে এখানে-সেখানে, হঠাৎ চিড় ধরছে, ফাটল তৈরি হচ্ছে চওড়া। তুষারের ঢাকনি সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসছে সিংহ গর্ত।

আইসবার্গটা না থাকলে সী-লেপার্ডটাকে কখনোই ওরা খুঁজে পেতো না। কারণ বেলা তিনটের দিকে দেখা গেল পথচিহ্ন বলে কিছু নেই, সামনে পড়ে আছে দিগন্তবিস্তৃত সমতল বরফ প্রান্তর। পশ্চিম ঘেঁষা সূর্যের ঝাপসা আলোয় আইসবার্গটাকে কালো একটা পিণ্ড দেখালো, আইসবার্গ বলে চেনাই যায় না। তবু ওটার দিকেই দল নিয়ে এগোলো রানা। এক ঘণ্টা পর দ্বিতীয় একটা তাঁবু টাঙানো হলো, স্টোভে ফুটেছে সী-লেপার্ডের মাংস।

আবার শুরু হলো বরফ ভাঙচুর আর বিক্ষোভের শব্দ। প্রতি মুহূর্তে মোচড় খাচ্ছে প্যাক আইস। আইসবার্গটাও গতি পেয়েছে। তবু সে-রাতে মড়ার মতো ঘুমালো ওরা। সকালের দিকে ঘুম ভাঙলো রানার রাইফেল বিক্ষোভের মতো শব্দ শুনে। হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর প্রবেশপথের কাছে এলো ও, বাইরে ঘোর অন্ধকার, কিছুই দেখতে পেলো না। পেটে চিনচিনে ব্যথা নিয়ে আবার শুলো রানা, ঝিমুনি এসে গেল, পানির কলকল ছলছল আওয়াজ কানে নিয়ে।

তারপর যখন আবার ঘুম ভাঙলো, তাঁবুর খোলা মুখের কাছে পানি দেখে আতকে উঠলো রানা। ওর পা দুটো অসাড় হয়ে গেছে, স্লিপিং ব্যাগের নিচের দিকটা ইম্পাতের মতো কঠিন। ব্যাপারটা যেন বরফের তেতর পা ঢুকিয়ে শুয়ে আছে রানা। মাথাটা তাঁবুর বাইরে বের করলো ও। গোটা দৃশ্য বদলে গেছে। তুষার ঢাকা সমতল বরফ প্রান্তরের বদলে রানা দেখতে পেলো বুকে বরফের অসংখ্য ভাসমান

টুকরো নিয়ে জলরাশির বিস্তার। ওদের চারদিকে সমস্ত বরফ ভেঙে  
 টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, এলোমেলো বাতাসের ধাক্কা খেয়ে পর-  
 স্পরের গায়ে ঝুঁতো মারছে। হাঁটু আর কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথাটা  
 উচু করার চেষ্টা করলো রানা, ওর নড়ে ওঠার সাথে একপাশে কাত  
 হলো মেঝে। রানা বুঝতে পারলো, ছোটো একটা বরফের টুকরোয়  
 পড়ে রয়েছে ও। টুকরোটোর কিনারায় লাফালাফি করছে ছোটো ছোটো  
 ঢেউ। পিছু হটে তাবুতে ঢুকলো রানা, বরফের কিনারা থেকে নেমে  
 গেল পানি। আতংকে নীল হয়ে গেল রানার চেহারা, কাঁপা হাতে  
 তাবুর আরেক দিকের ক্যানভাস সরালো ও।

খোলা পানির একটা চ্যানেলে ভাসছে বরফের টুকরোটো, মূল বরফ  
 প্রান্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ ফুট দূরে সরে  
 এসেছে জোড়া তাবুসহ। ঠিক কোন্ জায়গাটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে  
 তা-ও বোঝা গেল, স্নেহগুলো আর সী-লেপার্ডের ধড়টা দেখে। বিপুল  
 পরিমাণ মাংস ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে, দৃষ্টি আর মনের জন্যে  
 অত্যন্ত পীড়াদায়ক একটা দৃশ্য। ওদের তাবুতে তিন কি চার পাউণ্ড  
 মাংস আছে। শেষ হতে কতোকণ! শক্তি আর জীবনের একমাত্র যে  
 উৎসটা ওদের ছিলো, ক্রমশ সেটা থেকে দূরে সরে আসছে ওরা।

বোকার মতো পানির দিকে তাকিয়ে আছে রানা, এই সময় হঠাৎ  
 কি যেন একটা নড়ে উঠতে দেখে তীক্ষ্ণ হলো ওর দৃষ্টি। পানির ভেতর  
 দিয়ে ধীরে ধীরে একদিক থেকে আরেকদিকে চলে যাচ্ছে। চিনতে  
 পেরে আতকে উঠলো রানা। ওটা একটা কীলার হোয়েল। যেন  
 রানার দৃষ্টি অনুভব করতে পেরে ঘুরলো সেটা, সরাসরি এগিয়ে এলো  
 ভাসমান বরফটার দিকে। উচু ডরসল ফিন ওর সামনে দিয়ে চলে  
 গেল, তারপর রানা সুনতে পেলো তাবুর আরেক দিকে গিয়ে নাক দিয়ে



শব্দ করছে সেটা। শব্দটা কুংসিত, শূকরের ঘোঁৎ ঘোঁৎ করার মতো। অপেক্ষা করছে রানা, দম ফেলতে ভয় পাচ্ছে। বরফের টুকরোটা উঠে মল করে উঠলো, ওটার নিচে দিয়ে যাচ্ছে হিংস্র কীলার হোয়েলের আরো শব্দ ছাড়লো সেটা। ক্যানভাস ছেড়ে দিয়ে চিৎ হলো রানার আড়ষ্ট শরীর নিয়ে অপেক্ষা করছে তিমিটা কখন ফিনের এক ধাক্কা উল্টে দেবে ভাসমান বরফটাকে।

আওয়ার্ডটা এখন রানার পাশে। অনড় পড়ে থাকলো ও, সর্দীনের আগালো না। ঘটনাটা ঘটান আগে না জানাই ভালো। তাহলে শুধু শেষ মুহূর্তের যন্ত্রণাটুকু ভোগ করবে ওরা।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়ার্ডটা যেন অনন্তকাল ধরে শুনছে রানা। বরফটা একবার কাত হলো, ঝাঁকি খেলো, শক্ত হলো রানার সমস্ত পেশী, অকস্মাৎ পানির ওপর ছিটকে পড়ার অপেক্ষায় রয়েছে, অপেক্ষায় রয়েছে হিম ঠাণ্ডা আর কীলার হোয়েলের ধারালো চোয়ালের কামড় খাবার। পানির ছল্লনির সাথে বরফটাও ধীরে ধীরে ছলতে লাগলো। ধীরে ধীরে ঢিল পড়লো রানার পেশীতে। সেই সাথে নিস্তেজ হয়ে পড়লো শরীর, ঘুম পেলো।

বরফের সাথে বরফের নরম ধাক্কা লাগার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রানার। বরফের তলাটা কিসের সাথে যেন ঘষা যাচ্ছে। প্রথম ধরে নিলো রানা, তিমিটা ফিরে এসেছে। কিন্তু বরফের সাথে বরফের শব্দ শুনে অন্য একটা সম্ভাবনার কথা ভাবলো ও। তাঁবুর কাপড় তুলে উকি দিলো ও, মনে আশা চ্যানেলের অপর দিকে চলে এসেছে ওরা। যেখানে মাংস আছে ওদের।

কিন্তু ভাগ্য ওদের বিপক্ষে। স্নেজ আর মাংস সিকি মাইল দূরে, মাঝখানে ফালো পানি। তবে, ওদের বরফের ছোটো টুকরোটা বড়,

নিরৈকশর্শন একটা মাঠের কিনারায় ভিড়েছে। সঙ্গীদের ঘুম ভাঙালো ও, তাঁবু গুটিয়ে চলে এলো বড় মাঠের মাঝখানে। নতুন করে তাঁবু টাঙানো হলো, রান্না করা হলো অবশিষ্ট মাংসটুকু। খেতে বসে একটা বিষয় নিয়েই মাথা ঘামালো রানা, কিভাবে সী-লেপার্ডের মাংস ফেরত পাওয়া যায়।

চ্যানেল পেরিয়ে ওপারে যাওয়া অসম্ভব। বাতাস রয়েছে, প্রতি-মুহূর্তে মাঝখানের ব্যবধান বাড়ছে। বরফের এক মাঠ থেকে আরেক মাঠে যাবে, নাকি পানি আবার জমাট বাঁধার অপেক্ষায় থাকবে, সিদ্ধান্ত নিতে পারলো না রানা। বরফ প্রান্তর ভেঙে টুকরো টুকরো হবার একটা অর্থ হতে পারে প্যাক আইসের কিনারায় পৌঁছচ্ছে ওরা। কথাটা বলতে মাথা নাড়লো হেলমুটসেন, হাত তুলে পশ্চিমদিকটা দেখালো। 'বরফের সাদা উজ্জলতা দেখতে পাচ্ছেন না? প্যাক আইস আরো অনেক মাইল লম্বা।' কথাটা সত্যি। ওদের পশ্চিমে কোথাও ওয়াটার-স্কাই দেখা গেল না। চোখ ধাঁধানো সাদা উজ্জলতার বরফ আর মেঘ মিলিত হয়েছে দিগন্তরেখার কাছে।

হোলস্টাডের স্বর, প্রলাপ বকছে সে। ওকে নিয়ে কোথাও যাবার কথা ভাবা যায় না। ফেলে যাবারও প্রশ্ন ওঠে না—অন্তত রানার মনে ওঠে না। কাল সকালে সী-লেপার্ডের মাংস উদ্ধার করার একটা উপায় হতে পারে ভেবে আজকের দিনটা নড়াচড়া না করার সিদ্ধান্ত নিলো ও।

সেদিনই এক সময় রানার ঘুম ভাঙালো হোলস্টাড। তার মুখ ধব-ধবে সাদা, চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড়। স্বরে কাঁপছে সে, তবে ঘোরটা কেটে গেছে। 'আপনাকে আপনার কর্তব্যের কথা ভুললে চলবে না, অনারেল ক্যাপটেন। কারো জন্যে আপনার আটকা পড়া

চলে না।’

কি বলতে চায় হোলস্টাড জানে রানা। মাথা নাড়িলো ও। ‘তাকে কোনো লাভ নেই,’ বললো ও। হোলস্টাডের কথাগুলো শুধু রানা এরিকার প্রতি ফিরিয়ে আনলো।

‘আইসবার্গে ওরা রয়েছে, ওদের কথা ভাবুন, স্যার,’ ফিসফিস করে বললো হোলস্টাড। ‘আমার কি হবে? এই জায়গাটা আমার জন্য একটা অপছন্দ নয়। দয়া করে এখানেই আমাকে মরতে দিন, স্যার। আমাকে ফেলে আজই আপনারা রওনা হয়ে যান।’

‘কে বললো তুমি মারা যাচ্ছে?’ ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলো রানা, যদিও জানে হোলস্টাড কেন, কেউই ওরা বাঁচবে না।

পরদিন ওদের ঘুম ভাঙলো রোদ আলমলে সকালে। আইসবার্গটার ওপর সী-লেপার্ড যেখানে পড়ে আছে, ওদের তাঁবু থেকে তার দূরত্ব বেড়ে ছ’মাইলে দাঁড়িয়েছে, মাঝখানে কালো চ্যানেল। উত্তর আর দক্ষিণ দিকে প্যাক আবার জোড়া লেগে অবিচ্ছিন্ন নিরেট চেহারা ফিরে পেয়েছে। আবার যখন তাঁবুতে ফিরে এলো রানা, দেখলো মারা গেছে হোলস্টাড। স্থির দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে। হাতের আলতো স্পর্শে চোখের পাতা ছটো বন্ধ করে দিলো ও।

সঙ্গীদের ঘুম ভাঙালো রানা। বরফ খুঁড়ে কবর দেয়া হলো হোলস্টাডকে। এক অর্ধে বেঁচে গেছে সে, তাকে আর কোনো সংগ্রাম করতে হবে না। ‘এবার আমরা রওনা হতে পারি, তাই না?’ রানাকে জিজ্ঞেস করলো হেলমুটসেন। শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে লোকটা, চেহারা হয়েছে বনমানুষের মতো। সে এবং ডানকান, দু’জনেই ক্রস্ট-বাইটের শিকার। মার্ক ওদের বৃট চুরি করার পর বরফে খালি পায়ে

হাঁটাইটি করার ফল । তবু যেতে চায় তারা ।

সাথে শুধু একটা তাঁবু, মিসিং ব্যাগ আর রাইফেলটা নিলো ওরা । স্বেচ্ছ নেই, সব বয়ে নিয়ে যেতে হবে । রওনা হবার আগে খেয়ে নিলো ওরা—মাংস কাল রাতেই শেষ করেছে, খেতে হলো আধ পোড়া দুধি । কম্পাস বের করে দিক নির্ণয় করলো রানা, তারপর বেরিয়ে পড়লো, নির্জন বরফরাজ্যে একা ফেলে যাচ্ছে হোলস্টাডকে, ঠিক যেমন এরিকাকে ফেলে এসেছে ।

কেউ ওরা সবল নয় । স্বিগুলো পালা করে ব্যবহার করলো ওরা । কিন্তু খানিক পরই ওগুলো ফেলে দিতে হলো, কারণ ভারসাম্য রক্ষার শক্তি ওদের কারো মধ্যেই নেই । পেটের গোলমালে ভুগছে তিনজনই, ভুগছে যে-যার পা নিয়ে । তিনজনই এখন ওরা ফ্রস্টবাইটের শিকার । দ্রুত-অসুস্থ হয়ে পড়ছে ডানকান । আর নরওয়ের লোক হুঁজুন পরা-জয় স্বীকার না করা পর্যন্ত হাল না ছাড়ার একটা জেদ এখনো পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করছে রানাকে ।

পীড়াদায়ক, অসহ্য মন্তরগতিতে এগোচ্ছে ওরা । সামনে খোলা ধাঁসি থাকলে ঘুরপথ ধরতে হচ্ছে । তবে বরফ প্রায় সমতলই বলা যায় । ছপুর নাগাদ টেনেটেনে দু'মাইলের মতো এগোলো ওরা, ইতো-মধ্যে ডানকানকে বাকি দু'জনের কাঁধে ভর দিতে হয়েছে । সাদা উজ্জলতা আগুনে গরম করা সূঁচের মতো বিঁধছে রানার চোখে, এমন সব জিনিস দেখতে শুরু করলো যেগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই । মাঝে মধ্যে চোখ ধাঁধানো সাদা উজ্জলতার ভেতর সামনের গোটা দৃশ্য হারিয়ে যাচ্ছে । রানা জানে, এটা হলো স্নো-ব্লাইন্ডনেস-এর শুরু ।

ওদের যদি নির্দিষ্ট একটা গন্তব্য বা লক্ষ্যস্থল থাকতো, সেটা হয়তো শরীর আর প্রকৃতির সাথে এই লড়াইয়ে খানিকটা শক্তি যোগাতো

ওদেরকে । কিন্তু কোনো গন্তব্য বা লক্ষ্যস্থল নেই ওদের, আছে শুধু  
অস্পষ্ট একটা আশা, যার ওপর ওদের কারো একদিনে বিশ্বাস নেই ।  
এগিয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না । বরফের ওপর শুয়ে পড়ার  
এচও একটা ইচ্ছের সাথে তুমুল লড়াই বেধে গেল রানির মনে, উঠে  
হলো পড়ে যেতে, শাস্তিময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে । নতুন  
আকাজক ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো, সেই সাথে কোকুনের ক্যান্ডি  
আর ভিমির মাংস খুঁজে পাবার আশা ম্লান হতে থাকলো ।

সেদিন রাতে ডানকান চাইলো তাকে যেন ওরা ফেলে যায় । দুর্বল,  
ওদের সাথে যাবার শক্তি নেই । কিন্তু তাকে ফেলে যাবার উপায় নেই  
ওদের । তাবু তো মাত্র একটা । যদি যেতে হয়, এক সাথে যেতে হবে,  
মরতে হলে এক জায়গায় থেমে সবাইকে মরতে হবে । হেলমুটসেন  
তাকে বললো, সে একটা কাপুরুষ । ডানকানকে কাপুরুষ বলাটা তার  
উচিত হয়নি, তবে গাল খেয়ে ওদের সাথে থাকলো সে । পরদিন  
সকালে লগে রানা লিখলো, 'আজ চোদ্দ দিন । আমরা চলেছি । তবে  
আজই বোধহয় আমাদের চলার শেষ দিন । আইসবার্গে যারা রয়েছে,  
আজ তাদের খাবার শেষ হয়ে যাবে ।'

দুর্বলতার কারণে শুধু হয়তো উঠে দাঁড়াবার শক্তি অবশিষ্ট আছে  
ওদের, এই শরীর নিয়ে সেদিন সকালে প্রায় এক মাইল হাঁটলো  
ওরা । রানির চোখের অবস্থা এতো খারাপ যে ওর পক্ষে কোর্স স্থির  
করা অসম্ভব কঠিন হয়ে উঠলো । ওদের গলা জড়িয়ে ধরে আসছে বটে  
ডানকান, প্রায় অজ্ঞানই বলা যায় তাকে । মাঝে মধ্যেই, হাঁটার মধ্যে  
প্রলাপ বকছে সে নিজের ভাষায় । অন্তত তার চেয়ে রানা বা হেলমুট  
সেনের অবস্থা বানিকটা ভালো ।

হৃদয়ের কিছুক্ষণ পর শেষবারের মতো তাবু টাঙালো ওরা । কাজটা

করার সময় হঠাৎ হেলমুটসেন রানার বাহু খামচে ধরে সাদা উজ্জ-  
লতার দিকে একটা হাত লম্বা করলো। 'পেঙ্গুইন,' কর্কশ আওয়াজ  
বেরুলো তার গলা থেকে। পেঙ্গুইন ? তারমানে খাবার। চোখ কুঁচকে  
তার দেখানো পথে তাকালো রানা। কালো কিছু বিন্দু ছাড়া কিছুই  
দেখতে পেলো না। তবু রাইফেলটা তুলে নিলো ও। প্রার্থনা করলো,  
হু'একটা যেন পড়ে। লক্ষ্যস্থির করবে কি, রাইফেলটা এতো ভারি  
লাগলো যে ধরে রাখাই দায়। ব্যারেলটা স্থির করা গেল না। হেল-  
মুটসেনকে বরফের ওপর হাঁটু গেড়ে বসতে বললো ও, তারপর তার  
কাঁধে রাখলো ব্যারেল। কালো বিন্দুগুলো আকৃতি পেতে শুরু করেছে  
রানার চোখে। মাথার ওপর ডানা তুলে হাঁটাইটি করছে ওগুলো।  
ট্রিগারটা যেন গোঁ ধরেছে, নড়বে না। একটা চিংকার শুনলো রানা।  
লক্ষ্যস্থির করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হলো। হঠাৎ কারণটা আবিষ্কার  
করলো ও। শুধু দুর্বলতা নয়, একটা চিংকার ওর মনোযোগ কেড়ে  
নিচ্ছে।

তারপর হঠাৎ বুঝলো, ওগুলো পেঙ্গুইন নয়। পেঙ্গুইন কখনো  
তাদের মাথার ওপর ডানা ঝাপটায় না। চিংকারগুলো বাস্তব, প্রতি-  
ভ্রম নয়। রাইফেল ফেলে দিয়ে সামনে এগোলো রানা। মৃতিগুলো  
মিলিয়ে গেল, সাদা উজ্জলতা সম্পূর্ণ গ্রাস করলো সেগুলোকে। ও,  
আচ্ছা, গোটা ব্যাপারটাই তাহলে স্বপ্ন ছিলো। বরফের গায়ে কালো  
বিন্দুগুলোয় কোনো পদার্থ ছিলো না, বিন্দুগুলোরই কোনো অস্তিত্ব  
ছিলো না। মতিভ্রম ঘটেছে ওর, অবাস্তব জিনিস দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু  
তাহলে আমি এমন হাসাকর ভঙ্গিতে দৌড়াচ্ছি কেন ? নিজেকে  
জিজ্ঞেস করলো রানা। শুনতে পেলো, কর্কশ আওয়াজ বেরিয়ে  
আসছে ওর গলা থেকে। এরপর হোঁচট খেলো, সবগে পড়ে গেল

বরফের ওপর। নরম ভূমির, হাড়-টাড় না ভাঙার সেটাই কারণ।  
 অসুস্থ আরামদায়ক, পরম স্বস্তিকর একটা ক্রান্তি অনুভব করলো রানা  
 শরীরে। কিন্তু মনে মনে জানে, ওকে উঠে দাঁড়াতে হবে। এই আশা  
 মের অসুস্থতাটা মৃত্যুর লক্ষণ, কিন্তু আত্মসমর্পণ করতে রাজি নয় ও।  
 ইচ্ছেশক্তির সাহায্যে দাঁড়বার চেষ্টা করলো রানা, কিন্তু শরীরের শক্তি  
 কুলিয়ে উঠতে পারলো না। না পারায়, স্বস্তিকর অনুভূতিটা আর  
 বাড়লো। লড়ার ইচ্ছেটা মরে যাচ্ছে। মারিকার কথা মনে পড়লো  
 একবার, আইসবার্গের কানিসেনা খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। কিন্তু ও  
 কিছু করার নেই, কিছুই করার নেই। ভাবলো, আমি শেষ। বিদায়  
 পৃথিবী। অনেক দিয়েছো, অনেক পেয়েছি তোমার কাছে, আশা  
 কোনো অভিযোগ নেই, আমি কৃতজ্ঞ। ধীরে ধীরে অচেতন হয়ে  
 পড়লো রানা।

গারে উত্তাপ আর নাকে খাবারের গন্ধ নিয়ে জেগে উঠলো রানা।  
 ফেটে যাওয়া রক্তাক্ত ঠোঁটের ফাঁকে একটা চামচ ঢোকানো রয়েছে।  
 গরম তরল পদার্থটুকু গেলার সময় পেটের ভেতর নাড়িগুলো মোড়  
 দিয়ে উঠলো। চোখ খুললো রানা। মণির পিছনে ব্যথা অনুভব  
 করলো। ক্যাপটেন জোনাস ভেনসম বুকে রয়েছে ওর ওপর। প্রথমে  
 বিশ্বাস করতে পারলো না ও। নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছে, মারা  
 গেছে। তবে দ্বিতীয়বার জোর করে ওর ঠোঁটের ফাঁকে চামচ ঢোকালে  
 তুলটা ভাঙলো, বেঁচে আছে ও। বুঝতে পারলো, যেভাবেই হোক  
 কোকুনের বেঁচে যাওয়া ক্রুদের সাথে মিলিত হয়েছে ও। জোনাস  
 ভেনসমের মুখটা ওর চোখের সামনে বারবার আসা-যাওয়া করলো।  
 কর্কশ একটা চিঁ-চিঁ আওয়াজ শুনলো ও, ওর নিজের গলা। ভেন-

সমকে অনেক কথা বলার আছে ওর। কিন্তু কি বলবে, কোনটা আগে  
বলা দরকার, খেই হারিয়ে ফেললো। জ্ঞান হারালো আবার।

পরে জানতে পেরেছে রানা, ষোলো ঘণ্টা ঘুমিয়েছে ও। অবশেষে  
যখন চোখ মেললো, ফ্যাক্টরি শিপ কোকুনের সেকেণ্ড অফিসার  
পেরেটকে দেখতে পেলো ও। ওদেরকে জরুরী যে কথাটা বলতে চায়  
ও, হঠাৎ সেটা মনে পড়লো, 'ওদের কোনো খাবার নেই!' নিশ্চয়,  
কিন্তু অচেনা কণ্ঠস্বর।

রানার বুকে একটা হাত রেখে ওকে শান্ত থাকতে বললো পেরেট।  
'চিন্তা করবেন না, মিঃ রানা,' বললো সে। 'শান্তভাবে শুয়ে বিশ্রাম  
নিন। ক্যাপটেন ভেনসম, আপনি জানেন, কাল রওনা হয়ে গেছেন,  
নয়জন লোক নিয়ে। আমরাও তাঁকে অনুসরণ করবো।'

'কিন্তু পরিস্থিতি কতোটুকু গুরুতর তা সে জানে না!' প্রায় চিৎ-  
কার করে উঠলো রানা। 'তার জ্ঞান নেই ওরা...'

মুহূ হেসে রানার হাতে মুহূ চাপড় দিলো পেরেট, রানা যেন অবোধ  
শিশু। 'সব জানেন তিনি। আপনি ঘোরের মধ্যে প্রলাপ বকছিলেন।  
একটানা চার ঘণ্টা ধরে শুধু একটা কথাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলে গেছেন  
আপনি—ওদের খাবার নেই, কেউ পৌঁছতে না পারলে সবাই ওরা  
মারা যাবে। মিঃ ভেনসম রওনা হবার পরও ধামানো যায়নি আপ-  
নাকে। দুটো স্নেক আর একহুঁপা চলার মতো মাংস নিয়ে গেছেন  
তিনি। আপনাকে তিনি জানাতে বলেছেন, চিন্তা করবেন না, ওখানে  
তিনি পৌঁছবেনই।'

'কিন্তু ফাঁকটা! সে তো ফাঁকটার কথা জানে না।' ককিরে উঠলো  
রানা। 'আধমাইল চওড়া চ্যানেল আছে, এখান থেকে মাত্র ক'মাইল  
পূর্বে...'

যাত্রা অশুভ-২



‘সে কথাও আপনি আমাদের বলেছেন, বছবার,’ বললো পেরেট, রানার বাহুতে চাপ দিলো। ‘এখন আপনাকে বিশ্রাম নিতে হবে, কেননা শিগগিরই আমরা রওনা হবো। প্রস্তুতি প্রায় শেষ করে এনেছি।’

আইসবার্গের দিকে যাওয়ার দীর্ঘ পথটা স্মরণ করলো রানা। জানে, ওর দ্বারা এই পথ পেরোনো সম্ভব নয়। ‘আমাদেরকে গাইড হিসেবে একজন লোক দাও, আর কিছু খাবার। আমরা কোকুনের ক্যাম্পে চলে যাই। তোমাদের সাথে গেলে আমরা বোঝা হয়ে দাঁড়াবো, পিছিয়ে দেবো তোমাদের।’

মাথা নাড়লো পেরেট। ‘ক্যাপটেন ভেনসন কাল রাতে আপনাকে কি বলেছেন আপনি শোনেননি। কোকুনের ক্যাম্প ছেড়ে আসা হয়েছে। চনি আর মাংস ছিলো প্রচুর, কিন্তু আমাদের সাথে কোনো বোট ছিলো না। কাজেই যেখানে বোট আছে সেখানে পৌঁছুতে হবে আমাদের। স্নেজগুলোর অর্ধেক নিয়ে রোজ আমরা যাত্রা শুরু করেছি, তারপর ফিরে গেছি বাকি স্নেজগুলোর জন্যে। যখন দেখলাম আমরা দুর্বল হয়ে পড়ছি, বেশিরভাগ স্নেজ ফেলে রেখে এলাম।’

‘সব মিলিয়ে কতো লোক তোমরা?’ জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘ছেচল্লিশজন, ক্যাপটেনের সাথে যারা গেছে তাদের ধরে।’

‘বোটে সবার জায়গা হবে না,’ বললো রানা। ‘যদি ধরেও নিই ওগুলো নামাবার জন্যে খোলা পানি কখনো পাই আমরা।’

‘হ্যাঁ, তাই। কিন্তু আমরা একমত হয়েছি সবাই একসাথে থাকবো। যতোকণ বরফ জমাট থাকবে, ততোকণ এগোবো আমরা, যতোকণ বোটে রাখা মাংস শেষ না হয়। এভাবে আমরা হয়তো শীতকালটা টিকে যেতে পারি। কোনো এক সময় প্যাক আইস থেকে বেরিয়ে

যাবে আইসবাগটা। তখন যার শক্তি-সামর্থ্য বেশি, সাউথ জর্জিয়ায় পৌঁছানার চেষ্টা করবে সে, রিলিফ নিয়ে ফিরবে। এটাই আমাদের গ্ল্যান, একমাত্র আশা।’

‘ওদের সাথে কি কর্নেল রোসেটও আছেন?’ জিজ্ঞেস করলো রানা।

মাথা নাড়লো কোকুনের ফার্স্ট অফিসার। ‘কর্নেল ওয়াকার রোসেট মারা গেছেন। তাঁর হাট, জানেনই তো। তিনি মারা গেছেন বিসমার্ক আমাদের কাছে পৌঁছানোর একদিন পর।’

‘বিসমার্ক?’ হাঁ হয়ে গেল রানা। ‘তুমি লিবার্টি-ফাইভের মেট, সেই বিসমার্কের কথা বলছো?’

মাথা ঝাঁকালো পেরেট। ‘অনেক কষ্ট করে বহু ঘুরে আমাদের পেয়ে গেছে। সে আর তার দুই সঙ্গী আমাদের ক্যাম্পে পৌঁছায় দিন পনেরো আগে।’

‘কিন্তু...অসম্ভব!’

পেরেট হাসলো। ‘আপনারা ওদের পাঁচজনকে ডুবে যেতে দেখে-ছেন, এই তো? আপনাদের বরফের মাঠটা ডিগবাজি খাচ্ছিলো, তাই না? আসলে হয়েছে কি, ওরা আপনাদের চোখের আড়ালে চলে যাবার পর পানিতে পড়েনি, ছোটো একটা বরফের টুকরোয় ছিটকে পড়েছিল। অবশ্য পাঁচজনের মধ্যে বাকি দু’জন ডুবে যায়। বিসমার্ক আর তার অপর দুই সঙ্গীকে আপনারা দেখতে পাননি কারণ ডিগবাজিরত মাঠের পিছনে ছিলো ওরা। পরিস্থিতি শান্ত হবার পর ভাসতে ভাসতে লিবার্টি-থ্রুর ক্যাম্পটা পেয়ে যায় ওরা। তারপর...।’

‘তুমি বলতে চাইছো লিবার্টি-থ্রুর ক্যাম্প তখনো ওখানে ছিলো?’  
বাধা দিলো রানা।

মাথা ঝাকালো পেরেট ।

তাহলে মার্ক রোসেটের ধারণাটা ভুল ছিলো না । ওখানে থাকলে আইসবার্গটা তার নাগাল পেতো না । ওখানে থেকে গেলে একা পালাবার একটা সুযোগ হতো তার । ‘বলে যাও,’ তাগাদা দিলো রানা ।

‘বলার ভেতন কিছু নেই । ওখানে ওরা খাবার আর আশ্রয় পায়, ফলে ঝড়টাকে সামলে নেয় । তারপর আমরা তেলে আগুন ধরিয়ে দিই, সংকেতটা দেখে রওনা হয় ওরা । আসার পথে শেষ পাঁচদিন অভুক্ত ছিলো । আমরা, কিন্তু পৌঁছতে পারে ।’

‘তোমাদের কাহিনীটা কি ? কোকুন ডুবে যাবার পর কি ঘটলো ?’

ফ্যাক্টরি শিপের সাথে রেডিও হারায় তারা, ফলে উদ্ধারকারী জাহাজগুলোর সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি । ওদের মতো, তারাও একটা আইসবার্গে আশ্রয় নেয় । আইসবার্গটার দিকে যাবার পথে মারা যায় অনেকেই । ডাফ পিটারসেন একটা ফাটলের গভীরে ভলিয়ে যান । বিসমার্ক পৌঁছলে তার কাছ থেকে তারা জানতে পারে নিজের দল নিয়ে মাসুদ রানা অপর একটা আইসবার্গের কানিসেটিকে আছে, সাথে চারটে বোট । স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে রওনা হবার জন্যে তৈরি হলেন ক্যাপটেন জোনাস ভেনসম । কিন্তু ঝড়ের মুখে পড়ে ফিরে আসতে হলো দলটাকে । গোটা দল নিয়ে দ্বিতীয়বার যাত্রা শুরু করার প্রস্তুতি চলছে, এই সময় এসে পৌঁছায় রানারা ।

আবার ক্রান্তি বোধ করলো রানা । পেরেটের পিছনে অস্পষ্ট ভাবে হেলমুট বার্গারকে দেখতে পেলো ও । ঘুমিয়ে পড়ার আগে রানার চোখের সামনে একে একে এরিকা, সাভিক আর ডাফ পিটারসেনের ছবি ভেসে উঠলো । যারা ভালো, যারা যোদ্ধা, তাদেরকেই সবসময় বলি হতে হয় ।

পরদিন সকালে, খুব ভোরে খাওয়াপাওয়া সেরে, একটা তাঁবু বাদ দিয়ে ক্যাম্প গুটিয়ে ফেললো পেরেট। প্লেজের প্রথম কনভয় আর নিজের সব লোকজন নিয়ে রওনা হলো আইসবার্গের উদ্দেশ্যে। তাঁবুতে থাকলো রানা, হেলমুটসেন আর ডানকান। প্লেজের কনভয়ে করে তিমির মাংস নিয়ে যাচ্ছে পেরেট। ওদেরকে সাহায্য করার জন্যে মাত্র একজন লোককে রেখে গেল সে। ওরা আরো বিশ্রাম নেবে, তারপর সময়-সুযোগ বুঝে রওনা হবে একই দিকে। কিছুই ওদেরকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে না, যেতেও হবে কাছাকাছি নতুন একটা ক্যাম্প, এরমধ্যে অবশ্য পেরেটের দল আরো দু'বার একই পথে আসা-যাওয়া করবে।

পূর্ব দিকে যাত্রা, ফেলে আসা পথ ধরে, এগোনোর গতি অসহ্য রকম শ্লথ। প্রথম তিন দিন এক ক্যাম্প থেকে আরেক ক্যাম্প পৌঁছতে পারলো ওরা, তারবেশি সামনে এগোতে পারলো না। সেই খোলা পানি, ঠিক যেখানে ওরা বঞ্চিত হয়েছিল সী-লেপার্ডের মাংস থেকে, তার কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া গেল না। খানিকটা ঘুরপথ ধরে দক্ষিণ দিকে এগোলো ওরা, কিন্তু পানির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। বরফ সম্ভবত আবার জোড়া লেগে গেছে, কিংবা জমাট বেঁধে আবার বরফে পরিণত হয়েছে চ্যানেলটা।

ধীরে ধীরে এগোলো ওরা, পিছনেরগুলো গুটিয়ে সামনে ফেলা হয় নতুন ক্যাম্প। চলতে চলতেই প্রথম রানা আর হেলমুটসেন, তারপর ডানকানও সুস্থ-সবল হয়ে উঠলো, গোটা দলের সাথে একই দিনে একাধিক ক্যাম্প পেরিয়ে যেতে পারছে ওরাও।

ধীরে ধীরে দিগন্তরেখার ওপর মাথা তুলতে দেখলো ওরা সার বাঁধা আইসবার্গগুলোকে। ওগুলোকে দেখে বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল রানার

মন । ওগুলোয় একটায় অপেক্ষা করছে পাগলাটে স্বভাবের এক অভাগা,  
ডঃ নিক শেডি । তাকে এরিকা পিটারসেনের যত্নসংবাদ শোনাতে  
হবে রানার । না, দারিঘটা এড়িয়ে যাবে রানা । ক্যাপটেন ভেনসমকে  
দিয়ে বলাবে । তবু, নিক শেডি ক্ষেদ ধরবে । কিভাবে ঘটনাটা ঘটলো,  
রানার মুখ থেকে বিস্তারিত শুনতে চাইবে সে । এরিকার প্রেম, যত্ন,  
আর স্নেহে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সুখী একজন মানুষ হয়ে উঠতে পারতো  
নিক শেডি । কি বলবে তাকে রানা ? সে নিজেই এরিকার সাথে  
আসতে চেয়েছিল, রানা তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ক্ষান্ত করে, তার জায়-  
গায় নিজে আসে । এরিকাকে রানার হাতে ছেড়ে দিয়েছিল নিক  
শেডি । মানুষ মারা যায়, শেষ পর্যন্ত কেউই বাঁচে না, এই চিন্তা-  
টাও বিষয় ভাবটুকু রানার মন থেকে দূর করতে পারলো না । একটু  
সাস্থ্য শুধু এই যে মারা যাবার সময় এরিকা জানতো না তার বাবা  
মারা গেছেন । কিন্তু নিক শেডির সামনে রানা দাঁড়াবে কিভাবে ?

এক সময় ওদের আইসবার্গের গোটা চেহারা দেখতে পেলো ওরা ।  
ওটার পিছনে আকাশ কালো—পানির প্রতিফলন পড়েছে মেনে,  
একটা ওয়াটার-স্কাই । আর কালোর গায়ে সাদা স্তম্ভের মতো খাড়া  
হয়ে আছে আইসবার্গটা । চোখ ঝালা করছে, পেরেটের বিনোকিউ-  
লার নিয়ে তাকালো রানা । তাকালো যেখানে ওদের ক্যাম্পটা আছে ।  
বা থাকার কথা ।

কিন্তু কই ? কোথায় গেল ? কানিসটা আছে, এখনো অস্পষ্ট আর  
ঝাপসা, কিন্তু সেখানে প্রাণের কোনো লক্ষণ রানার চোখে ধরা পড়লো  
না । কালো বা কালচে এক-আধটা দাগও তো থাকার কথা, তাই না,  
ভাবলো রানা । কিন্তু কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না । বোটগুলো গেল  
কোথায় ? তাবু ?

মারিকা আর নিক শেভির কথা মনে পড়ে যাওয়ায় চোখ তটো  
খালা করে উঠলো রানার ।

## এগারো

কিন্তু পরদিন, অর্থাৎ নয়-ই এপ্রিল ছপুরে, ওরা দেখলো বরফের ওপর  
দিয়ে কালো কিছু মূর্তি ওদের দিকে এগিয়ে আসছে । রানা ভাবলো,  
হু, গড ! ভেনসম ফিরে আসছে ! কেউ তারা বেঁচে নেই ! নিক  
শেভির কথা ভেবে এখন আর মন খারাপ নয় ওর । মন জুড়ে টনটনে  
একটা ব্যথা শুধু মারিকার জন্যে । ছ'জনে ওরা ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ  
পেলো না, ভালোবাসা তো পরের কথা । শুধু বন্ধু হিসেবেও মারিকার  
মতো একটা মেয়ের সাথে পরিচয় হওয়া ভাগ্যের কথা । এমনকি  
কোনো সম্পর্ক না থাকলেও, হুনিয়ার বুকে মারিকার মতো একটা  
ভালো মেয়ে বেঁচে আছে, তাকে রানা চেনে, এই অনুভূতিটাও অত্যন্ত  
আনন্দের । মূর্তিগুলোকে হাত নাড়তে দেখলো রানা, তাদের চিংকারও  
শুনতে পেলো । চোখে ঝাপসা দৃষ্টি, একজনকেও চিনতে পারলো না ।  
সেজের রশি ছেড়ে দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে তাদের দিকে ছুটলো  
ও ।

সংখ্যায় ওরা বোধহয় ছ'জন, প্রথমজনই জোনাস ভেনসম । এতো-  
 কণে নিশ্চিত হলো রানা, অন্যান্যরা সবাই মারা গেছে । ভেনসম  
 আলিঙ্গন করলো রানাকে, ওর পিঠে চাপড় মারলো, গলা ছেড়ে  
 হাসছে । পরমুহূর্তে কে যেন ভেনসমের বুক থেকে হ্যাঁচকা টানে  
 ছিনিয়ে নিলো ওকে, আরেক বৃকে আশ্রয় পেলো রানা । কার বুক,  
 কে তাকে টেনে নিলো, প্রথমে বুঝতে পারলো না রানা । নরম বুক ।  
 কাঁপা শরীর । ফোঁপাচ্ছে মারিকা, কখনো হাসছে, কখনো কাঁদছে ।  
 দুটো শরীর এক হয়ে রয়েছে, ছ'জনের মাঝখানে এক তিল ফাঁক  
 রাখতে ইচ্ছুক নয় মারিকা পাইটন । রানাকে এমন শক্তভাবে জড়িয়ে  
 রাখলো সে, যেন দ্বিতীয়বার ওকে হারাতে রাজি নয় ।

মারিকার মুখের দিকে তাকাবার সুযোগ পেয়ে রানা দেখলো,  
 মেয়েটা এখন আর রোগা বা ম্লান নয় । আবার সে তার শরীরে উথলে  
 ওঠা যৌবন ফিরে পেয়েছে, মুখে লাবণ্যের ঢল । চোখ দুটো থেকে  
 অব্যোরে পানি গড়াচ্ছে, কিন্তু সারা মুখে লেগে রয়েছে আপেল রাঙা  
 হাসি । 'আমি ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছো,' হাসি আর কান্নার  
 মাঝে বললো সে । 'তারপর ক্যাপটেন ভেনসম এসে জানালেন, তুমি  
 ভালো আছো । ওহ, রানা,' রানার বৃকে কপাল ঘষলো সে, 'তোমাকে  
 ছাড়া ফিরতে চাইনি আমি । তুমি মারা গেছো জানলে আমি হেরে  
 যেতাম !'

ছ'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে রাখলো রানা মারিকাকে । মেয়েটা  
 আহত পাখির মতো কাঁপছে । ঠাণ্ডা বাতাস হঠাৎ করেই যেন গরম  
 হয়ে উঠেছে, সেই সাথে সমস্ত দুর্বলতাও এক নিমেষে কাটিয়ে উঠেছে  
 রানা । 'বাকি সবাই ?' জিজ্ঞেস করলো ও । 'ওরা সবাই ভালো তো ?'  
 'হ্যাঁ,' বললো মারিকা । 'সবাই ভালো । শুধু নিক শেডি বাদে ।'

‘নিক শেডি বাদে ?’ নিম্পলক তাকিয়ে থাকলো রানা । ‘কি বলছো তুমি ?’

‘তোমরা রওনা হবার ছ’দিন পর,’ বললো মারিকা । ‘মাত্র ছ’দিন পর, আইসবার্গের ওপর ঝাঁক বেঁধে হেঁটে এলো কয়েক হাজার পেঙ্গুইন । প্রথম দিন ছশোটা মারা হলো, পরদিন আরো বেশি । বলা যায় খাবারের মধ্যে গড়াগড়ি যাবার অবস্থা হলো আমাদের । সংকেত দেয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তোমরা দেখতে পেলো না । এরপর তোমাদের ফেরত আনার জন্যে একাই রওনা হয়ে গেল নিক শেডি । আমরা রাজি হইনি, তাই রাতের অন্ধকারে, কাউকে কিছু না জানিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায় সে । সকালে আমরা দেখলাম স্নেহ চিহ্নিত পথ ধরে যাচ্ছে সে । ক্যাপটেন ভেনসমের কাছে জানলাম, তোমাদের ধরতে পারেনি সে ।’

‘না,’ বললো রানা, ‘ওর ঘাড় থেকে যেন বিরাট একটা বোঝা নেমে গেল । নিক শেডি আর নেই । জীবনের তিক্ততা থেকে রেহাই পেয়েছে সে । এরিকার কথা তাকে বলতে হবে না রানার ।’

‘আমাদের পাঁচ মাইলের মধ্যে খোলা পানি আছে ।’  
নিক শেডির কথা ভাবছিল, মারিকা কথাটা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করতে শুনতে পেলো রানা । বলে চলেছে মারিকা, ‘আইসবার্গটা আমাদেরকে নিয়ে উত্তর দিকে ভেসে যাচ্ছে । প্যাক আইস ভাঙতে শুরু করেছে । এখন শুধু জোরালো বাতাস বইলেই হয়, কয়েক দিনের মধ্যে প্যাক আইস থেকে বেরিয়ে যাবে আইসবার্গ ।’

ভেনসমের দিকে ফিরলো রানা । ‘সত্যি ?’ ওর চেহারায় আশার আলো । ‘প্যাক আইস ভেঙে বেরিয়ে যাবার কোনো সম্ভাবনা আছে আইসবার্গটার ?’

যাত্রা অশুভ-২



‘সম্ভাবনা বলছেন কেন,’ জবাব দিলো ভেনসম, ‘নির্ধাং তাই ঘটতে  
যাচ্ছে। এক হপ্তার মধ্যে পানিতে বোট নামাতে পারবো আমরা।’

‘কিন্তু তারপর?’ জিজ্ঞেস করলো রানা, চারদিকে চোখ বুজিয়ে  
কোকুনের বেঁচে যাওয়া জুদের দিকে তাকালো।

রানা কি ভাবছে বুঝতে পারলো ভেনসম। ‘তারপর? তারপর আমরা  
ছড়িয়ে পড়বো। চারটে বোট রয়েছে আমাদের, সাহায্য পানার চারটে  
সুযোগ। বাকিরা সবাই আইসবার্গের ক্যাম্পেই থেকে যাবে। অসুস্থ  
একটা বোট নিশ্চয়ই প্যাক আইস থেকে বেরুতে পারবে।’

ধুরলো রানা, তাকালো আইসবার্গটার দিকে। দেখে যথেষ্ট নিরেট  
বলেই মনে হলো, কিন্তু প্যাক আইস আর খোলা সাগরের মধ্যে  
পার্থক্য আছে। সাউথ আটলান্টিকের পাহাড় সমান উচু ঢেউ একের  
পর এক আঘাত করছে আইসবার্গটাকে, সেটার কানিসে অসহ্য কিছু  
মানুষ কুলছে, দৃশ্যটা কল্পনা করতে গিয়ে শিউরে উঠলো রানা। তার-  
পর ভাবলো, ওই খুদে বোটগুলোরই বা কি অবস্থা দাঁড়াবে? শীত চলে  
আসছে। শুরু হতে যাচ্ছে ঝড়ের মৌসুম। একের পর এক আসতেই  
থাকবে। উদ্ধারকারী জাহাজগুলো এতো দিনে নিশ্চয়ই হতাশ হয়ে  
বন্দরে ফিরে গেছে। বোটগুলো কারো চোখে পড়ার কথা নয়। আইস-  
বার্গে যারা থাকবে তাদেরও উদ্ধার পাবার কোনো উপায় হবে না।

মারিকার কাঁধে হাত রেখে তাকে নিজের দিকে টানলো রানা।  
‘চিন্তা করো না, মারিকা—শুধু প্রার্থনা করো ভাগ্য দেন আমাদের নিয়ে  
আর কোনো নোংরা খেলা না খেলে।’

ঝট করে মুখ তুলে রানার চোখে তাকালো মারিকা, ওর চোখে কি  
যেন খুঁজলো, তারপর ফিসফিস করে বললো, ‘তুমি এরিকার কথা  
ভাবছো, তাই না?’

ছোট্ট করে মাথা ঝাকালো রানা।

‘এরিকার মতো মেয়ে হয় না। তবু, কি জানো, বাপকে ছাড়া সুখী হতে পারতো না মেয়েটা। এরিকার জীবনে ডাফ পিটারসেনের যে ভূমিকা ছিলো কেউ তা পূরণ করতে পারতো না, নিকও না।’ মাথা নত করলো সে, তারপর আবার যখন রানার দিকে তাকালো, তার চোখে বিষাদের স্নান ছায়া দেখতে পেলো রানা। ‘ঠিক যেমন আমার বাবার জায়গাটা কেউ দখল করতে পারবে না।’ হাসলো সে, নির্দয় বাস্তবতা উপলব্ধি করার সময় মাথুষ যেমন করুণ হাসে।

স্নেজের মুখগুলো ঘুরে গেছে, এবার ওরাও অতিকায় আইসবার্গের দিকে ঘুরে হাঁটা ধরলো। রানা আর মারিকা পরস্পরের হাত ধরে আছে। বরফ পাহাড়ের পিছনে কালো মেঘে খোলা পানির প্রতিফলন। আরো সামনে, অনেক দূরে সাউথ জর্জিয়া। ক্রুদের একজন গান গাইতে শুরু করলো। নরওয়ের একটা গান, জাহাজে থাকার সময় একবার শুনেছে রানা, বাড়ি ফেরার আনন্দ নিয়ে লেখা। এক মুহূর্ত, ‘—ই সবাই তার সাথে গলা মেলালো। ভাষা বোঝে না, পুরটা ভালো করে ধরতে পারে না, তবু রানারও ইচ্ছে হলো ওদের সাথে গায়। বাড়ির কথা মনে পড়তেই আবেগে থরথর করে উঠলো বুকটা। তারপর নিজেও জানে না কখন সবার সাথে গাইতে শুরু করেছে ও।

## বারো

একুশে এপ্রিল। সাউথ জর্জিয়া থেকে একটা রেডিও মেসেজ এলো, সেই সাথে জুনিয়ার খবরের কাগজে আবার শিরোনাম হলো ফ্যাক্টরি শিপ কোকুন। মেসেজটা পৌঁছলো পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর অসলো অফিসে। তাতে বলা হলো, 'কোকুনের কয়েকজন ক্রুকে নিয়ে ছোটো বোট সাউথ জর্জিয়ায় পৌঁচেছে।'

দু'ঘণ্টা পর আরেকটা মেসেজ এলো, জান। গেল অ্যান্টার্কটিকার একটা আইসবার্গের ওপর আটকা পড়েছে কোকুনের বেঁচে যাওয়া বেঁচে কিছু ক্রু। মেসেজটা দীর্ঘ, তাতে বলা হয়েছে, 'ছোটো বোট পৌঁচেছে, প্রতিটিতে ছয়জন করে লোক। কমান্ডার : জেনাস ভেনসম আর ভ্যান হেলমুটসেন। ক্রুদের তালিকা পরে জানানো হবে। আরও ছোটো বোট এখনো পৌঁছায়নি। ওগুলোর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জোহান্স পেরেট আর রিক্টেট বিসমার্ক। সাতষট্টিজন মানুষ, তাদের সাথে মিস মারিকা পাইটনও আছেন, খোলা সাগরে ভাসমান একটা আইসবার্গে আটকা পড়েছেন। পজিশন—৬২.৫৮ দক্ষিণ, ৩০.৪৬ পশ্চিম। নিখোঁজ বোটগুলোর সন্ধানে চারটে ক্যাচারকে পাঠানো

হয়েছে। স্টেশন রিলিফ শিপ 'সী ফেরার' ফিরে এলেই আইসবার্গে আটকা পড়া লোকদের উদ্ধারের জন্যে পাঠানো হবে।'

বরফ ঘেরা দ্বীপ সাউথ জর্জিয়ায় শীত চলে আসছে। আর দু'দিন পর হোয়েলিং স্টেশন বন্ধ করে দিয়ে দ্বীপ ত্যাগ করা হবে। ক্যাপটেন ভেনসম মাত্র দু'দিন আগে পৌঁছতে পেরে বেঁচে গেছেন। গোটা কাহিনীটা অবিশ্বাস্য।

ঝড়ের মুখে পড়ে প্যাক আইস থেকে বেরিয়ে এলো আইসবার্গটা দশ-ই এপ্রিল। যে কানিসে ওরা আশ্রয় নিয়েছে, বাতাস সরাসরি সেদিকেই আঘাত হানছে। ডেউয়ের নাখা থেকে নিষ্কিপ্ত বরফ কুচির অবিরাম হামলা সহ্য করে কানিস আঁকড়ে চব্বিশ ঘণ্টা টিকে থাকলো ওরা। তারপর আইসবার্গটা ঘুরে যাওয়ায় বাতাসের আঘাত থেকে বাঁচার সুযোগ হলো। এরইমধ্যে তারা প্যাকিং কেস আর ক্যানভাস তুলে যাত্রার জন্যে তৈরি করেছে বোটগুলো। এরপর তারা নতুন করে কানিসে ধাপ তৈরি করলো। এগারো তারিখ সকালে বাড় খামতে বোটগুলো তারা কানিস থেকে পানিতে নামালো।

পাহাড় সমান উচ্চ ডেউ আর প্রায় বিরতিহীন অন্ধকারের ভেতর দ্রুতবেগে আইসবার্গের গা থেকে সরে গেল চারটে বোট। একটানা দশটা দিন তারা উত্তর অর্থাৎ সাউথ জর্জিয়ার দিকে এগোলো, পাল-গুলো সাহায্য করলো ওদেরকে।

জোনাস ভেনসম, তাঁর রিপোর্টে এই বোট জাহাজ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'সাগরে আমার বত্রিশ বছর কেটেছে, এর আগে কখনো বেঁচে থাকার জন্যে এমন কষ্ট ও সংগ্রাম করতে হয়নি আমাকে। প্রতিটি বোটে ছয়জন করে জু ছিলো। ঘুমোবার কোনো জায়গা নেই। প্রতি মুহূর্তে পানি সঁচতে হয়েছে, বোটের কিনারা থেকে খসতে

হয়েছে বরফ। বরফ থসাতে দেরি হওয়া মানে, সবার জন্যে সন্নিহিত সমাধি, কারণ বোট নির্ধারিত উন্টে যাবে। মাত্র একদার আমি ফাঁদে দেখা পাই। শীত এতো প্রচণ্ড যে জুরা সবাই হার্ডবোর্ড-এর মতো শক্ত হয়ে গিয়েছিলো, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে না ডললে হাত-পায় রক্ত চলাচল শুরু হতো না। পাঁচ দিনের দিন ফ্রস্টবাইটের বিরুদ্ধে হলাম আমরা। নেভিগেশনে আমি ভুল করছি, সাউথ জর্জিয়াকে পাশ কাটিয়ে যাবো, এই ভয় আমাকে পাগল করে রেখেছিল।

বেয়াদা একটা ঝড়ের কবলে পড়ে তারা। তারপর দশ দিনের বিশেষ বিকেলে সাউথ জর্জিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণটা দেখতে পারি। সকালে দ্বীপটার উত্তর প্রান্তে পৌঁছায় প্রথম বোট, হেলমুটসেনের বোট এক মাইল পিছনে ছিলো।

খবরের কাগজে লেখা হলো, 'মাত্র দুটো বোট নিরাপদ আশ্রয় পৌঁছতে পেরেছে। বাকি ক্রুদের কপালে কি ঘটেছে তা বোধহয় কোনোদিনই আমরা জানতে পারবো না। হতে পারে তারা সাউথ জর্জিয়াকে পাশ কাটিয়ে আটলান্টিকে ঢুকে পড়েছে। হতে পারে তাদের বোট উন্টে যায়। তাদের খুঁজতে বেরিয়ে ক্যাচারগুন্ডে রিপোর্ট করেছে, কিছুই দেখতে পায়নি তারা।

আর মাত্র কয়েক হাজার মধ্যে শীত এসে যাবে, আবার জমাট বাঁধবে প্যাক আইস, অচল হয়ে পড়বে আইসবার্গগুলো। প্যাক আইস পেরিয়ে নির্দিষ্ট একটা আইসবার্গে পৌঁছনো তখন আর সম্ভব হবে না। কানিসে আশ্রয় নেয়া সাতষট্টিজন মানুষকে বাঁচাবার জন্যে আবার কবে গ্রীষ্মকাল আসবে তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু সবাই জানে, ওখানে যারা আছে, গোটা একটা শীতকে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। যদিও, শীত এসে পড়ার আগেই জোনাস

ভেনসম ওদেরকে উদ্ধার করার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করছেন। তাঁর একমাত্র ভরসা 'সী ফেরার'।

ছোট ভেসেলটা বাইশ তারিখে সাউথ জর্জিয়ায় পৌঁছুলো, দেরি না করে ফুয়েল ভরা হলো তাতে। ক্যাপটেন ভেনসম আর একজন অফিসারকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল জাহাজটা। খবরের কাগজে এই প্রথম ছাপা হলো, 'এখন জানা গেছে মাসুদ রানা নামে এক বাংলাদেশী ক্যাপটেন আইসবার্গের কানিসে থেকে যাওয়া সাতষট্টিজন ক্রুর নেতৃত্বে রয়েছেন।'

এরপর শুরু হলো খাসকৃষ্ণকর অপেক্ষার পালা। তুমুল বর্ষণ আর ঝড়ের কারণে ক্যাচারগুলো বোট ছোটোর খোঁজ বাদ দিয়ে ফিরে এলো স্টেশনে। সী ফেরার থেকেও কোনো মেসেজ এলো না। জাহাজটা আলাগা প্যাক আর উত্তাল সাগরে আটকা পড়েছে। ছাব্বিশ তারিখে জাহাজের ক্যাপটেন, জেফারসেন, জাহাজ ঘুরিয়ে নিয়ে স্টেশনে ফেরার জন্যে জেদ ধরলেন। কিন্তু জোনাস ভেনসম তাঁকে রাজি করালেন জাহাজ আর ক্রুর ওপর ঝুঁকি নিতে। অসুত আরো কয়েক ঘণ্টা ভ্রাবহ দুর্বোলের মধ্যে থাকতে চাইলেন তিনি।

সেদিনই সন্ধ্যায় সুখবরের প্রথম অংশটা পৌঁছুলো। সাউথ জর্জিয়া থেকে রেডিও মেসেজ এলো, 'সী ফেরার আইসবার্গ দেখতে পেয়েছে। প্যাক আইস বিপুল, আবহাওয়ার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ।'

তারপর... আর কোনো খবর নেই। পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টা সাউথ জর্জিয়া কোনো মেসেজ দিতে পারলো না। খবরের কাগজে আন্টার্কটিকার ভ্রাবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে লেখা হলো। সময় যতোই বয়ে চললো, কোনো মেসেজ না আসায়, সবাই প্রায় ধরে নিলো উদ্ধারের চেষ্টা বাতিল ঘোষণা করা হবে।

তারপর, আটশ তারিখে, ছপুরের কিছুক্ষণ পর, সবাই যে ঘরটার জন্যে রক্তধাসে অপেক্ষা করছিল, পৌঁছুলো সেটা।

‘আইসবার্গে আটকা পড়া জুদের উদ্ধার করা হয়েছে। সাতঘণ্টা-জনই সুস্থ ও নিরাপদ। গ্যাক আইস আর উত্তাল সাগর উদ্ধার কাছে দেরি করিয়ে দেয়। রয়টার।’

ই্যা, কোকুন বিপর্যয় কাহিনীর এখানেই সমাপ্তি। অবশ্য আরো খানিকটা যোগ করার আছে, বিশেষ করে এক বছর পর যখন বেল-কার্টে নতুন আরেকটা কোকুন তৈরি হতে চলেছে। আশা করা হচ্ছে আগামী মৌসুমে তৈরি হয়ে যাবে সেটা। পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর মালিকানা এখন মিস মারিকা পাইটনের হাতে চলে এসেছে। মিস মারিকা পাইটন কোম্পানীর চেয়ারম্যান। বি. বি. সি.-র সংস্কারদাতার এক প্রশ্নের উত্তরে মারিকা জানিয়েছে, প্রতি বছরই অ্যান্টার্কটিকার যেতে সে ইচ্ছুক। সে নাকি তার জীবনে এমন একটা কিছু খুঁজে পেয়েছে যার জন্যে অ্যান্টার্কটিকার কাছে চিরঞ্চনী হয়ে থাকবে।

পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর নতুন হেডকোয়ার্টার এখন লওনে। ওখানেই মারিকা পাইটন বসে। তার চেয়ারে ঢোকান আগে একটা হলঘর পেরোতে হয়, সেই হলঘরের দেয়ালে, দরজার ঠিক উপরে পাশাপাশি এরিকা পিটারসেন আর নিক শেডির ছবি টাঙানো আছে। ছবিগুলো বিখ্যাত জাপানী ফটোগ্রাফার কাইসু ওকোমোর তোলা। মারিকা পাইটনের চেয়ারে, তার ডেস্কের ওপর রয়েছে অচেনা এক যুবকের ফটো।

এখানে একটা কথা উল্লেখ না করলেই নয়। উদ্ধার পাবার পর, সবাই যখন কেপটাউনে ফিরে এলো, আর সবাইকে হোটেলে বা ঘর যার নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাওয়া গেলেও, পুরো সাতটা দিন মিস মারিকা

পাইটনের কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি।

কোথায় ছিলো মারিকা এই সাত দিন? কেউ না জানলেও, রানা জানে। কারণ ওর সাথে সে-ও ছিলো নির্জন সৈকতের কিনারায়, এক পর্ণকুটিরে। দিনগুলো ওদের সারি সারি নারকেল গাছের ছায়ায় অথবা সাগরের পানিতে কেটেছে, রাত কেটেছে চন্দ্রালোকিত সৈকতে হাত ধরাধরি করে হেঁটে অথবা পাথরের ওপর পাশাপাশি বসে। দেখতে দেখতে কুরিয়ে গেল সময়টা, সাতটা দিন যেন সাত সেকেন্ডের বেশি স্থায়ী হলো না। ছ'জনেই দীর্ঘশ্বাস ফেললো। অ্যাটর্নটিকার অনেকগুলো মাস ওরা কাটিয়েছে বটে, কিন্তু পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পায়নি। ঘটনাচক্রে বেশিরভাগ সময় বিচ্ছিন্ন ছিলো ওরা। ফিরে আসার পরও কারো হাতে সময় নেই। রানাকে ফিরে যেতে হবে দায়িত্ব আর কর্তব্যের ডাকে। আর মারিকাকে হাল ধরতে হবে পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর। কয়েকটা মাস সাংঘাতিক ব্যস্ত থাকতে হবে ছ'জনকে। কাজেই ছ'জনের মনে একটা সংশয় জাগলো, ওরা কি পরস্পরকে ভুলে যাবে?

শেষ দিনটা ছ'জনেরই খুব অস্থিরতার ভেতর কাটলো। বিশেষ কথা বললো না রানা, মারিকাও চুপচাপ। তারপর প্রসঙ্গটা মারিকাই তুললো। 'একটা কিছু করা যায় না, রানা? এমন একটা কিছু, যাতে আবার আমাদের দেখা হয়? আমরা যাতে কাছে আসার সুযোগ পাই। একজন বন্ধু আরেকজন বন্ধুকে কখনো ভোলে না। আমরা সেরকম বন্ধু হতে পারি না?'

ঠিক এই কথাগুলোই বলতে চাইছিল রানা। মাথা ঝাঁকালো ও। 'কেন নয়? কেন আবার আমাদের দেখা হতে পারে না? হাতের কাজ শেষ হলে, তোমাকে আমি ফোন করতে পারি, তোমার ব্যস্ততা যাত্রা অন্তত-২



কমলে তুমি আমাকে চিঠি লিখতে পারো। ছ'জনের সময়-সুযোগ  
যতো অবশ্যই দেখা হতে পারে আমাদের।'

রানার কোমর জড়িয়ে ধরে সাগরের দিকে ফিরলো মারিকা। 'কথা  
দিলাম, তোমাকে আমি লিখবো। তোমাকে আমি আরো ভালোভাবে  
জানতে চাই।'

'আমার আবার ধৈর্য কম,' চোখে ছুঁট হাসি নিয়ে বললো রানা।  
'ভবিষ্যতের প্লান যেটা করলে, সেটা ঠিকই আছে—সময় পাবে,  
আমাকে আরো ভালোভাবে চিনে নিয়ো তুমি। কিন্তু আমি, আজ  
যাতেই, আমাদের কুঁড়েঘরে তোমাকে সম্পূর্ণ চিনে নিতে চাই।  
আপাদমস্তক, গভীরভাবে।'

ধতমত খেয়ে গেল মারিকা, প্রথমে বুঝতেই পারলো না কি বলছে  
রানা। তারপর ফিক করে হেসে ফেললো সে। পরমুহূর্তে অনিশ্চয়তা  
ও জড়তা দেখা গেল তার চেহারায়। রানাকে ছেড়ে দিয়ে একটু দূরে  
সরে গেল সে।

'কি হলো, ঘাবড়ে গেলেন নাকি?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'ঠাট্টা  
করছি তো।'

আরো ক'সেকেণ্ড স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো মারিকা, যেন বর্তমানে  
নেই সে, অতীতে ফিরে গেছে। তারপর ধীরে ধীরে উজ্জল হয়ে উঠলো  
তার চেহারা। এক পা এগিয়ে এসে আলতোভাবে রানার বুকে মাথা  
রাখলো মারিকা। ফিসফিস করে বললো, 'না, রানা, ঠাট্টা নয়। এ  
আমাদের পাণ্ডনা। কতো কষ্টে সামলে রেখেছি নিজেকে তা তুমি  
জাবতেও পারবে না। আমিও জানতে চাই তোমাকে।'

শেষ